প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৬ অক্টোবর ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাহিত্যালোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬
থেকে প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হতে মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ
সুহৃদ্বরেষু

# সূচী

## রামমোহনের গদ্যরচনা

### ভারত-পথিক রামমোহন

যুরোপের সংস্কার-আন্দোলনের শুকতারা জন উইক্লিফের ( ১৩২৪-১৩৮৪ ) সাড়ে চার শ' বছর পরে রামমোহনের ( ১৭৭৪-১৮৩৩ ) আবির্ভাব হয়েছে। উইক্লিফের যুগে ইংলণ্ডের সমাজব্যবস্থা ও ধর্মনৈতিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের হুবহু সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু উইক্লিফের মতো রামমোহনও প্রচলিত সংস্কারকে বাদ-প্রতিবাদের সাহায্যে এবং বুদ্ধি ও যৌক্তিকতার নিরিখে তৌল করতে চেয়েছিলেন। ধর্মযাজকদের পার্থিব ঐশ্বর্য ও ভোগাসক্তি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উইক্লিফ আন্দোলন করেছিলেন। যাঁরা খ্রীস্টসেবক, গির্জার কর্ণধার, ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসে পার্থিব আরাম ভোগ করছেন—তাঁদের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তুললেন জন উইক্লিফ, এবং ১৩৭৭ সালের দিকে লাতিন ভাষায় *De Dominio* গ্রন্থ লিখে পোপ এবং তাঁর বশংবদ ধর্মযাজকদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করলেন। কিন্তু তিনি এখানেই থামলেন না, খ্রীস্টান ধর্মের কতকগুলি আচার ও কৃত্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুললেন। খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বে যাকে *Eucharist* (Trans-substantiation) বলে, তার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠল। তাঁর দলবল, যারা 'লোলার্ড্' নামে পরিচিত, তারা একদা এমন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে 'De Haeritico Comburendo' শীর্ষক আইন পাস করাতে হয়। এই অপরাধে উইক্লিফ্-পন্থী স্যর জন ওল্ড ক্যাস্‌লকে পুড়িয়ে মারা হয়। বাংলা দেশে রামমোহন কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইন পাস হয়নি, বা তাঁর কোন অনুচরকে নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। অথচ তাঁর ক্রিয়াকর্ম তো উইক্লিফের চেয়ে নিরীহ ছিল না।

রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে সুলভে প্রচার আরম্ভ করলেন। এতদিন যা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ীর কুক্ষিগত ছিল, এবার তা অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেতর লোকের দৃষ্টিগোচর হল। উইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে অনুরূপ আন্দোলনের সম্মুখীন হন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বহুকালাশ্রিত সংস্কারে দারুণ আঘাত দিলেন। সর্বোপরি

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ প্রচার করে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করে এবং বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে ( কিন্তু শাক্ত মত ও তন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনোরূপ বিরূপতা ছিল না ) তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদে যে কী ভয়ানক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ শতাধিক বৎসর পরে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তাই আমরা রামমোহনকে প্রাচ্য-ভুবনের উদিত সূর্য বলে গ্রহণ করতে চাই। আপ্তবাক্যের স্থানে বিচারবুদ্ধি, প্রচলিত সংস্কারের স্থানে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যৌক্তিকতা, জীবনভীরু উদাসীনতার স্থানে জীবনের প্রতি কঠোর বাস্তবানুবর্তিতা এবং মানুষের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—রামমোহনকে আধুনিক মানুষের পুরোধার গৌরব দিয়েছে। এদিক থেকে তাঁর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১] কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাঁর গদ্য নিয়েই আলোচনা করব।

রামমোহন ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রা করেন। মোট পনের বছরের মধ্যে তিনি বাংলা গদ্যে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন প্রচুর। ছোট-বড়ো বাংলা পুস্তিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল অন্ততঃ ত্রিশ, ইংরেজী পুস্তিকার সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। নানাবিধ গুরুতর কর্ম, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থেকেও তিনি বাংলা গদ্যে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার কিছু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান এবং কিছু বিচারবিতর্কমূলক রচনা। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, যাকে polemic রচনা বলে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তিনি তার অগ্রদূত। প্রাচীন যুগে শাস্ত্র ও তত্ত্ব নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছে। গোটা ন্যায়শাস্ত্রটাই তো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের সওয়াল-জবাবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা দেশে মধ্যযুগেও তর্কবিতর্কের সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলছে। নব্যন্যায় বাঙালীর সূক্ষ্ম চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থেও চৈতন্যদেবকে একজন বিশিষ্ট তার্কিক রূপে আঁকা হয়েছে। এমন কি, যখন তিনি ভাবরসে মাতাল হয়ে থাকতেন, তখনও রায় রামানন্দের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। সুতরাং রামমোহনের যুক্তি ও তার্কিকতা বাঙালীরই চিত্তসংস্কার থেকে উদ্ভূত। বাঙালীর আচার-আচরণ এবং কৃত্যের মধ্যে আবেগের অতিরেক যেমন আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম চিন্তা ও যুক্তি। যৌক্তিক পারম্পর্য এ জাতির মনঃপ্রকর্ষকে তীক্ষ্ণতর করেছে। রামমোহনের সমস্ত গদ্যরচনায় সেই

অপ্রতিহত ও অসংসক্ত বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আবেগের দ্বারা কিছু কিছু আন্দোলিত হয়েছিলেন। আবেগের প্রবলতা না থাকলে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে এতটা তৎপর হতে পারতেন না। পতি-বিয়োগবিধুরা সদ্য-বিধবাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর। পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ…… অন্য ২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল অবধি আপন ২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুন দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে। এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর, কি পুরুষের, মরণ-কালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না"[২] ('সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ').

এখানে তাঁর পুরুষ-হৃদয় কতটা স্নেহার্দ্র ও করুণ হয়ে উঠেছে, তা তাঁর সহজ সরল ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য তাই বলে আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে একই গোষ্ঠিভুক্ত করতে পারি না। রামমোহন মূলতঃ জ্ঞানবাদী—প্রত্যভিজ্ঞামূলক নিরীক্ষাই তাঁর পথপ্রদর্শক। অপর দিকে বিদ্যাসাগর মূলতঃ আবেগবাদী, মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। সে যাই হোক, রামমোহন বাংলা গদ্যকে তুচ্ছতার অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মত-প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করেছেন এবং এই ভাষাকে গুরুতর ভারবহনক্ষম কর্মে প্রস্তুত করেছেন— এই জন্য তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

### রামমোহনের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য

১৭৭৮ সালে হালহেড 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য ***The Grammar of the Bengal Language*** লিখেছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন, **"I must observe, that Bengal is at present in the same state with Greece before the time of Thucydides ; when Poetry was**

the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown."

যাঁরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা হালহেডের এই মত নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই মত শিষ্টজনের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে। এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য ছন্দাত্মক। সে যুগে নাকি কোথাও গদ্যের ব্যবহার ছিল না। সদাশয় মিশনারীসম্প্রদায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর দল, এবং রামমোহন বাংলা গদ্যের স্রষ্টা ও সংরক্ষক। কিন্তু গত তিন-চার দশকের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বাংলা গদ্য সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, যাতে হালহেডের মতামতের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত হত। বৈষ্ণব-পদকারেরা এবং ভারতচন্দ্র কিছু কিছু অন্য ছন্দের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু পয়ার-ত্রিপদী ছন্দেই যাবতীয় গদ্যাত্মক বিষয় রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্য-জীবনগ্রন্থের অনেকটাই বিশুদ্ধ গদ্যধর্মী, কিন্তু তাও পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। মধ্যযুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত না হবার কারণ— পয়ারছন্দ। পয়ারবন্ধ এতটা স্থিতিস্থাপক ও ভারসহিষ্ণু যে, স্বচ্ছন্দেই এতে গদ্যনিবন্ধ রচিত হতে পারে। আমাদের অনুমান, পয়ারছন্দে যে-কোন সাহিত্যকর্ম নির্বাহ হতে পারত বলে সে যুগে গদ্যরীতির বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়নি। কিন্তু তাই বলে কি আমরা মনে করব, বাংলা গদ্য মিশনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা জন্মলাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, এবং লালিত হয় রামমোহনের দ্বারা?

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের যে ব্যবহার ছিল না, তা কখনোই সত্য নয়। হালহেড অথবা কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুর মিশনের 'ভ্রাতৃগণ' পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখতেন না; তাই তাঁরা গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য তৈরি করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পেতেন যে, খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী থেকেই চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ, ক্রয়বিক্রয়পত্র প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে বাংলা গদ্য রীতিমতো ব্যবহৃত হত। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবের কাছে সাধু-গদ্যেই চিঠি লিখেছিলেন। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে যে, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা গদ্যের ব্যবহারযোগ্য পদবিন্যাসরীতি গড়ে উঠেছিল— "লেখনং

কার্যাঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" এখানে লক্ষণীয় গদ্যের পদবিন্যাসরীতি এবং সুষ্ঠু অন্বয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি গড়ে উঠেছিল, চিঠিপত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছিল। কেরী সায়েবের দল এই রীতির খোঁজ রাখতেন না, বা পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কৌতূহলীও ছিলেন না। তাই তাঁরা ইংরেজী বা সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা গদ্য লেখার ও লেখাবার চেষ্টায় বহু পণ্ডশ্রম করেছেন। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতেও কয়েকখানি পত্রে পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মধ্যযুগীয় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজদরবারে বাংলা গদ্য সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। চিঠিপত্র, হুকুমনামা, দলিল-দস্তাবেজ— সমস্ত ব্যাপারেই বাংলা গদ্যের ডাক পড়ত। ১৭শ শতাব্দীর দিকে মুঘল দরবার ও আদালতের প্রভাবে মামলা ও জমিজমাসংক্রান্ত লেখায় ফারসী শব্দের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকত— এখনও আদালতী ভাষা থেকে ইসলামী বাংলার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ধান করেনি।

১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বকীয়া-পরকীয়া বাদবিসংবাদ-সংক্রান্ত যে দলিলটি পাওয়া গেছে, তার ভাষা বেশ স্বচ্ছ এবং পদবিন্যাসরীতিও মোটামুটি প্রশংসনীয়। জয়পুর মহারাজের সভাপণ্ডিত এবং স্বকীয়াবাদের পরিপোষক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়া মতের পরিপোষক ও বাংলার বৈষ্ণব-সমাজের নেতা রাধামোহন ঠাকুরের কাছে স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার করে যে 'অজয়পত্র' লিখে দেন তার কিয়দংশ :

> "মালহাটি মোকামে তোমার নিকট (অর্থাৎ রাধামোহনের কাছে) স্বকীয়া পরকীয়া ধর্ম্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।"

এ ভাষা তো আধুনিক কালের ভাষা। কেরী সায়েবের 'ধর্মপুস্তক'-এর ভাষা এর চেয়ে অনেক দুর্বল। তিনি গোড়ার দিকে বাইবেল অনুবাদের ভাষায় কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেননি। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের যে সমস্ত কড়চা-জাতীয় পুঁথি পাওয়া গেছে, তার গদ্য বাক্যগুলি সরল ও সংক্ষিপ্ত

—পদবিন্যাসরীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। কেরী ও খ্রীস্টান 'ভ্রাতৃগণ' বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা বাংলা গদ্য তৈরি করেননি; বরং তাঁদের অনেকে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক পদবিন্যাস অবহেলা করে একটা কৃত্রিম রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন,— অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এদিক থেকে সার্থক ব্যতিক্রম। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল এবং কেরী প্রভৃতি মিশনারীরাই সাধুভাষা নামক একটি কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এ মত একেবারে ভুল। সাধুগদ্য বাংলা দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক রীতি। পয়ারছন্দের রূপান্তর হচ্ছে বাংলা গদ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা পয়ারে যে-ধরনের বাগ্‌বিন্যাস ও সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছে (যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'), বাংলা গদ্যের বাক্যগঠন কতকটা সেই পথ ধরেছে। তাই সাধুভাষা আগন্তুক নয়, বা পণ্ডিতের কৃত্রিম সৃষ্টিও নয়। পুরাতন যুগ থেকে বাঙালী-মনের সঙ্গে পয়ারছন্দ ও সাধু গদ্যরীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ মিশনারীদের গদ্যরচনার চেষ্টাও আলোচনার যোগ্য।

১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে পর্তুগীজ 'হার্মাদ' আর রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা বাংলা দেশে আনাগোনা শুরু করেছিল। তারা পূর্ববাংলার অনেক গ্রামে গির্জা বা 'ধর্ম-ঘর' বানিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিছুটা সফলও হয়েছিল। তারা কিছু কিছু গদ্য প্রচার-পুস্তিকা লেখারও চেষ্টা করেছিল। শোনা যায়, ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের দিকে দোমিনিক-দে-সুজা সোনার গাঁয়ের কাছে শ্রীপুরে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলা গদ্যে দু'খানি পর্তুগীজ প্রচার-পুস্তিকার অনুবাদও করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দু'খানি প্রচার-পুস্তিকা পাওয়া গেছে, এই প্রসঙ্গে তার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। দু'জন পাদ্রী, দোম আন্তোনিও-দে-রোজারিও এবং মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও দু'খানি বিতর্কমূলক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দোম আন্তোনিও বাঙালী হিন্দু ছিলেন, পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পর্তুগীজ নাম নিয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ' ১৮শ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বা পূর্বে রচিত হয়েছিল, কিন্তু লেখা হয়েছিল রোমান হরফে। মানোএল সায়েব খাঁটি পর্তুগীজ পাদ্রী ছিলেন; তিনি ১৭৩৪ থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ঢাকা জেলার ভাওয়ালে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, গির্জা বানিয়েছিলেন। তিনি

একখানি পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থও লিখেছিলেন (*Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez*)। তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (*Crepar Xaxtrer Orth Bhed*) প্রচারপুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় লেখা হলেও রোমান হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল। ১৭৩৩ সালে তিনি ঢাকায় বসে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তিকাটি লেখেন। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবনে এটি রোমান হরফে ছাপা হয়। দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ' কিন্তু ছাপা হয়নি। এই দুটি গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১. "বলি বরো ধর্মষ্ঠ ছিলো, মহাদাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো এ কারোণ পরমেশর বামন রূপে হইয়া একপদ দিয়া পৃথিবীতে, এক পদ পাতালে, আর পদ সর্গে এইরূপ বলি-রাজারে ছলিলেন।" ( 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' )

২. "তোলেদো শুহরে এক গৃহস্থের পুত্র আছিল, সে কুবন্ধুর লগে ফিরিল, কুকার্যা শিখিয়া কুজন হইল। তাহার পিতা তাহারে শিক্ষা দিত, সে পিতার কথা না মানিত। পিতা একদিন তাহারে শাস্তি দিতে চাহিল ; পুত্রে ক্রোধ করিয়া হাত তুলিয়া পিতার মুখেতে চড় মারিল।" ( 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' )

রোমানক্যাথলিক পাদ্রীদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের যে অনুশীলন হয়েছিল তাতে সাধু গদ্যরীতিই অনুসৃত হয়েছে। দোম আন্তোনিও ও মানোএল সায়েব পূর্ব-বঙ্গে বসে লিখেছিলেন, কিন্তু 'আছিল' 'লগে', 'তাহারে', বাদ দিলে আর কোথাও আঞ্চলিক প্রয়োগ নেই, বা মুখের বুলি অনুসৃত হয়নি। এখানে দেখা যাচ্ছে, বিদেশী ধর্মযাজকও সাধুরীতি অবলম্বন করেছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ নন্দকুমারের পত্রে ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও ভাষারীতিতে সাধুছাঁদই ব্যবহৃত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা শিখে যে-সমস্ত আইনগ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেছিলেন, তার ভাষাভঙ্গিমা জড়তাপূর্ণ ও অনভ্যস্ত বটে, কিন্তু সাধুভাষার রীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি।

এরপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য রচিত পণ্ডিত-মুন্সীদের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। ওয়েলেসলি আহেলা বিলিতি সিভিলিয়ানদের দেশীয় ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতি শেখাবার জন্য ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

স্থাপন করেন। এই কলেজের বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের সর্বাধিনায়ক রেভাঃ উইলিয়াম কেরী। কেরী ধর্মপ্রচারণার উদ্দেশ্য নিয়েই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় যে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তার মূলেও ছিল অনুদার সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব[৩]। বাইবেল সম্পর্কে ও খ্রীস্টানধর্ম প্রচারে যাজকসম্প্রদায় সাধারণতঃ যে-রকম অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, কেরী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ভাষার প্রতি তাঁর যেমন কৌতূহল ছিল, তেমনি ছিল ভাষা শিক্ষা করার স্বাভাবিক প্রবণতা। এই জন্য বাংলা গদ্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কাহিনী, ইতিহাস ও গালগল্পকে ভবাবেশে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুব্যবস্থা করে এই বিদেশী ধর্মযাজক ব্যক্তিটি বাঙালীর কাছে চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। তাঁর চেষ্টা, উৎসাহ ও সহায়তায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত ও ফারসী-নবিশ মুন্সী বাংলা গদ্য-গ্রন্থ রচনায় প্রস্তুত হলেন, কয়েকখানি পুস্তিকা মুদ্রিতও হল। তার মধ্যে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ( ১৮০১ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থ বলেই এর খ্যাতি— যদিও বইটি ফারসী শব্দকণ্টকে এবং ত্রুটিযুক্ত অন্বয়ে প্রায় দুষ্পাঠ্য হয়ে উঠেছে। কেরী সায়েবের উৎসাহে কলেজের যে সমস্ত বাঙালী অধ্যাপক সায়েব-সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার জন্য লেখনী চালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীর চিত্তাকর্ষক হতে পারে অনুমান করে কেরী ইতিহাস, পুরাণের গল্প ও দেশী-বিদেশী আখ্যানের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে কেরীর প্রবর্তনায় প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্যরীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকে বলেন যে, রামমোহন নাকি সর্বকর্মক্ষম গদ্যরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এ কথা যে যথার্থ নয়, রামমোহনের পূর্বেও বাংলা গদ্যের রূপ ও রীতি মোটামুটি গড়ে উঠেছিল— এটাই প্রমাণিত হবে এই পণ্ডিত-মুন্সীদের পুস্তিকার গদ্যরীতি বিচার করলে। অবশ্য এই পণ্ডিতের দল প্রায়শই সংস্কৃত ভাষা অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন— বোধ হয় সংস্কৃতজ্ঞ কেরী সায়েবের অভিপ্রায়ে। বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের বাহুল্য কেরী পছন্দ করতেন না[৪]।

তাঁর পূর্বে হালহেড সায়েবও *The Grammar of the Bengal Language*-এ বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দের ব্যবহার নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক, এই পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ফারসী-নবিশ ছিলেন, তাঁরা একটু বেশিমাত্রায় আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তখনও দেশের কাজেকর্মে, আইন-আদালতে, সরকারী মহলে ফারসী ভাষার বেশ ব্যবহার ছিল। তা হলেও কেরী বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দ ব্যবহারের রীতি বোধ হয় পরবর্তী কালে একেবারে বর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী তারিণীচরণ মিত্র হিন্দুস্থানী ও উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই কলেজে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'-এর (১৮০৩) ভাষায় কিছু কিছু ইংরেজী ধ্বনের পদবিন্যাস থাকলেও (উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক গিলক্রাইস্টের প্রভাবে হয় তো) কোথাও ফারসীর আতিশয্য নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'তে (১৮০৮) মুসলমান যুগের ইতিহাস বর্ণনায় কিছু কিছু ফারসী শব্দ থাকলেও ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। রামরামের প্রথম গ্রন্থে ('রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র') আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় (১৮০২) ফারসী শব্দ যথাসম্ভব বর্জিত হয়েছে। বাংলা গদ্য থেকে ফারসী-আরবী শব্দ বিতাড়নে বোধ হয় কেরীর প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় সংস্কৃত-প্রাধান্য, ফারসী-শব্দানুকূলতা অথবা চলতি শব্দ— কোন্‌টির অধিকতর প্রাধান্য থাকা উচিত, এ নিয়ে কেরী নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন। তাঁর প্রবণতা ছিল সংস্কৃত ও চলতি রীতির প্রতি। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মতো বিরাট পণ্ডিতের গম্ভীর ও ক্লাসিক ছাঁদের বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও বলিষ্ঠ চলতি বুলি এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-উজ্জ্বল বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যায়। গোলোকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশে'-ও গ্রাম্য বাংলার কিছু কিছু সতেজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেরী সায়েবের নামে প্রচারিত 'কথোপকথন' (১৮০১) উল্লেখযোগ্য। এটি পুরোপুরি কেরীর রচনা নয়। তিনি খুব সম্ভব এটি সঙ্কলন করেছিলেন, পণ্ডিত-মুন্সীর দলই এর কথিকাগুলি লিখেছিলেন। পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল সায়েব কর্মচারীদের বাংলা কথোপকথন শেখাবার জন্য। তাই এতে কলকাতা ও শহরতলীর ইতরভদ্র, স্ত্রীপুরুষের মুখের ভাষার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে— যদিও ভাষার মূল ছাঁদটি সাধুভাষাকেই অনুসরণ

করেছে। এতে হিন্দুর সমাজ, পারিবারিক জীবন, দৈনন্দিন আচার-আচরণ প্রভৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা আছে, তা কেরীর মতো কোন বিদেশীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মনে হয় এর অধিকাংশ রচনাই মৃত্যুঞ্জয়ের। কারণ এরকম চলিত বাংলায় তীব্র তীক্ষ্ণ সংলাপ রচনা সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া আর কেউ পারতেন না॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী ও কেরী সায়েবের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথা সপ্রমাণ হবে যে, রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছিল। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১. "এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে স্থানে নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরস্পর পুরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজকন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত, দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাতে দিবাগত হইলে সাঙ্গত্যক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।" ( ১৮০১ সালে ছাপা রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' )

২. ॥ মাইয়া কন্দল ॥

ক ॥ তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়াবেড়ানী? সাঁজের কাম কাজ কিছু মনে নাই বটে?

খ ॥ কি কামের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো?

ক ॥ আমি কামে ঠেকি নাই, তুই সকল কামে ঠেকিয়াছিস?

খ ॥ চক্ষুখাকী, তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না, এ সকল কাজ কে করিয়াছে?

ক ॥ তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে? একদিন কাম করিয়া এত কইস? আমি তোর সকল জানি। ( ১৮০১ সালে মুদ্রিত কেরীর 'কথোপ-কথন' )

৩. "অবন্তী নামে নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুষ্টের দমন— এইরূপে পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গ-সেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপগুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।" ( ১৮০২ সালে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' )

৪. "তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, মাথা হইতে

ভার নামা; আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল, ওগো, আমি যাইতে পারিব না— আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে— দিব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে।...... যা, শীঘ্র রাঁধা-বাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে।.... ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোজা? জান না। পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই, আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে।" (মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ রচনার পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির নানা স্থানে অন্বয় ও সজীবতা ফুটে উঠেছিল। রামমোহনের গদ্যরীতিও এত সরস ও সরল নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, রামমোহনকে গদ্যের অন্বয়বন্ধন ও বাক্‌রীতি নির্মাণ করতে হয় নি। তিনি সুগম ও সুপরিচ্ছন্ন গদ্যই হাতে পেয়েছিলেন।

'বেদান্তগ্রন্থে'র (১৮১৫) 'অনুষ্ঠান' পত্রে রামমোহন বলেছিলেন, "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করা উচিত হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ায় অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না।" এই উক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহন যখন সকলকে হাত ধরে গদ্য পড়তে শেখাচ্ছেন, তখন তাঁর পূর্বে বোধ হয় গদ্যের পদবিন্যাসপদ্ধতি বলে কিছু ছিল না। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। রামমোহনের পূর্ববর্তী গদ্যের যে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাতেই দেখা যাবে যে, ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা গদ্যের পদবিন্যাসরীতি ও অন্বয় গড়ে উঠেছিল। তবে রামমোহন এ কথা কেন বলেছেন? সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় বিরামচিহ্নহীন বাংলা গদ্যকে ভাবানুসারে

ছেদ দিয়ে পড়তে অসুবিধা বোধ করত। পুরাতন বাংলা গদ্যে শুধু পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হত না। ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা' (২য়) পুস্তিকায় সর্বপ্রথম ইংরেজী যতিচিহ্নের পুরোপুরি ব্যবহার লক্ষিত হয়। অবশ্য কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির সঙ্গে ইংরেজী ফুল স্টপও বাংলা বইয়ে নির্বিবাদে ব্যবহৃত হত। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) এই রীতিতে ছাপা হয়েছিল। তাই বোধ হয় যতিপাতহীন ছাপা বাংলা গদ্যে অনভ্যস্ত বাঙালী পাঠককে রামমোহন গদ্যচত্র পাঠের রীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আমরা রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ ও গদ্যরীতির পরিচয় নিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব, তাঁর গদ্যরীতির মূল বৈশিষ্টই-বা কি, বাংলা গদ্য বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁর দানই-বা কতটুকু।

**রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ**

প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে রামমোহন আধুনিক জীবন ও সাধনাকে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তা আমরা সূচনায় বলেছি। কিন্তু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয়, সে কথাটাই সর্বাগ্রে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষায় তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। তিনি অল্প বয়সেই আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন, ডিগ্‌বির কাছে ইংরেজী ভাষাতেও রীতিমতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; এমন কি শ্রীরামপুরের মার্শম্যানের সঙ্গে ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে বিতর্কের সময় হিব্রু ভাষায় লেখা মূল বাইবেল পাঠের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিব্রু শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ও বলায় তাঁর কতদূর নিপুণতা ছিল, তা বোঝা যাবে 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' নামক সংস্কৃত পুস্তিকা থেকে। অনেক সময় তাঁকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বিতর্ক চালাতে হয়েছে। তাঁর ইংরেজী ভাষাও অতি পরিচ্ছন্ন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ দু'খণ্ডে রামমোহনের যে ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই দেখা যাবে ইংরেজী ভাষার ওপরে রাজার দক্ষতা কতটা ব্যাপক ছিল। তিনি ইংলণ্ডে থাকার সময়ে জেরিমি বেন্থাম তাঁর লেখা ইংরেজী বই পড়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "Your works are made known to me by a book in which I read a style which,

but for the name of a Hindu, I should certainly have ascribed to the pen of superiorly educated and instructed Englishman." বেন্থামের এই প্রশংসাবাণী আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, রামমোহনের ইংরেজী রচনা বাংলার চেয়েও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, পরিমাণেও বাংলা রচনার চেয়ে বেশি। আরবী-ফারসী ভাষা ও মুসলমানী কৃতা তিনি এত ভালো জানতেন যে, নিষ্ঠাবান মুসলমান সম্প্রদায়ও তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভি' বলে সম্মান করতেন। তিনি প্রথমে আরবী-ফারসী ভাষায় একেশ্বরবাদী ধর্ম-প্রতিপাদক একখানি পুস্তিকা লেখেন— 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' (১৮০৩-১৮০৪ সালে প্রকাশিত)। এই 'জবরদস্ত মৌলভি' ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং নানা ভাষায় তাঁর কি রকম নিপুণ অধিকার ছিল তাহা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

রামমোহনের সমস্ত রচনা অনুবাদ, ব্যাখ্যান ও বিতর্কমূলক বলে কোন গ্রন্থেই বিশিষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি। অনেকটা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের ভঙ্গীতে তিনি আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই তাঁর বাংলা পুস্তিকাগুলিতে প্রচার-ধর্মিতার প্রভাব বেশি। তাই 'বেদান্তসার' বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য পুস্তিকাগুলি প্রায়ই পুরো গ্রন্থের মর্যাদা পায়নি ; এগুলির আকারও খুবই ছোট, কয়েক পৃষ্ঠার বেশি নয়। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-সংবলিত এই রকম আটটি পুস্তক-পুস্তিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে :— বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৬), তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ ১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)।

কারো কারো মতে রামমোহন আধুনিক কালে নতুন করে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ চর্চা শুরু করেন। তাঁর আগে মধ্যযুগে শাস্ত্রের ধারা বলতে শুধু ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি ও দ্বৈতবাদী দর্শন আলোচনা বোঝাত। কিন্তু সমাজে বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয় না। তাই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কারের প্রাধান্য। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ শিক্ষিতমহলে জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে গীতার তত্ত্বকথা আবার সুপরিচিত হয় এবং ১৯শ শতকের সপ্তম দশকের

পর, অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্মসমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে স্মার্ত সংস্কার হিন্দুর চেতনাকে আবার অধিকার করল, গীতার সঙ্গে বেদান্তও গৃহীত হল। রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ছিলেন এর প্রধান প্রচারক। সেইজন্য রামমোহনকে আধুনিক কালে বাংলা দেশের বেদান্ত-উপনিষদ প্রচারক বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ১৮শ শতকের মধ্যভাগে বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের টীকা রচনা করেছিলেন। রামমোহনের সময়েও কলকাতার পণ্ডিতদের টোলে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা অজ্ঞাত ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নিজেই তাঁর চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও উপনিষদ পড়াতেন। রামমোহনই তার উল্লেখ করেছেন: "ঐ সকল মূল উপনিষদ আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেতে আছে।"[৫]

বাংলা দেশে রামমোহন বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন, এ কথাও ঠিক নয়। মধ্যযুগে বাংলা দেশে বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী—উভয় আলোচনাই সুপ্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসমাজে বেদান্তের দ্বৈতবাদী আলোচনা জনপ্রিয় হলেও অবৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাচীনযুগেও অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী ১৬শ শতকের কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতবাদের টীকাকার হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি "অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন" নামক অদ্বৈততত্ত্ব-সম্পর্কীয় একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রামানন্দ বাচস্পতি ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের ওপর একাধিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। রামমোহন সেই ধারার অনুবর্তন করেছেন। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেদান্ত গীতা প্রভৃতির আলোচনা কখনও হ্রাস পায়নি; তবে তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানানুশীলনে বেদান্তের চর্চা করলেও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা অধিকতর চালিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজীনবিশ না হলেও অনেক বিষয়ে আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।[৬] তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলেও রামমোহনের 'বেদান্তসারে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) লেখেন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রহ্মকে সগুণ ও

সোপাধিক ভাবে, বা নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে উপাসনা করলে হানি হয় না। তাঁর উক্তি : "অতএব যে যাহাতে যে কোন বিহিত ও যে কোন জ্ঞানে যাহাকে উপাসনা করে, তাহারা সকলেই ঐ এক ঈশ্বরের উপাসনা করে।"

রামমোহন, 'বেদান্তগ্রন্থে' ( ১৮১৫ ) বেদান্তের সূত্রগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে নিষ্কল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং 'বেদান্তসারে' ( ১৮১৬ ) উক্ত আলোচনাকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ব্রহ্মের সগুণ উপাসনা, বিশেষতঃ পৌরাণিক দেববাদ আক্রমণ করেন— অবশ্য মার্জিত ভাষায়। এর ফলে তাঁকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল— হওয়াই স্বাভাবিক। তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হত বটে, কিন্তু দেশাচারে পৌরাণিক দেববাদ স্বীকৃত হয়ে আসছিল। ঐ পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা ঘরের মধ্যে পৌরাণিক বহুদেববাদ মেনে চলতেন। তাঁরা মনে করতেন, বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুদ্ধির ব্যাপার, এবং মুষ্টিমেয় তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অনুশীলনের বস্তু,— তার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতত্ত্বের কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্মই নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছেন। এই মত মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতেই সপ্রমাণিত হবে : "অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দশভুজাদি রূপেতে ধেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন, ও স্বমাত্রপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রেন্দ্রাদি নামা পুংদেব-রূপেতে উপাস্য হন।" ( 'বেদান্তচন্দ্রিকা' )

রামমোহন বেদান্তের একেশ্বরবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করলেও 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— ব্রহ্মবাদের এই তত্ত্বটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। জগতের যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই, অতএব প্রাতিভাসিক জগৎচেতনা খপুষ্পের মতো অলীক— রামমোহনের মতো বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ একথা মানতে পারতেন না। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যে-রামমোহন বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে পরমোৎসাহী, তিনিই আবার বেদান্তের মায়াবাদকে অস্বীকার করে লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta : in what manner is the soul absorbed in the Deity ? what relation does

it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore, the sooner we escape from them and leave the world the better." সাধারণ বৈদান্তিকের সঙ্গে রামমোহনের এইখানে মৌলিক পার্থক্য। তিনি যে বলেছিলেন, "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well calculated to promote their political interest."— এতে তাঁর মত ও আদর্শ স্পষ্ট হয়েছে। সে যাই হোক, তাঁর উপনিষদের অনুবাদের অনেকটাই সাধারণ শিক্ষিতের পক্ষে সহজ-বোধ্য হয়েছে, তা স্বীকার করতে হবে।

রামমোহনের অনুবাদ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তাঁর ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয়নি, এতে লালিত্যের অভাব আছে। কথাটা অযৌক্তিক নয়। এর কারণ তিনি ভাষা পরিমার্জনের বিশেষ অবকাশ পাননি; অনুবাদকে পুরোপুরি মূলানুগ করার জন্যই এই ভাষাতে খানিকটা জড়তা এসে গেছে। সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যানে বাংলা গদ্য নিয়োগ করেছিলেন বলেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটা বড় দিক খুলে গিয়েছে।

এ ছাড়া রামমোহনের কিছু বিতর্কমূলক রচনা আছে। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি পুরাতনপন্থী পণ্ডিতসমাজের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন; দেশাচারের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে সাধারণ লোকেরও পুরোপুরি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি। তাঁর বিতর্কমূলক ও বিচার-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮), ঐ দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক

বিচার ( ১৮২৩ ), সহমরন বিষয় ( ১৮২৯ )। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব. বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ ও সহমরণ— রামমোহনকে এই তিন ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তার মধ্যে বেদান্ত ও ভক্তিদর্শন নিয়ে মতবিরোধ প্রধানতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সহমরণ-বিষয়ক বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর কৌতূহল, কোথাও-বা প্রতিকূলতা সঞ্চার করেছিল। এই পুস্তিকাগুলি প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত হয়েছিল, কাজেই রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণ ও পারিপাট্যের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তবু এই সমস্ত আলোচনায় তিনি যে রকম সংযম ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

রামমোহনের প্রতিপক্ষেরা তাঁকে অনেক সময়ে ইতর ভাষায় কটূকাটব্য করেছেন, কিন্তু তিনি বিতর্কে আক্রমণাত্মক বা ঈর্ষাপ্রণোদিত তীব্র বাক্য ব্যবহার করেননি। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো পণ্ডিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও বিতর্কের সময়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর 'পাষণ্ডপীড়নে' ( ১৮২৩ ) রুচির মুখ রক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করেননি। মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'য় রামমোহনকে "বেদান্তবৃষভ", "অগ্রাহ্য নামা-অমুক" ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন, শাস্ত্রবিচারে অনুচিত পরিহাসেরও সাহায্য নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়।" কাশীনাথ রামমোহনকে আরও তীব্র জ্বালাকর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। রামমোহন এই সমস্ত উত্তেজক বিতর্কের উত্তরে মাত্র দু-এক বার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ভক্তদের কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। সেই জন্য প্রতিপক্ষ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হলে তিনি ঐ মতের খোটা দিয়ে তাঁদের একটু সাম্প্রদায়িক-ভাবে আক্রমণ করতেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বৈষ্ণব মতকে তিনি ব্যঙ্গ করে 'পথ্যপ্রদানে' লিখেছিলেন, "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাঁহার শব্দব্রহ্ম, তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"

উদ্দেশ্যমূলক ও বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকা বাদ দিলে রামমোহন বিশুদ্ধ সাহিত্য-ধর্মী বা প্রবন্ধনিবন্ধ লিখবার অবকাশ পাননি। কলকাতায় আসার পর তাঁকে দিবারাত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনাও তাঁর অনেকটা সময় কেড়ে নিয়েছে। কাজেই ভাষারীতি ও প্রকাশ-

ভঙ্গিমাকে পরিশীলিত করবার তাঁর সময়ই ছিল না। তাঁর প্রতিভা ও কর্মোদ্যম শুধু প্রাথমিক কাজে ব্যয়িত হয়ে গেছে ; সেই জন্য তাঁর কাছ থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্য যতটা উপকৃত হতে পারত, ততটা পারেনি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা পেষণকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়।

তাঁর বিচারবিতর্ক, প্রচারপুস্তিকা, ব্যাকরণ, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি বাদ দিলেও একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে কিছু কিছু সাহিত্যগুণ লক্ষ্য করা যাবে। 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদ' ( ১৮২৩ ) কথিকাটিতে "এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহারদের পরস্পর কথোপকথন"-এর কাল্পনিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ত্রিতত্ত্ববাদী ( Trinitarian ) খ্রীস্টান মতের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রামমোহন নিজে খ্রীস্টান ধর্মকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর বন্ধু ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারী জন ডিগ্‌বিকে একবার লিখে-ছিলেন, "I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any other which have come to my knowledge." কিন্তু তিনি খ্রীস্টান ধর্মের যুক্তিহীন আপ্তবাক্য বিশ্বাস করতেন না, বিশেষতঃ ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টানদের তিনি পৌত্তলিক হিন্দুদের সমতুল্য মনে করতেন। এই 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদে' মৃদু পরিহাসের সাহায্যে তিনি খ্রীস্টান রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এক খ্রীস্টান পাদরি তাঁর তিনটি চৈনিক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ভাই, ঈশ্বর এক, কি অনেক ?" তাদের একজন বলল, "ঈশ্বর তিন," আর একজন— "ঈশ্বর দুই," এবং শেষের জন বলল, "ঈশ্বর নাই।" পাদরি এই উত্তরে বিব্রত হয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন যে, ঈশ্বর তিন-ও নন, দুই-ও নন— তিনি এক। তখন প্রথম শিষ্য বলল, "আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক— অবশ্য তিন হয়।" দ্বিতীয় শিষ্য বলল, তিন ঈশ্বরের মধ্যে "পশ্চিমদেশের কোন এক গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন— ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।" তৃতীয় শিষ্য বলেছিল, "ঈশ্বর নাই"— সে তার যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলল, "পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেক অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন ; কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত

বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদারা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?" এখানে রামমোহন খ্রীস্টান মতের অসঙ্গতি ও অযুক্তিকে ব্যঙ্গের দ্বারা হাস্যাস্পদ করেছেন। এই ছোট রচনাটিতে বাস্তবিক সাহিত্যগুণ সঞ্চারিত হয়েছে।

যাকে রসসাহিত্য বলে, এবং পরস্পরসমন্বিত চিন্তামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বলে, রামমোহন সেরকম বিশেষ কিছু লিখবার সুযোগ পাননি; কাজেই তাঁর গদ্যরচনা খুবই সীমাবদ্ধ ও বৈচিত্র্যহীন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বাদানুবাদের ধারাক্রমে বিবৃত। এ ধরনের গদ্যে বিতর্কের কাজ চলতে পারে, এমন কি বিবৃতির কাজও আংশিক ভাবে সমাধা হতে পারে; কিন্তু সৃষ্টিশীল কোনো কিছু রচনা সম্ভব নয়। রামমোহন সমাজ, ধর্ম ও নীতির প্রয়োজনে কলম ধরেছিলেন। রসসাহিত্য সৃষ্টি, বা নিস্পৃহ জ্ঞানপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য তিনি polemic লেখকের প্রথম সারিতে বিরাজ করলেও সাহিত্যের খাসদরবারে বিশেষ কোনো স্থান দাবি করেননি। ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে তার সম্ভাবনাও ছিল না। তখন গদ্যকে যুক্তির শানপাথরে ঘষে ঘষে ধারালো করে তোলা হচ্ছিল, তখনও তাকে সাহিত্যকর্মে নিয়োগের কথা রামমোহন ততটা ভেবে দেখেননি, বা প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, রামমোহনের সমকালের কোন কোন লেখকের (যেমন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার) রচনায় সাহিত্যরস সঞ্চারিত হয়েছিল। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের রচনায় অধিকতর সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যা রামমোহনের লেখায় খুব সুলভ নয়।

### রামমোহনের গদ্যরীতি

রামমোহনের গদ্যরীতি নিয়ে নানা বিতর্ক ও বিরুদ্ধ মত চলে আসছে। কেউ কেউ তাঁকে সাধু ও পরিচ্ছন্ন গদ্যের জনক বলে সম্মান করেন, কেউ আবার এ মত মানতে চান না। তাঁদের মতে রামমোহনের গদ্যরীতি প্রায়শই জড়তাগ্রস্ত। যথার্থ বাংলা গদ্যের সঙ্গে তাঁর গদ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, রামমোহন বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেননি, মিশনারী সম্প্রদায় বা ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরাও বাংলা গদ্যের জন্মদাতা নন। তাঁদের পূর্বে প্রায় তিন শ' বছর ধরে পুঁথিপত্রে ও দৈনন্দিন ব্যবহারে যে বাংলা গদ্য চলে আসছিল, তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস ও অন্বয়গত খুব একটা বিসদৃশ পার্থক্য নেই। স্বচ্ছন্দতা ও বহমানতা রামমোহনের গদ্যের প্রধান লক্ষণ। ভাষার মধ্যে মার্জিত মনোভাব ও সংযত যুক্তিবিন্যাস তাঁকে শ্রেষ্ঠ polemic লেখকে পরিণত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের কেউ কেউ (যেমন মৃত্যুঞ্জয়) সাহিত্যের গদ্য লিখেছেন বটে, কিন্তু বিচারবিতর্কের জন্য যে সংযত ও ভারবহ গদ্যের প্রয়োজন— রামমোহন সেই গদ্যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই ধরনের সংযত পরিচ্ছন্ন গদ্যের কিছু দষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. "দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদের মধ্যে, মানুষদের মধ্যে যেকেহ ব্রহ্মজ্ঞান-বিশিষ্ট হয়েন, তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে, সে দেবতার পূজ্য হয়েন— এমন শ্রুতিতে কহিতেছেন।"— ('বেদান্তসার')

২. "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে, স্থানমার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে ; এবং সূপকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপনং নিয়মিত কালে করে······ ঐ রন্ধন ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে···।" (—'প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ')

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটিতে আধুনিক গদ্যের আভাস ফুটে উঠেছে ; এখানে পদান্বয় বা শব্দযোজনায় বিশেষ কোন উৎকট আতিশয্য দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য তাঁর রচনার অনেক স্থানে 'যেঁহ', 'তেঁহ' 'করিবাতে', 'হইবাতে', 'এহার', 'তাহারদের'

প্রভৃতি পুরাতন ধরনের বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যাবে। রামমোহনের সমসাময়িক কোন কোন লেখক এই রীতির অনেকটা বর্জন করেছিলেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। গুপ্তকবি রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "দেওয়ানজী ( অর্থাৎ রামমোহন ) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহন নব্যন্যায়ের শেষ উত্তরাধিকারী। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই ন্যায়ের ভাষার মতো যুক্তি-প্রতিযুক্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। এ ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র তুলনায় "জলের ন্যায় সহজ"— তা ঠিক।[৮] মৃত্যুঞ্জয় থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

"আর শুন, উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ কখন হয় না। নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদের উপাসনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া বুঝ। রাজাদির যে উপাসনা, সে কি তদীয় শরীর রূপ-গুণাদি সেবা স্তবাদি ব্যতিরেকে হয়? রাজার যে শরীর রূপগুণাদি সেই কি রাজা? কিম্বা তাহা হইতে অতিরিক্ত চেতনারূপী পুরুষ রাজা? যদি বল যে, শরীরাদি সেই রাজা, তবে কি মৃত রাজশরীর দাহতে রাজার দ্রোহ হয়? তাহা নয়।" ( বেদান্তচন্দ্রিকা )

রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থে'র তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা কিছু গুরুভার, দার্শনিক পরিভাষায় কিছু কণ্টকিত, এবং অনধিকারীর কাছে এ ভাষা ও বক্তব্য যে হস্তা-মলকবৎ নয় তা অবশ্য স্বীকার্য। রামমোহন গুহাহিত শাস্ত্রকথাকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের এই মেদস্ফীত ভাষাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন :

"সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে, সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয়। অতএব প্রার্থনা এই যে, দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা

হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য ( মৃত্যুঞ্জয় ) লিখেন, যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।”

মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন-নি। গুহ্য শাস্ত্রকথাকে তিনি দেশভাষায় প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন; কারণ তা অদীক্ষিত ও অনুপযুক্তের হাতে পড়তে পারে। তাতে শাস্ত্রের অমর্যাদাই হবে। রামমোহন যখন সরল বাংলায় বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করছিলেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় এই অনাচারে শঙ্কিত না হয়ে পারেননি। তিনি বলেছেন, “যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনের পরাঙ্মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।” অর্থাৎ ভট্টাচার্য শাস্ত্রাদিকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের খুঙ্গি-পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন। রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদগোপ্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নিজেই ‘বেদান্তচন্দ্রিকা ও ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’য় দিব্যি সরল বাংলায় ব্রহ্মতত্ত্ব ও মোক্ষপদ ব্যাখ্যা করেছেন। সে যাই হোক, বোধগম্যতার দিক থেকে বিচার করলে রাম-মোহনের গদ্য খুবই প্রশংসনীয়। তিনি সংস্কৃতগন্ধী জটিল শব্দবিন্যাস, সমাস-সন্ধির সমারোহ, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দাড়ম্বর প্রভৃতি পণ্ডিতম্মন্যতা যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। তাতে সরসতা না থাকলেও সরলতা আছে।

কিন্তু আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, রামমোহনের গদ্য বোধগম্যতার দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও এর অন্বয়বন্ধন, শব্দযোজনা ও বাগ্‌বিন্যাস কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ও স্খলদ্‌গতি। বরং মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্‌রীতি গুরুভার হলেও যথার্থ গদ্য হয়ে উঠেছে :

“বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে, এবং কি খৃষ্টান, কি অখৃষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না— যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষরূপে

উপলব্ধি হয় না।"[৯]

রামমোহনের এই পংক্তিবিন্যাস কি স্বাভাবিক? এর মধ্য থেকে ন্যায়শাস্ত্রী রামমোহন উঁকি দিচ্ছেন। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না: "কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের রচনাপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"[১০] রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনা, বেদান্তগ্রন্থাদির টীকাভাষ্য ও অনুবাদের ভাষার মধ্যে এই ধরনের অনভ্যস্ততা ও জড়তা লক্ষ্য করা যাবে। তাঁকে যাঁরা "The pioneer of literary prose"[১১] বলে সম্মান দেন, তাঁরা যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে এই দিকটি ভেবে দেখেন না।

অবশ্য রামমোহনের যে রচনাগুলি কিঞ্চিৎ বিবৃতিমূলক, তার ভাষায় এই শাস্ত্রঘেঁষা পদবিন্যাসের ত্রুটি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, যেমন— 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বা বিতণ্ডামূলক কিছু কিছু রচনা। 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ', 'পথ্যপ্রদান'— এগুলির ভাষায় দ্বন্দ্বের আভাস, প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করবার এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে বলে রামমোহন শাস্ত্রমার্গের অনভ্যস্ত ভাষা-ভঙ্গিমা এই সমস্ত রচনায় সাধ্যমতো বর্জন করেছিলেন। এই রচনাটির স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়:

> "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" ('প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ')

এ ভাষাকে কিন্তু 'modern prose' বলতেই হবে। রামমোহনের শাস্ত্র-মার্গীয় রীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হয়নি বটে, কিন্তু এ ভাষা অধুনা-প্রচলিত রীতি থেকে কি পৃথক? বাংলা গদ্যের ব্যবহার ১৬শ শতক থেকে চলে আসছে। রামমোহন এখানে সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন। এই স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও সরল রীতি তাঁর সৃষ্টি নয়, তাঁর আগে থেকেই এর অনুশীলন চলে আসছে। তাঁর

সময়েও অনেকে এই রীতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি', রামরাম বসুর 'লিপিমালা', কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন', গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রমথনাথ শর্মা) 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিবিলাস' ইত্যাদি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এই সাধু-রীতিতে রচিত। এই সাধু গদ্যরীতি তৎকালীন যাবতীয় সাময়িক পত্রে ( বঙ্গাল গেজেটি, দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা, বঙ্গদূত প্রভৃতি ) ব্যবহৃত হত। তথাকথিত 'ইয়ংবেঙ্গল'গণ যে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ করেছিলেন তাতেও এই সাধুরীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়-কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই রীতিই স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ করলেন, তখন তিনিও এই ভাষা অনুসরণ করেছিলেন। এই বিবৃতিমূলক গদ্যকে রসসমন্বিত করে বিদ্যাসাগর যুক্তিতর্কের সঙ্গে সরসতা, লালিত্য ও শ্রুতিসৌকর্য সৃষ্টি করে বাংলা গদ্যের যে রীতি নির্ধারণ করলেন, পরবর্তী কালে এক শতাব্দী ধরে বাংলা গদ্য সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

রামমোহনের যুগে সাধুরীতির সঙ্গে মাঝে মাঝে কেউ কেউ চলিত সংলাপের বাক্‌রীতি ও কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেরীর 'কথোপকথনে' কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত চলতি শব্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্যুঞ্জয় এই ধরনের ভাষায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় চলতি গ্রাম্য শব্দ, একটু অমার্জিত ও রুচিকটু হলেও, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ও গ্রাম্য রসিকতাকে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের পংক্তিভোজ সম্মানের আসন দিয়েছেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র ( ১৮২২ ) ভাষাতেও এই ধরনের সহজ সংলাপের ( কিন্তু মার্জিত ) রীতি অনুসৃত হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রে জনরুচির অনুরোধে রসিকতাপূর্ণ তরল পরিহাস-সংবলিত হালকা রীতি ব্যবহৃত হত। কিন্তু রামমোহনের ভাষায় অনুচিত লঘু পরিহাস নেই বললেই চলে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে লিখেছিলেন 'পাষণ্ডপীড়ন'। এর রুচি নিন্দনীয়, কিন্তু ভাষার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝ বিশেষভাবে উপভোগ্য। রামমোহন সেই কদর্য গালির জবাবে লিখেছিলেন—'পথ্যপ্রদান'। এতে কুরুচিপূর্ণ নিন্দা-বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই, এ ভাষায় আছে প্রতিপক্ষের কুযুক্তি দেখিয়ে তাঁকে স্বমতে আনার চেষ্টা। তাই তাঁর ভাষা সংযত,

স্থির— কিন্তু স্বাভাবিক উত্তাপবর্জিত। রামমোহন মদ্যমাংস সেবন সমর্থন করলে কাশীনাথ তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বললেন :

> "এ সকল কথা শুনিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি সকল গর্হিত কর্ম করিলেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়িডোম চাঁড়াল-মুচি— ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে? ইহাদিগকে কেন ব্রহ্মজ্ঞানী কহা না যায়? তাহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সকল (রামমোহন ও তাঁর অনুচর-বর্গ) হইতেও এই সকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না।" (পাষণ্ডপীড়ন)

রামমোহন এর প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন যে, নীচ যদি দুর্বাক্য বলে, তা হলে সুজন কি তাতে দুঃখ পায়? বরং তাতে হাসে। কাক-ভেক-গর্দভের চীৎকারে কেউ কি নগর ত্যাগ করে যায়? এ ব্যঙ্গ শালীনতাকে কোথাও লঙ্ঘন করেনি, অথচ ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। তবে কাশীনাথের ব্যঙ্গের অম্লাক্ত তীব্রতা রামমোহনে অনুপস্থিত।

রামমোহনের গদ্যরীতি সংস্কৃত টীকাভাষ্যের খানিকটা ধার ঘেঁষে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং সেইজন্য এ গদ্য স্বচ্ছন্দরীতির বিরোধী। আমাদের মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র (১৮০৮) ভাষাতে বাংলা গদ্যের সেই প্রাণবস্তু ও রীতি যথার্থ অনুসৃত হয়েছে, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশে অনুশীলিত হয়ে আসছিল এবং যা পরবর্তী কালেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। রামমোহন যেখানে সেই রীতি অনুসরণ করেছেন, সেখানে ভাষা অনেকটা স্বচ্ছন্দচারী হয়েছে। সুতরাং যাঁরা বলে থাকেন যে, রামমোহন সাধু বাংলা গদ্যের স্রষ্টা, তাঁদের এ মন্তব্য যে পুরোপুরি যুক্তিসহ নয়, তা আমরা ইতিপূর্বে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। রামমোহন গদ্যকে বিতর্কবিচারে প্রয়োগ করে একটা নতুন দিক খুলে দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর ভাষা থেকে পুরনো বাক্‌রীতি ও সংস্কৃতানুসারিতা সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি বলে এ রীতি বাংলা গদ্যে গৃহীত হয়নি। পরবর্তী কালে, দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ডাফ্ সাহেবের ***India and India's Mission*** গ্রন্থকে আক্রমণ করে ইংরেজীতে **'Vedantic Doctrines Vindicated'** প্রবন্ধ লিখে এবং বাংলায় তার অনুবাদ করে ডাফের বেদান্তবিরোধী কুৎসা ছিন্নভিন্ন করেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছিল এই 'তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা'য়। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে সমর্থন করে এবং বহুবিবাহের বিপক্ষে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন তাতেও এই বিতর্ক ও বিচারের রীতি অবলম্বিত হয়েছিল; সে ভাষা যথার্থ বাংলা গদ্যরীতিকেই অনুসরণ করেছে, তাতে সংস্কৃত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ভাষারীতির প্রভাব নেই। কিন্তু রামমোহনের ভাষার অনভ্যস্ত ছাঁদ থেকে পুরাতন ধরনের বচনবিন্যাস পুরোপুরি অপসৃত হয়নি, তা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে।

রামমোহন আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ। জ্ঞানবাদ, যুক্তি, প্রয়োগ-বিজ্ঞান, উপযোগবাদ, প্রত্যভিজ্ঞামূলক আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি আধুনিক পূর্বহেতুকে অবলম্বন করে তিনি নবজীবনের নান্দী পাঠ করেছিলেন এবং প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতিকে যুগমানসের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বাংলা গদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। সুললিত গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্তে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন।

**অনুলেখ : মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন ও বেদান্ত**

আমার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে শ্রীযুক্ত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮) পত্রে রামমোহন ও বেদান্ত সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এখানে তাঁর মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই প্রবন্ধে আমি দেখবার চেষ্টা করেছি যে, রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন এ দেশে এমন কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক থেকেই বাংলার শিষ্ট-সমাজে বেদান্তের অনুশীলন চলে আসছে। চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্তদের অনেকেই প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে তাঁরা চৈতন্যপ্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্ত হয়েছিলেন। অদ্বৈত আচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য (সার্বভৌম), স্বরূপ-দামোদর —সকলেই চৈতন্য-সংস্পর্শে আসবার পূর্বে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। এ ছাড়া মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদীরা ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং রামমোহন পূর্ব-ধারারই অনুবর্তন করেছেন— অবশ্য দেশভাষায়, দেবভাষায় নয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রথমতঃ রামমোহনের পূর্ববর্তী বাঙালী

বৈদান্তিকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের সামনে বেদান্তের শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত কাকে বলে জানত না।"* কিন্তু একটু সন্ধান করলেই দেখা যাবে, রামমোহনের পূর্বেও দেশের শিক্ষিত সমাজে বেদান্ত চর্চার রীতিমতো রেওয়াজ ছিল। চৈতন্যযুগে বা তারও পূর্বে শিষ্টসমাজে বেদান্তচর্চা তো ছিলই, এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত-সমাজও বেদান্তের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বেদান্তসূত্রের ভক্তিপন্থী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সাধারণ-সমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই বেদান্ত সুপরিচিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর রচনার নানা স্থানে বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করেছেন— যথাসাধ্য ব্যাখ্যাও করেছেন। সুতরাং রামমোহনের পূর্বে বেদান্তের মূল কথাগুলি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল না তা নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তের ছিটেফোঁটা সাধারণ সমাজে যতটা জানা সম্ভব ততটাই প্রচলিত ছিল। কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে অনক্ষর লোকসমাজে বেদান্ততত্ত্ব যে প্রচারিত হয়নি, তাও জোর করে বলা যায় না। তবে পূর্বতন বৈদান্তিক ও রামমোহনের মধ্যে একটি বড়ো রকমের পার্থক্য আছে যেটি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ততটা লক্ষ্য করেননি। পূর্বতন বৈদান্তিকেরা পুরাণ ও বেদান্তকে অবিরোধে গ্রহণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে, পৌরাণিক দেবতত্ত্ব এবং বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব— উভয়ই হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য। ধর্মাচরণে যে নিম্নাধিকারী, শুধু কাম্যকর্মেই তার অধিকার। কিন্তু যিনি ধর্ম জগতের অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করেছেন, শুধু তিনিই বেদগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। অর্থাৎ বেদান্ত পুরাণবিরোধী নয়, উভয়ের মধ্যে সহজেই সহাবস্থান চলতে পারে। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে পুরাণ ও বেদান্তের মধ্যে নিত্যবিরোধ বর্তমান। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত

* সম্প্রতি শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে বেদান্তসূত্রের একটি পুঁথি দেখিয়েছেন, সেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্যে বেদান্তসূত্রের অনুবাদ। এটি রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' রচনার অন্তত: দশ বৎসর পূর্বে অনূদিত হয়েছিল। সম্ভবত: ওয়ার্ড সাহেবের নির্দেশে কোনো বাঙালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এটি সরল বাংলায় অনুবাদ করেন। পুস্তিকাটি শীঘ্রই শ্রীরামপুর কলেজ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

করেছিলেন বোধ হয় ইসলামী 'মুওয়াহিদ্দিন' মতের আদর্শে। বেদান্তে তিনি শুধু একেশ্বরবাদ পেয়েছিলেন। তাই বহুদেবদেবীর-বর্ণনায়-পূর্ণ পুরাণকথাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর মতে, পুরাণ সম্পূর্ণরূপে অতিরঞ্জিত, ভ্রান্ত ও দুর্নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল একেশ্বরবাদী বেদান্তই একমাত্র শরণ্য। ইতি-পূর্বে বাংলা দেশে এ ভাবে কেউ পৌরাণিক ধর্ম, আচার ও আদর্শের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিকূলতা করেননি। চৈতন্যদেব পুরীধামে বাসুদেব ভট্টাচার্যের ( সার্ব-ভৌম ) সঙ্গে এবং কাশীধামে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদান্তের ভাষ্য ও তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও মুমুক্ষা— উভয়কেই প্রত্যবায় বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে বেদান্তসূত্রের একমাত্র অর্থ— শুদ্ধা ভক্তি। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মত ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে রফা করেননি। তাই তদানীন্তন সমাজে তিনি এতটা তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন।

অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আমহার্স্ট্‌কে লেখা রামমোহনের চিঠি সম্বন্ধে বলেছেন, "আসলে লর্ড আমহার্স্ট্‌কে লেখা রামমোহনের পত্রটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মত জানবার চেষ্টা করা বৃথা। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৩) পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, এই ছিল বড়লাট সকাশে রামমোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন হিন্দু দর্শনের প্রায় সমস্ত বিভাগের, এমন কি বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি" ( 'সমাকালীন', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ )। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য— রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমহার্স্ট্‌কে পত্র দিয়েছিলেন, তা ঠিক বটে। কিন্তু যে-বেদান্তের ওপর রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকেও তিনি আক্রমণ করলেন—এর দ্বারা রামমোহনের চিন্তা-লোকে প্রচ্ছন্ন একটা সূক্ষ্ম স্ববিরোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি? ধর্মাচার বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন 'কাল্‌ট্' প্রতিষ্ঠা করতে উন্মুখ হননি; জীবনে ও আচরণে অতিশয় তীক্ষ্ণ 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক' রামমোহন ধর্মের পরিবর্তন ও ঐক্য-সাধনের জন্য রাজনীতি ও সমাজনীতিকেই অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, অন্ততঃ রাজনীতি ও

সমাজকল্যাণের জন্যও হিন্দুর সমাজধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন—"It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort." পূর্বতন বেদান্তবাদী ও আধুনিক রামমোহনের মধ্যে এইখানেই প্রভেদ। রামমোহন বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদ (বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদ এক বস্তু নয়, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে) প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এর মূল কারণ মানুষের ভৌম জীবনের কল্যাণসাধন এবং ইহজীবনের সুখসংবিধান—পরত্র তাঁর অন্বেষার বাইরে। কাজেই বেদান্ততত্ত্ব ছিল তাঁর মস্তিষ্কজীবী সত্য, জীবনচর্যায় অত্যাবশ্যক ছিল না। তিনি বেদান্তের নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেও ধর্মচর্চার জন্য গিরিদরী-বনভূমিতে গিয়ে সুকঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন বোধ করেননি। আবার আবেগপ্রবণ ভক্তের মতো ঈশ্বরের লীলারসে ডুবে গিয়ে মর্ত্যসত্তা বিস্মৃত হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বেদান্ত উপনিষদের কথা পুনঃ পুনঃ বললেও তিনি শঙ্করাচার্য নন, রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব-বল্লভাচার্যও নন। এক কথায় তিনি মধ্যযুগীয় সাধক ছিলেন না, প্রাচীন যুগের নিষ্কল ব্রহ্মবাদীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের মানবাদী, হিউম্যানিস্ট্। তাঁর প্রধান অবলম্বন *l'uomo universale*— মানবসত্তার সমগ্রতা, বিশ্বমানবতা।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. রামমোহন সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন, "He was by nature one of those who lead, not one of those who follow, one of those who are in advance of, not of those who are behind their age."

২. বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উনিশ শতকের গদ্য থেকে যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, পাঠকের বোধসৌকর্যের জন্য সেখানে আধুনিক বিরামচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দু' দশকের গদ্যে শুধু দাঁড়ি চিহ্ন ছাড়া অন্য কোনো বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহৃত হত না।

৩. কেরীর জীবনীকার স্মিথ সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, "Against

**Vedas and Upanishadas, Brahmanas and epics he set the sanskrit Bible."**

৪. ১৮১৮-২৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কেরী যে বিরাট অভিধান (*A Dictionary of the Bengalee Language*) মুদ্রিত করেন, তার ভূমিকায় তিনি বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার মোটেই সুদৃষ্টিতে দেখেননি।

৫. 'কবিতাকারের সহিত বিচার'।

৬. মৃত্যুঞ্জয় সেকেলে পণ্ডিতি আদর্শে বাস করলেও সতীদাহপ্রথা আদৌ সমর্থন করেননি। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলেও বিলেতে গিয়ে রামমোহন সতীদাহ ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতকেই প্রামণিক হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন।

৭. 'মীরাৎ-উল-আখবর' ও 'সম্বাদকৌমুদী'।

৮. ঈশ্বর গুপ্তের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে' বলেছেন যে, তিনি রামমোহনের গদ্যে যথাযোগ্য যতিচিহ্ন দিয়ে দেখেছেন, "সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।" আবার তিনিই ১৩২২ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বলেছিলেন, "এ গদ্য (অর্থাৎ রামমোহনের গদ্য), আমরা যাকে modern prose বলি, তা নয়।"

৯. 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'।

১০. বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ।

১১. J. C. Ghosh—*Bengali Literature* (Oxford).

# বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য

১০

১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ

"রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা ('বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'পত্রাবলী'র কিছু চিঠি) সম্বন্ধে সক্ষোভে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মযোগী বলে পরিচিত। বেদান্ত-প্রতিপাদি ধর্মৈষণাকে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যয়ে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের জীবন-সমস্যাকে বলিষ্ঠ সার্থকতার দিকে প্রেরণ করেছেন। আধিমানসিক ও আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায়, আবার রজোগুণের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা যায়। মর্ত্য-ধরিত্রীর বুকে মানুষের মতো বেঁচে থাকাও যে এক প্রকার জীবনসাধনা, কোটি কোটি নরকঙ্কালের পঞ্জরাস্থির মধ্যেও যে অমৃত-নিঃস্যন্দী প্রাণধারা বহমান,— এ সব কথা তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতবাসীর কানে কানে বলেছিলেন— কখনও মৃদু আত্মগত ভাবে, কখনও-বা বজ্রনির্ঘোষে। তাঁকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায়। প্রচুর রচনা করতে হয়েছিল ইংরেজীতে। নিয়মিতভাবে বাংলা অনুশীলনের তাঁর সময় ছিল না; শুধু প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুভ্রাতাদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠিপত্রাদি, বিদেশী সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা, অল্প-স্বল্প ডায়েরী রক্ষা— ইত্যাদি কর্মে তিনি যৎসামান্য বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী বিবেকানন্দের যে বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ

করে, তার অধিকাংশই ইংরেজী রচনা বা ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্যাস-অনুবাদ— অবশ্য সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মতো অর্থবহ এবং মূলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে সম্পৃক্ত। তবে স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা' ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।

যাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষণ্ণ, তাঁদের মূর্ত ও অমূর্ত চেতনা নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প, সৌন্দর্য, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ— সব কিছুই তাঁদের কাছে একটা বিশেষ অবধারণা-সহায়ক; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তাঁদের ইন্দ্রিয়জ অপরাচেতনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তরস্নাতক হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গমত্ব অর্জন করতেও পারেন। কিন্তু তাঁদের ভৌম-চেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি যুধিষ্ঠিরের রথের মতো ভূমিচারিতার একটু ঊর্ধ্বলোক দিয়ে গতায়াত করে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মতো মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলাদেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্য-প্রবর্তিত উজ্জ্বল রসসাধনা ও শাক্ত পদকারদের বাৎসল্য ভাবাবেগের দেশ। আবেগের নির্বাধ উৎসার এবং মননের তীক্ষ্ণ তির্যকতা এদেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগে আবেগ-ধর্ম ও গণধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবেগের মধ্যেই জনারণ্যের এলোমেলো শাখাবিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মেলবন্ধনে বদ্ধ বলে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক মস্তিষ্কজীবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জীবন, সাধনা ও ইতিহাসের প্রভাবে যেমন একদিকে সমাজ, রাজনীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি শিক্ষিত জন আকৃষ্ট হয়েছেন, আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার পথ চেয়ে ভাবী 'সাহস্রিকী'র নান্দীপাঠ করছেন— তেমনি পাশ্চাত্য ন্যায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে মননের নতুন স্বরূপ নির্ধারণেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। উনিশ শতকী য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিবাদ আমাদের পূর্ব-সংস্কারকেই যেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার— বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ— এঁদের হাতে বাংলা গদ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী

প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন কতটা পাল্‌টে দিতে পারে, তা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি বোধগম্য হবে। যাকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গদ্যে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে নি। কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্‌ময় সত্তার নাড়ীর যোগ, এবং বাক্‌পুঞ্জও যে মূলতঃ গদ্যাশ্রয়ী ও মননধর্মী— উনিশ শতকের শেষ ভাগে সে সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্তুতঃ বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, আর খঞ্জই হোক— গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা গতিবেগ লাভ করেছে, মূর্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দু-চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গদ্যে শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্য রচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুর তলে প্রতিফলিত নিজের মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী, অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আপ্তবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা তাঁর পূর্বে বা পরে এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্যরচনার সবটুকু এই নরদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর বাংলা রচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাসের ভূরি সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরস নিঃস্পৃহ কৌতূহল। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.

বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে জাগে যে, এ রীতি মিসনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠে নি, টুলো পণ্ডিতের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জিত দেবভাষার ছত্রছায়াতলে এ গদ্য বিবর্ধিত হয় নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছিল, এই পয়ার জাতীয় ছন্দকেই স্বচ্ছন্দে সাধু গদ্যরীতিতে পরিবর্তিত করা যায়; তাই পয়ারের দ্বারাই

মধ্যযুগের যে-কোনো মননকর্ম নির্বাহ সম্ভব হয়েছিল। পয়ারের মধ্যে একটা বিপুল শোষক শক্তি আছে, যে-কোনো অর্থবহ মননপ্রবাহকে চৌদ্দ মাত্রার পয়ার পংক্তির মধ্যে পরিস্থাপনা করা যায়— তা সে মঙ্গলকাব্যের গদ্যাত্মক বিবৃতিই হোক, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক রচনাই হোক। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে গদ্যরীতি ব্যবহার সে যুগে যে অপ্রচলিত ছিল তা নয়। তবে বৃহৎ সাহিত্যকর্মে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি বড় একটা ব্যবহার করা হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গদ্যাত্মক কাজ অক্লেশে নির্বাহ হত। উনিশ শতকের বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে; আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষাকেই সহজে ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। এ আবিষ্কার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্লবী। বস্তুত গোটা উনিশ শতকের বাঙালী-মানস যে আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, এর মূল দায়িত্ব বাংলা গদ্যের।

আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। সাহিত্যসৃষ্টি এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মাত্র চারখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন— 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এ ছাড়াও 'পত্রাবলী'তে তাঁর কিছু কিছু বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে। বাংলা চলিত রীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞেরা জানেন। কিন্তু সাধু-রীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্যের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এবং তামসিক অনীহার গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্য-শাসিত সমাজের মূক জনারণ্যে মানস-পরিক্রমা করেছেন, এবং সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ইএ প্রাচীন জাতির উত্থান ও পতন, উদ্গতি ও অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে

হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি— তৎসম শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা ; আর একটি— খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১. "সৈন্য সহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে ; কিন্তু বৈশ্যকুল রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চির-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে……।"

২. "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।"

'বর্তমান ভারতে'র এ দুটি দৃষ্টান্তই সাধুরীতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীর্ঘবিস্তারী বাক্‌রীতি, গুরুভার শব্দসংযোজনা এবং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্নিবেশে এ রচনাটি হয়েছে মন্থর। অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসংখ্যা লঘু, উপবাক্যের সংখ্যা ন্যূনতম। এর কারণ— প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজ-বিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট ছোট বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা

লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে। প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার প্রকাশ— সম্মুখে সহস্র মানুষের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি ; দ্বিতীয়টিতে শিষ্য ও গুরুভাইদের সামনে নরেন্দ্রনাথের মৃদু ভাষণ, যার মূল লক্ষ্য শ্রোতার বুদ্ধিকে দীপিত করা।

কখনও কখনও বীর সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মত্ত সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন :

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমাব প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমাব শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতেব মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমাব দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের *Egalite' liberte' fraternite'*-এর অশনি নির্ঘোষ এর প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃৎস্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, তন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ— যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মন-প্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।

স্বামীজীর সাধুভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লাসিক গদ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দযোজনা প্রভৃতি বাক্‌পদ্ধতি মননধর্মী রচনাকে বহু মনের চিন্তার বাহন করে তুলতে পারে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'য় পাওয়া যাবে। অতিকায়, গুরুগম্ভীর, সমাস-বদ্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন— তাঁর সাধুভাষায় প্রায়শই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ তাঁর সাধুভাষার অনেক জায়গায় চলতি রীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়। কোন

কোন সময় তাঁর আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাগবত মহিমা ফুটে ওঠে :

> "কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে ; কেবল আমরা বলি, হে ওজঃস্বরূপ ! আমাদিগকে ওজস্বী কর ; হে বীর্যস্বরূপ ! আমাদিগকে বীর্যবান কর ; হে বলস্বরূপ ! আমাদিগকে বলবান কর !"

এই কয়ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্ষবাণী, কোন্ অলক্ষ্য থেকে আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

৩.

স্বামীজী-অবিলম্বিত যে রীতিটি বিস্মিত প্রশংসা আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', কিছু চিঠি এবং 'ভাববার কথা'য় সংকলিত দু' একটা বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ— এই কয়টি মাত্র তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। কিন্তু সামান্য রচনাতেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের চলিত রীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাণীবাহক। সাধু-রীতিটি অধিকতর পুরাতন, তা স্বীকার করতে হবে। তিন-চার শ' বছর আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত ; অবশ্য কাব্য ও গীতিকায় আঞ্চলিকভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য ছিল না। যাঁরা মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল আর সপারিষদ কেরী সায়েব বাংলা সাধু-ভাষা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, ভুঁইফোঁড়ও নয়। বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্ত্বেও সাধুভাষাই দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বাঙালী-মানসকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্য-সভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী— যাঁরা নানা স্বার্থ-সন্ধানে কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল। যাই হোক উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল। রঙ্গরস, সাময়িক-পত্রে আর্যাতর্জা, "ঠন্‌ঠনের হঠাৎ-অবতারগণের"[১] মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে

লাগল কলকাতার ককনি ভাষায়। নাটকে ভদ্রেতর সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রম্যন্যাসেও কলকাতার ভদ্রসমাজের চলিতভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার ককনি বুলিতে— মায় ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণে ছাপা হল। প্যারীচাঁদ মিত্র হালকা চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদও ব্যবহারও করেছিলেন— কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেন নি, তাঁর রচনার বহু স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের গোলমাল রয়ে গেছে। ভাষার এ-ব্যাধিটি সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে সাধু-চলিত মিশ্রণ অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন— অনেকটা দুধ ও জলের সংমিশ্রণের মতো। মধুসূদন প্যারীচাঁদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর কারণ প্যারীচাঁদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার সাহায্য নেন নি। হুতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা ককনির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমনকি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক্-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী; কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেন নি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি *Calcutta Review* পত্রে বিশুদ্ধ চলতি ভাষার পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন; সাধুভাষা, বিশেষতঃ তৎসম শব্দের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেন নি। অবশ্য শ্যামাচরণ বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মারফতে চলিত ভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত

ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন।, ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিত ভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোযায়ী বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা আলোচনা করেছিলেন, হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপের বসান চড়াবার জন্য কলকাতার বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা— সমস্ত ব্যাপারেই চলিত ভাষা ব্যবহারে বিবেকানন্দ যেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চলিত ভাষার অনেকস্থলে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি— সেই ভাষাই মনের ধাত্রী, এরকম একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি লেখায় তাঁর মনের ভাব চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন

"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই • সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলায় একটা কিম্ভূত কিমাকার উপস্থিত কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।" ('ভাববার কথা')

তাই তিনি প্রস্তাব করলেন— "যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকাতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকাতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।" এ কথাটাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন আরও এক-দশক পরে।

স্বামীজী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হুবহু অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন:

"যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্ রে সে কি ধূম— দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে "রাজা আসীৎ"। অহাহা! কি

পঁ্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ! —ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণও নেই।"
( 'ভাববার কথা' )

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত; প্রাণবান, জীবন-রসিক ও নিঃস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। হুতোমের স্ল্যাং বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপঁ্যাচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায় নি— যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজকে' দর্শন ইতিহাস-সমাজ সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে। যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল— কারো ভাষাই সাহিত্যের যথার্থ চলিত ভাষা নয়। হুতোমের ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বে-আব্রু যে, তাঁর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্ন মন্তব্য খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। হুতোমের ভাষা, একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্‌ময় পায়চারি। এর কোনটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র গদ্যই চলিত ভাষার আদর্শ। 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটা বেশী ফুটেছে।

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি যে বিচিত্রমুখী— অনেকটা সহস্রমুখী বজ্র-মানিকের মত, তা বোঝা যাবে তাঁর উল্লিখিত দু'খানি পুস্তিকা থেকে। যে-ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছাই— সেই সহজ, প্রত্যক্ষ, সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির পক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্র ও অন্যান্য রচনায় সাধ্যমতো এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য— শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মতো। যেমন:

"আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্তই করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করেই হক, সমুদ্রে যাবেই, দু-একদিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু'একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর ভাষাভঙ্গিমা বাধাহীন ও স্বচ্ছ; অনাবশ্যক তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই। লেখক চলিত ভাষার মুদ্রাদোষগুলিও ('ইদিক উদিকে') নিয়েছেন। তাই বলে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্গহস্ত হন নি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে-কোনো অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকী ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়বে। যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন "প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়— কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়"— তখন এ ভাষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ হল দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অন্তর্ভুক্ত। "যাঁর বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন"— বীরবলের এ সমস্ত উইটের ফুলঝুরি মার্জিত রুচির তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম— কিন্তু এ ভাষা মোজাইকের মতো চিত্র-বিচিত্র, ঝরণার মতো ঝরঝরে নয়। স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলায় ইতর-ভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান।

অতঃপর স্বামীজীর বিবৃতিমূলক পরিচ্ছন্ন গদ্যরীতির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

"এবার ভূমধ্য সাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই— এসিয়া আফ্রিকা প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার, বিহার, পরিচ্ছদ,

আচার-ব্যবহার অ রম্ভ হল, ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়— নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দী ব্যাপী যে মহাসংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে স মিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে।" ('পরিব্রাজক'

এখানে লেখক দুই সভ্যতার মিলনতীর্থকে নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই এতে ঘটনা বিবৃতি ছাড়া আর কোন সাহিত্যের কৌশল নেই। কিন্তু সাদাসিধে বর্ণনাই বিচিত্র রূপময় হয়ে ওঠে, যখন আবেগের ছোঁয়া লাগে, তখন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের কণ্ঠে কল্পনার খেলা শুরু হয়ে যায়

"জাহাজ একবার সাদা জলের ওপর ও কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল এবার খালি নীলাভ, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী, মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণ তাণ্ডবে মত্ত হয়েছে।" 'পরিব্রাজক')

এ বর্ণনায় তৎসম শব্দালঙ্কারের প্রয়োজন ছিল। বঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রোল্লাসের রূপ ধ্বনিময় চিত্রাঙ্কন শুধু তদ্ভব বা দেশজ শব্দেই সার্থক হতে পারে না, তাই তিনি চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজন স্থলে অনেক আভাঙ্গা শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। যেমন ধরা যাক এই দৃষ্টান্তটি— "সে পর্বত নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক সমুত্থিত ভাবনিক শমোহিনী সঙ্গীত মনীষিমনঃসংঘর্ষসমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত তারও শেষ" ('পরিব্রাজক')। এখানে শুধু একটি দুটি অসমাপিকা আর একটি সমাপিকা ক্রিয়া ভিন্ন আর সমস্ত শব্দই তৎসম, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ ও বিশেষ্য মণিকাঞ্চনের মতো দৃঢ় নিবদ্ধ, এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ সহায়ক। আবার তিনি যখন স্নিগ্ধমধুর বর্ণনায় লেখনী চালনা করেন, তখন আর এক প্রকার কোমল, পেলব, পরিচিত ও প্রসন্ন তদ্ভব দেশী শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেমন:

"জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—

এতে কি রূপ নাই ? সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার। তার নীচে ঝোপ, তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে, ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা। আম নীচু জাম কাঁটাল--পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানী গাল্‌চে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস যতদূর যাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে।" ( 'পরিব্রাজক' )

এর মধ্যে বাংলা দেশের শ্যামযমান অরণ্যানী, রৌদ্রস্নাত ধান ক্ষেত আর নীলাম্বরী আকাশ যেন রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখেদেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাংলা দেশের কোন্ গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে সার্থক, প্রাণবন্ত, রসধ্বনিময় হতে পেরেছে? অথচ এ বর্ণনায় স্বামীজী কৃত্রিম কাব্যকলার মায়াঞ্জন একেবারেই ব্যবহার করেন নি। চিঠিতে সমুদ্রের বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা তাঁর ধাতে সয় না — "ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্য কোথা পাই বল ?" কিন্তু বর্ণনধর্মী রচনায় স্বভাবোক্তি অনুসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পসৃষ্টি করেতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এই ছত্র ক'টি— যদিও এ বাক্‌রীতি বিলম্বিত— উপবাক্যের সমন্বয়ে একটু দীর্ঘ, তবু এর ভঙ্গিমায় শব্দের টঙ্কার ও ঝঙ্কার মিশে গেছে প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণ দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে, এবং সেটা বেমানান হয় নি, কারণ এতে প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুকের সুর মেশানো আছে।

"কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-নীহার মণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, ডিঙ্গুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে, কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি-ইঁদুর ছুঁচোমুখরিত একতালা ঘরের মধ্যে দিনের বেলা প্রদীপ জ্বেলে আর কাঠের তক্তায় বসে থেলো হুঁকো টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত

ক্ষোরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। ( 'পরিব্রাজক' )

স্বামীজীর বিবৃতিধর্মী চলিত গদ্যে কখনও লক্ষ্য করা যাবে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি ( যেমন 'পরিব্রাজকে'র ভ্রমণ বর্ণনা ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা ), কখনও চলিত ভাষার মধ্যেই তৎসম শব্দের নির্ঘোষ, কখনও তৎসম-তদ্ভব-দেশ-বিদেশী শব্দের একান্নবর্তী পরিবারেব মধ্যে মিলে মিশে থাকার আশ্চর্য দক্ষতা। একই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন— "সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়"— আবাব তারই সঙ্গে, "কর্দমাবিলা হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা সহস্রপোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার" বর্ণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি রূপরঙের নেশায় গঙ্গামায়ের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও-বা কল্পনা করে শিউরে উঠেছেন— "পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নী।"

বিবেকানন্দ বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী চলিত গদ্যরীতির মধ্যে বহুস্থলে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। চলিত ভাষাতে এরকম গাঢ় বাক্‌পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দৃঢ় গাঁথুনির বাক্‌পুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিত ভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে এমন চমৎকার মিশিয়ে নিতে পারতেন যে, ইদানীন্তন কালের কোন দুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কুচিত হবেন। যেমন স্বামীজীর এই বর্ণনা :

"ত্রিংশ কোটী মানবপ্রায় জীব—বহু শতাব্দী যাবৎ স্বজাতি-বিজাতি-বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎবিহীন, যেনতেন প্রকারেণ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরী প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য ভীষণ কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধময় মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।" ( 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' )

একটিমাত্র বাক্য, সমাসবদ্ধ শব্দের শিকল— যা অনিপুণ কারিগরের হাতে

পড়লে জড়ীভূত রোমন্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীর বিচিত্র কৌশলে সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যের প্রতি বলদর্পিত পাশ্চাত্ত্যের ঘৃণাধিক্য চমৎকার ফুটেছে। এখানে এর চেয়ে হালকা ছাঁদের শব্দ ব্যবহার করলে যথেষ্ট তীব্র হত না, তাই চলিত ভাষার মধ্যে তিনি অবলীলাক্রমে দেবভাষার সাহায্য নিয়েছেন। আবার পাশ্চাত্ত্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞ মনোভাব কৌতুকঘৃণামিশ্রিত ভাষায় চমৎকার ফুটেছে:

"আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচে,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!" ('প্রচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

আমাদের বক্তব্য হল, চলিত রীতিতে তিনি শুধু তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করেন নি, বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন। হুতোম টানা গদ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন[৩], উত্তর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, যা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাষাকেই বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই মৌখিক সংলাপের ঢঙটা নিয়েছেন। যেমন— "খাবার সময়ে শত ছোরার চক্-চকানি, আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষী ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁর গায়েই বা বসায়— ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা! বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের গোঁসাইজী ত কিছুই বলেন না।" এ ভাষার কৌতুকরসটাকে একেবারে আটপৌরে ভাবে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা এখনও ভদ্রাভদ্র সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের চলিত মুখের কথাকে কোনও দিন অসম্মান করেন নি, চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। দু-চারিটির দৃষ্টান্ত:

থ্যাদা-বোঁচা ভাইবোন; হাঁকোচ-হাঁকোচ গরুর গাড়ী; দ্যাল (দেয়াল); বে (বিয়ে); ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-কায়েতের বাপদাদা করেছে; লাথি-ঝাঁটা; হাত চুবড়ে সপাসপ দালভাত খাই; সোঁদোর বন;

যাত্রীরা আকার করে অস্থির, আড়ড় গা, জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে, ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন, মাগ, অ্যাদাড়ে, মাগী, বিবি পর্যন্ত বে' করা চলে, এ ডেলাগা ছেলে, গো-দেড়োন দিলে, ছুঁতছাতের ন্যাঠা (ল্যাঠা), শোবের মাংসো. চক্কর, পা ফেটে চৌচাকলা, হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে, ভুড়িনারা বদহজমের প্রথম চিহ্ন, কলের জলের ভুতো বাপান্ত করে।

এখানে খুব বেছে বেছে উদাহরণ তোলা হয় নি, যেমন চোখে পড়েছে তেমনি তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এ শব্দগুলি অধিকাংশই আমরা ঘরে ব্যবহার করি, বাইরে হয়তো একটু পোষাকী পালিসের সাহায্য নিই। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' লঘু-রসের কথায় এ ধরনের শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন—এমন কি কলমের ডগায় নেমে-আসা প্রাকৃত শব্দকে গম্ভীর আলোচনাতেও সরিয়ে রাখেন নি। জীবনে তিনি ছুঁতমার্গের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, ভাষাতেও ছুঁই ছুঁই বাতিক তাঁর একেবারেই ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কী-দরজার শব্দকে কখনও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেন না। অবাসা বৈদগ্ধ্যে আধুনিক রীতিতে প্রবল চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাকে 'মেয়ে বাওয়া'র শ্রম সহজে করে তুলেছেন।

৭.

বিবেকানন্দ চলিত বাংলা রীতিকে যে রকম চমৎকার রসিকতার সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সদাগম্ভীর বাঙালী উচ্চসমাজে তার জুড়ি মেলা ভার। রসিকতা প্রসন্ন মনের ধর্ম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্ষুব্ধ মনের ধর্ম। মাঝে মাঝে স্বামীজী রসিকতা করতে করতে তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝালো শব্দ নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন জীবনরসিক—যে বৈশিষ্ট্যটি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। খুব উদার হিউমার অনেক সময় সাধুভাষাতেই যেন বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবেকানন্দের চলিত ভাষায় যত্রতত্র আশ্চর্য পরিহাস ও তির্যক ব্যঙ্গের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাবে। 'পরিব্রাজকে' সুয়েজখালের হাঙর শিকারের বর্ণনায় হাঙরের প্রতি সম্ভ্রমবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সহজ রসিকতাকে তিনি মজলিসী করে তুলেছেন:

"মনে হল উনি বুঝি হাঙ্গরের বাচ্চা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তা নয়।

ওর নাম বেনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে · ওর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল।"

হাঙর ধরা দেখবার জন্য তাঁরা জাহাজের ডেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন :

"আমরা উদগ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য, 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্য মানুষ যে প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি, শ্যাম না এলো'।"

তারপর কিভাবে হাঙর টোপ গিলে কেনও প্রকারে টোপের বঁড়শি খুলে পালাল, অন্য একটা 'থ্যাবড়া' হাঙরের আবির্ভাব হল, শুয়োরের মাংস সমেত বঁড়শি গলাধঃকরণ করল, তারপর 'দে টান, দে টান' করে তাকে জাহাজের ডেকে তোলা হল, স্বামীজী তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। সাদা লাল রঙের বঁড়শি-বিদ্ধ শূয়োরের মাংসের বঙ্কিম উপমাটিও grotesque রসের আশ্চর্য উদাহরণ—'আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙবেরঙের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে—" একেই যথার্থ মজলিসী রসিকতা বলে। তারপর টোপে-গাঁথা বিরাট হাঙর ধরা, জাহাজে টেনে তোলা, 'ফৌজি ম্যানে'র মুমূর্ষু হাঙরের ওপর দুমদুম্ করে কড়িকাঠ প্রহার করে বীরত্ব প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি করুণহৃদয় মহিলাদের শোকার্ত বিলাপ বর্ণনা ("আর মেয়েরা— আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতে ছাড়বে না।") অনাবিল রসিকতার সার্থক দৃষ্টান্ত। বস্তুত: এই জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নিঃস্পৃহ মনের ধর্ম, যা বৈরাগ্যব্রতীদের মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বামীজী তো গিরিদরীবাসী মুমুক্ষু সাধকমাত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তস্তলেই তিনি তাঁর আসন পেতেছিলেন ; তাই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্য পরিহাস তাঁর বিশাল হৃদয়কে সুধারসে সিক্ত করেছিল। তাঁর এই ব্যঙ্গ ও পরিহাস কি রকম অর্থবহ হয়েছে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে :

"ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন,

আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের দুচার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন করতে হবে বুঝি?" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে পরিহাস তীব্র ব্যঙ্গের রূপ ধরেছে। আর্যামির অভিমান আর সমাজের নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা, স্বামীজীকে রুদ্ররোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বারবার। উচ্চ-বর্ণের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী এখনও কানে ভেসে আসছে।

"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ডম্ম্ম্[4] বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।"

এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রূপ করে তিনি ধারালো কণ্ঠে বলেছেন —"এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরুমরীচিকা, তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল, লুঙ্-লঙ্-লিট সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন।" বলতে বলতে তিনি ভারতের হীন অন্ত্যজ মানুষের দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের বিলুপ্তি সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহ্ গুরুকি ফতে' বলে নতুন ভারত বেরিয়ে আসবে। সেই ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজি যেন দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আবিষ্ট হলেন

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।" ('পরিব্রাজক')

এ যেন স্তোত্র— 'প্রাণায় স্বাহা' বলে পূষণের কাছে হবিঃ দানের দিব্য মুহূর্তে উচ্চারিত উজ্জীবন মন্ত্র।

বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয় নি; বাংলা গদ্য রীতি গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তৎসম-তদ্ভব, দেশজ শব্দ, বাইরের ভব্য ভাষা এবং ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপ-লক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে।

চলিত-ভাষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভবারূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সে যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয় নি। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চলিত গদ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে দখল করে নিল, তখনও বড় কেউ ভেবে দেখেন নি যে, তারও পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর সাহায্যে বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের লঘুকরণই যে চলিত রীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পড়লেই বোঝা যাবে। চলিত রীতির বড় কথা— চলতি জীবনের ইডিয়ম্, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নতুন রীতি, শব্দবিন্যাসের রূপান্তর। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয় ?" এই উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই কি চলতি ভাষা হয় ? সে কথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথার্থ মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, বিদগ্ধ ইষ্টগোষ্ঠীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয় নি।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' দ্রষ্টব্য

২. হুতোমের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য : "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, উহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতা শূন্য।"

৩. কলকাতার চড়ক পার্বণ উপলক্ষে হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ্ণ উক্তিতে নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে— "আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন— আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। ...... আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার। বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার ফি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে

মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, যে বেদ-ভাঙ্গা সংস্কৃত পদভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁকে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না— আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না ?”

৪. আর্যামির নিন্দা করে তিনি 'পরিব্রাজক'-এর এক জায়গায় ডম্‌ম্‌ম্‌-এর উল্লেখ করে বলেছেন : “একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে ? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌।”

# উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতনা

## রামমোহন—কেশবচন্দ্র

অধুনা কারও কারও মনে 'ধর্ম' শব্দোচ্চারণে ভীতি ও অনীহার সঞ্চার হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানমুখী, যন্ত্রমুখর ও ইহবাদী সভ্যতার বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ-চেতনা-বহির্ভূত ঐশী শক্তির সর্বতোভদ্র সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে এখনও অনেকে আস্থাশীল। কিছুকাল পূর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ভগবানসম্পর্কীয় "মস্তিষ্ক-কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি" সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, এমন কথা জড়বাদী এবং কার্যকারণাত্মক বিশ্ববিবর্তনে-বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা মনে করতেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পরমাণুতত্ত্বের বিস্ময়কর উন্নতি সত্ত্বেও শিক্ষাভিমানী প্রগতিশীল মানুষের মন থেকে ঐশী চেতনার কিছুমাত্র বিলুপ্তি ঘটে নি। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকগণ মাপজোখের সাহায্যে এবং অনুসন্ধিৎসার বকযন্ত্রে রহস্যতত্ত্বকে পরিশ্রুত করে মনে করেছিলেন— অতঃপর মানুষের কাছে কোনও কিছুই আর দুর্জ্ঞেয়, রহস্যমণ্ডিত ও ঐশী ব্যাপার বলে শ্রদ্ধাভক্তির বিল্বদলে পূজা পাবে না। কিন্তু বিশ শতকের যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও পরমরহস্যের চাবিকাঠি এখনও নিরুদ্দেশ অবস্থায় রয়ে গেছে। মেটারলিঙ্কের সেই হতাশাব্যঞ্জক উক্তিটি: "The uncertainty remains"— অনিশ্চয়তার অন্ধকার দূর হল কই? বরং নব নব আবিষ্কারের ফলে রহস্যান্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তা সে যাই হোক, ঐশী সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্নধরনের মানস-প্রবণতা মানুষের সংস্কৃতিকে যে নানা দিক থেকে বৈচিত্র্য দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে যে এর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব রয়ে গেছে, তা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ষোলআনা আয়োজন হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মবোধ ও ঈশ্বরচেতনাকে কেন্দ্র করে। বাংলা দেশ বড় বিচিত্র ভূমি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবেগোন্মত্ত রসসাধনা যেমন এদেশকে প্লাবিত করেছিল, তেমনই একই কালে নব্য ন্যায়ের ক্ষুরধার প্রকর্ষ

বাঙালী-মেধার এক অবিনশ্বর পরিচয় রেখে গেছে। সে যুগে সম্পূর্ণ আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত অনেক নৈয়ায়িক-বাঙালী ব্রজেন্দ্রনন্দনের দোহাই পেড়ে গ্রন্থারম্ভ করতেন। দেবভাষায় লেখা এ সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ও মননপ্রণালী ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি অটল বিশ্বাস এই যুগের বাঙালীর সাহিত্যাশ্রয়ী মনোধর্মকে প্রভাবিত করেছে। "কানু ছাড়া গীত নাই"—এ প্রবচনের 'কানু'কে যদি সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত করে দেখি তা হলে এর নির্গলিতার্থ যথার্থ বলেই মনে হবে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে সমসাময়িক কালের ইতিহাস ও সমাজের গভীর ছাপ পড়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-কে ছেড়ে দিলে ইতিহাসাশ্রয়ী আর কোন কাব্যই দৃষ্টিগোচর হবে না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর কোন কোন স্থানে ইতিহাসের সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু ইতিহাস ও রূপকথা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাবৎ কবিকুল তাঁদের সমসাময়িক দেশ-কালের কথাকে বড়ো একটা আমল দিতেন না। তাঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলারসে মুগ্ধ হয়ে মন্দিরা-চামর সহযোগে পাঁচালীর রীতিতে আখ্যান আবৃত্তি করতেন, কেউ-বা কীর্তনের সুরে এবং আখরের টানে এমন ভাবোদ্রেক করতেন যে, ভাবগ্রাহী ভক্তের দল ঘন ঘন দশাপ্রাপ্ত হতেন। ইতিমধ্যে দেশ ও সমাজের আমূল পরিবর্তন শুরু হল, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবির রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নামল। বর্ম-চর্মপরা কুশীলবের দল বেগম তোয়ফাওয়ালীদের কর ধারণ করে অতি দ্রুত নেপথ্যবিধানের অন্তরালে অদৃশ্য হলেন। ইংরেজ বণিকের রাজত্ব শুরু হল, ক্রমে ক্রমে শাসনে, আচরণে, শিক্ষাদীক্ষায় যুগান্তরের সূচনা হল। শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দী, পূর্বভারতের শ্যাম প্রান্তরে পশ্চিমসমুদ্রের লোনাজল তরঙ্গ-বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ল।

২.

রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল্ নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেছিল, তার চারপাশের তামাম দুনিয়া বিলকুল বদলে গেছে। যদি কোন মন্ত্রবলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়জনকে উনিশ শতকের কলকাতায় এনে ফেলা যেত, তবে সে ব্যক্তি রিপ্ ভ্যানের চেয়েও বিমূঢ় হয়ে যেত। রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষৎ-অনুবাদ ও ব্যাখ্যা,

বিচার-বিতর্ক ; ব্রাহ্মণেতর সমাজের হাতে অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রগ্রন্থের আবির্ভাব ; হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূরিভোজ ; সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন ; 'ইয়ং-বেঙ্গল'-দের যে-কোন ধর্ম-বোধ ও পারমার্থিকতার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার— এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে মনে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়-যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্ত্যের ইহমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত ধর্মচেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেল। কোনও-এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সময়ের শিক্ষিত বাংলার মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন : "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন।"[১] কথাটা নেহাত লঘুধরনের নয়। রামমোহনের যুগেই ( ১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ) হিন্দু কলেজ-প্রদত্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রভাবে জড় জগতের বাইরে অন্য কোন অচিন্ত্য চৈতন্যের কথা নবীনসমাজে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্বে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট রামমোহন বেদান্তসূত্রের অনুবাদ-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং উপনিষদের অনুবাদ প্রচার করে অপরিণত বাংলা গদ্যকে গভীর আলোচনার বাহন এবং বিতর্কের আয়ুধে পরিণত করলেন। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মান্দোলন ও বিচারবিতর্কের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা গদ্য অতি অল্পকালের মধ্যেই যৌবনের দার্ঢ্য অর্জন করল।

অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তাপ্রণালীর মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের ঐক্যতত্ত্ব (Unitarianism) এবং ইসলামীয় মোতাজেলা-মুওয়াহিদ্দিনি সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ রামমোহনের পারমার্থিক চিন্তার নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু কিনা, সে-বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। রামমোহন-আশ্রিত একেশ্বরবাদ ভৌমসম্পর্কে আকাশ-চারী। দৈনন্দিন জীবন ও কর্মব্যাপারে বেদান্ততত্ত্ব প্রয়োগ করলে গোটা জাতটাই কর্মভীরু, অলস ও দিবাস্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠবে, রামমোহনের এই ধরনের আশঙ্কা ছিল। তাই বেদান্ততত্ত্বের প্রচারক হয়েও তিনি দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনে বেদান্তের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি।[২] একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারণার মূলে রামমোহন অনেক সময়ে পারমার্থিক কারণের চেয়ে জাগতিক ব্যাপার ও বাস্তব প্রয়োজনকে অধিকতর মূল্য দিতেন। একদা তিনি তাঁর বন্ধু

ও উপরওয়ালা ডিগ্‌বিকে লিখেছিলেন যে, হিন্দুদের আচারধর্ম রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির বাধাস্বরূপ।[৩] এই উল্লেখ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষায় বেদান্তপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য 'political advantage and social comfort'; সুতরাং তাঁকে 'a theophilanthropist' বলা বোধ হয় সর্বথা যুক্তিযুক্ত হয় না।[৪] তাঁর মানবহিতৈষণা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ পারমার্থিকতাও তাঁর জীবনধর্ম নয়। বৈষয়িক জীবন ও বেদান্তচর্চার মধ্যে তিনি কখনও কখনও পৃথক সীমারেখা টেনে দিতেন, কখনও-বা সমাজ ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মতো[৫] স্থূল ও স্থাবর প্রয়োজনকে বেদান্তপ্রচারের ব্রত বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বেদান্তের মায়াবাদের প্রতি তাঁর কোন মায়া-মমতা ছিল না। কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের পোষণ ও বিকাশে তাঁর গুরুতর প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অমসৃণ ও অনভ্যস্ত বাংলা গদ্যে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও বিচার করে এবং নানাবিধ বিতর্কমূলক আলোচনায় গদ্যভাষাকে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে তিনি বাংলা গদ্যের জড়ত্বমোচনে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন।

রামমোহনের সমসাময়িক পুরাতন আদর্শের পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন লৌকিক ভাষায় বেদান্তপ্রচারের ঘোর বিপক্ষতা করেন এবং তাঁকে অতি কটু ভাষায় আক্রমণ করে 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) নামে একখানি প্রতিবাদ-পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকার কটুকাটব্য বাদ দিলে দেখা যাবে বেদান্তপ্রচারের ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে কাশীনাথ ও তাঁর দলভুক্ত পুরাতনপন্থীদের একস্থলে ঘোরতর ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল। রামমোহন বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্রকেই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র বলে মনে করতেন, কিন্তু পুরাণাদির প্রতি তাঁর ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। যে সমস্ত পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণলীলার আদিরসাশ্রিত উদ্দাম বর্ণনা আছে, তিনি অপ্রামাণিক বলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রতিও তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।[৬] কিন্তু কাশীনাথের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃত জনসাধারণের জন্য পুরাণের পারমার্থিকতা অবশ্য স্বীকার করতে হবে; অপরদিকে বেদান্ত শাস্ত্রের মতো গুহ্যবিদ্যাকে সর্বসাধারণের ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন যেন কুলবধূকে হাটের মাঝে বিবস্ত্রা করেছেন। সে-যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরও অভিমত— পুরাণশাস্ত্র ও দেব-

দেবীর প্রতি রামমোহনের অবজ্ঞা দেখান উচিত হয় নি, এবং বেদান্তের মতো গভীর ব্যাপারকে বাংলা ভাষার মতো সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রের অমর্যাদাই করেছেন। সে যুগে যে সমস্ত পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামমোহনের বেদান্ত-প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতিবাদের ধারা কতকটা এইরকম: রামমোহন পুরাণ ও পৌরাণিক দেবদেবীকে নস্যাৎ করে বেদান্তকে যে একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে গ্রহণ করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, তা কোনমতেই হিন্দুর শাস্ত্র ও ঐতিহ্যসম্মত নয়। নর, নরোত্তম, নারায়ণকে নমস্কার করে ও দেবী সরস্বতীর জয়ধ্বনি করে মহর্ষি বেদব্যাস যে-গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও কি নানা দেবদেবীর বন্দনা ও পূজোপাসনা নেই? বহু-দেববাদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থেই স্বীকৃত-হয়েছে। পরবর্তী কালের মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণে-উপপুরাণে সেই আদর্শ আরও বিস্তারিত আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। বেদান্ত-উপনিষদে বিধৃত ব্রহ্মবিদ্যা হল রাজবিদ্যা— জনসাধারণের জন্য নয়। অধ্যাত্ম চেতনা ও পারমার্থিক সাধনায় যাঁরা তুঙ্গশীর্ষ অবলম্বন করেছেন ব্রহ্মবিদ্যায় শুধু তাঁদেরই অধিকার। 'অদীক্ষিত' ব্যক্তির হাতে যদি সুগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যা পড়ে, তা হলে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার"— এইরকম বিড়ম্বনা হয় না কি? অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় কখনও বেদান্তবিরোধী ছিলেন না। কারণ, তিনি স্বয়ং কলকাতার বাসায় পুঁথি থেকে ছাত্রদের শঙ্করাচার্যের টীকাসহ উপনিষদ পড়াতেন— একথা রামমোহন নিজেই বলে গেছেন।[৭] তবে যা সুগভীর চিন্তার ব্যাপার, সাধকের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনের আসনে তার প্রতিষ্ঠা, তাকে রামমোহন অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে হিন্দু-শাস্ত্রের অগৌরব করেছেন— মৃত্যুঞ্জয় ও কাশীনাথের এই হল সুদৃঢ় অভিমত।

পুরাণ-বিরোধিতা ও বেদান্ত উপনিষদের আনুগত্য রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩) পর কিছুকাল হতবল হয়ে পড়লেও যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পকালের মধ্যেই রামমোহনের পথ ধরে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধর্মালোচনা-সংক্রান্ত শাখাটির পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) হল তাঁর মতপ্রচারের প্রধান বাহন। এই সভা ও পত্রিকায় বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যোগদান করাতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সাধ্যসাধনের আদর্শকে

সে-যুগের বুদ্ধিজীবী মহলে সুপ্রচার করতে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'-য় তিনি ঋগ্‌বেদ অনুবাদ শুরু করলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের **theism**-এর আদর্শের জন্য বেদান্ত ও উপনিষদের ওপর ভিত্তি করলেন। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে, তিনি বেদান্তসূত্রের তত্ত্বকথার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অন্তরের অধ্যাত্ম-ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে শান্তি পেলেন না। তখন তিনি য়ুরোপের প্রকৃতিবাদী জড়দর্শন আলোচনায় মগ্ন হলেন, তাতে শুধু অন্তরের প্রদাহ বেড়েই গেল। অতঃপর তিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ চর্চায় শান্তি পেলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাতেই বেদান্তধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে লিখলেন : "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।" বিশুদ্ধ রীতিতে বেদ-অধ্যয়ন করার জন্য ১৮৪৩ সালে বৃত্তি দিয়ে তিনি কয়েকজন তরুণকে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, উপনিষদই বেদের সার ভাগ ; তাই বেদের কর্মকাণ্ডপোষক অংশ তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে 'তত্ত্ব-বোধিনী'-র সম্পাদক তাঁর শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। পরিশেষে তিনি অক্ষয়কুমারের মতের পোষকতা করে বেদের অভ্রান্ততা এবং অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও আর্যধর্মপ্রণালীর বিবর্তন জানবার জন্য তিনি বেদচর্চা সমর্থন করেছিলেন, নিজেও ঋগ্‌বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তে তাঁর অনীহা ছিল না, বরং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মই যে তাঁর অন্বেষ্টব্য তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫০ সালে তাঁর 'ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যা' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতেই সর্বপ্রথম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর বিরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই সময় তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রতি পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে এবং পরেও দেখা যাচ্ছে, একাধিক স্থলে তিনি বেদান্তের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। ১৮৪৬ সালে তিনি বলেছিলেন : "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে···।" কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এই 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য' শব্দের অর্থ বাদরায়ণ সূত্র বা তার শাঙ্কর ভাষ্য নয়,— এ হল ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষৎ। এ বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে খোলাখুলিভাবে বলেছেন :

"আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যেহেতু, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে, যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্তদর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।"[৮]

এখানে তাঁর ধর্মসাধনা সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি মূলতঃ ছিলেন শান্তরসের ভক্তিবাদী। এদিক থেকে বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী ভক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিরোধ নেই। তবে লীলাবাদী বৈষ্ণব ভক্ত দয়িত-দয়িতা-সম্পর্কজাত আদিরসকে মন্থন করে ভক্তিরসে পরিস্নাত হতে চান, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পিতাপুত্রের স্নেহরসের সম্পর্ক স্থাপন করতে অভিপ্রয়াসী। তাই তিনি ধর্মসাধনার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে উপনিষদকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য সমস্ত উপনিষদকেই তিনি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে এগারখানি উপনিষদ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেখলেন; দেশের মধ্যে উক্ত এগারখানি উপনিষদ ছাড়াও 'গোপালতাপনী উপনিষৎ' (বৈষ্ণব), 'গোপীচন্দনোপনিষৎ' (বৈষ্ণব), 'স্কন্দোপনিষৎ' (শৈব), 'সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ' (শাক্ত), কৌলোপনিষৎ' (তান্ত্রিক)— এমন কি 'আল্লোপনিষৎ'-ও (যার মধ্যে ইসলামের আল্লাহ্ ও উপনিষদের ব্রহ্মের সংমিশ্রণ করা হয়েছে[৯]) প্রচলিত ছিল। তখন দেশের মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন উপনিষদের মোট সংখ্যা ছিল এক শ' সাতচল্লিশ। ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে বেদ-বেদান্তের ঐশিকতা নিয়ে তাঁর প্রখর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। ফলে তিনি বেদবেদান্তকে আর ঈশ্বরমুখনিঃসৃত ভাগবতী বাণী বলে গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু উপনিষদের প্রতি আনুগত্য ছাড়তে পারলেন না।

উপনিষৎ-আখ্যাত অনেকগুলি গ্রন্থই নিতান্ত অর্বাচীনকালে রচিত সাম্প্রদায়িক ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু প্রামাণিক বলে গৃহীত উপনিষদগুলির সমস্ত যুক্তিই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিভাববিভোর, দ্বৈতবাদী ও শান্তরসাস্পদ চিত্ত মেনে নিতে পারল না। শাঙ্কর ভাষ্যের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও তাঁর মনঃপূত হল

না।[১০] তখন তিনি ব্রাহ্মমতাদর্শের চুম্বক রচনার জন্য নতুন করে বিশেষ বিশেষ উপনিষদ থেকে তাঁর মনোমত শ্লোক সংগ্রহ ও বৃত্তি রচনায় প্রস্তুত হলেন। ইতিপূর্বে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক মাণ্ডূক্য উপনিষদ পাঠ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত উপনিষদের কোন কোন শ্লোকে তিনি প্রাণের আরাম খুঁজে পেলেন না। যে এগারখানি উপনিষদকে তিনি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেও অনেক বাক্যের সঙ্গে (বিশেষতঃ যেখানে অদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে) তিনি আপস করতে পারলেন না (যেমন বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছন্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈততত্ত্ব)। ব্রহ্ম-জীবের সাযুজ্যকল্পনা তাঁর মতের সঙ্গে মিলল না। ১৮৪৩ সালে তিনি যে উপনিষদের ওপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৪৮ সালে নৈরাশ্যভরা কণ্ঠে সেই উপনিষদ সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হলেন: "এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না। হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৬৫-৬৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৩-৬ এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৭ বাক্যে যে নির্বাণ-মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তাকে তিনি একেবারে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন: "হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না" (আত্মজীবনী, পৃ, ১৭২)। এর অর্থ হল, তিনি হৃদয়ের সম্মতিকেই ধর্মানুভূতির মূল নিয়ামক শক্তি বলে গ্রহণ করলেন— দ্বৈতবাদীদের মতো তাঁর মূল অবলম্বন হল হৃদয়াবেগ। সে যাই হোক, তিনি কয়েকখানি উপনিষৎ থেকে মনোমত বাছাবাছা শ্লোক ও বাক্য সঙ্কলন করতে প্রবৃত্ত হলেন, যার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ আছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। তিনি দিব্যভাবে ও ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে উপনিষদের কিছু কিছু নির্বাচিত বাক্য বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেগুলি তদ্দণ্ডে লিখে নিলেন। উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক ও বাক্যসমষ্টি, যাকে ব্রাহ্মধর্মের 'theistic বীজ' বলা হয়েছে, সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৪৮ সালের শেষভাগে সঙ্কলিত হয়, ১৮৪৯-৫০ সালে প্রকাশিত হয়, ১৮৫১-৫২ সালে এর অনুবাদ-

সংস্করণ প্রচারিত হয় এবং ১৮৬১ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এর তাৎপর্য প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: "দেখিলাম যে. আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাঁহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি।" এখানে আত্মপ্রত্যয়, জ্ঞান ও হৃদয়কেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে, উপনিষদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি থাকলেও জ্ঞানাত্মক আত্মপ্রত্যয়কেই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর আত্মপ্রত্যয় চিদাত্মক হলেও আসলে তাঁর সমস্ত ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অর্থাৎ শান্ত-রসাস্পদ দ্বৈতভক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৩.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যদিও সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলন নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে উচ্চকিত করে তুলল, তবু ধর্মচেতনা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই যুগে দেখা যাচ্ছে অগুয়েস্ত্ কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) ধ্রুবদর্শন বা পজিটিভিজম্-এর বিশেষ প্রভাব ছিল। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষকে সেই সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন মানববাদী কোঁৎ। নবশিক্ষিত বাঙালীসমাজে এই ফরাসী দার্শনিকের উদার মানবধর্ম প্রবল আধিপত্য লাভ করেছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ— এঁরা ছিলেন কোঁতের গোঁড়া ভক্ত। তালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়িতে এরা এবং আরও অনেক শিক্ষিত বাঙালী কোঁৎ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য 'পজিটিভিস্ট্ ক্লাব' স্থাপন করেছিলেন। তখন এদেশে যে-সমস্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান আসতেন তাঁদের কেউ কেউ এবং কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের দু'চার জন কোঁতের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমজীবনে বহুদিন কোঁৎ-ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনার পটভূমিকায় তাঁর কোঁৎ-অনুরক্তি এবং 'ধর্মতত্ত্ব'-এ অনুশীলনধর্ম ব্যাখ্যায় এর নির্যাস সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে।[১১] শেষের দিকে তাঁর ধর্মাদর্শে পাশ্চাত্য পজিটিভিজ্‌ম্-এর সঙ্গে, অনুশীলন তত্ত্ব (Religion of Culture) এবং ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সংযোগ-সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। সেশ্বর সাংখ্যতত্ত্বের অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-অনুরক্তি শেষপর্যন্ত সেশ্বর কোঁৎ-বাদে পর্যবসিত

হয়। অবশ্য কৌতুকের বিষয় এই যে, স্বয়ং কোঁৎ-ও ধর্মীয় মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। হিউম্যানিটির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অগুস্তে্ কোঁৎ হিউম্যানিটিকেই যীশু-জননীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ম্যাডোনা যেন একটি শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে আছেন, কোঁৎ তাঁকেই মানবধর্ম বা 'হিউম্যানিজম্'-এর প্রতীক বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালী কোঁৎ-ভক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কোঁৎ-কে আর্যঋষির সমতুল্য মনে করতেন। তিনি ম্যাডোনা-মূর্তিকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে শাড়ীপরা নারীরূপেই পরিকল্পনা করেছিলেন। এই নারীর রাঙাপাড় শাড়ী পরনে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, কোলে স্তন্যপানরত শিশু। এঁকে তিনি ম্যাডোনা না বলে 'নারায়ণী' নাম দিয়েছিলেন। আসল কথা, এই সমস্ত ভারতীয় কোঁৎ-পন্থীরা পুরোপুরি হিন্দুধর্ম ছাড়তে পারেন নি। যোগেন্দ্রচন্দ্র তো "জবাকুসুম সঙ্কাশং" সূর্যস্তব পর্যন্ত কোঁৎ-প্রবর্তিত পজিটিভিজ্‌ম্ তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো যুক্তিবাদী কোঁৎ-পন্থীরা অবশ্য এই সমস্ত হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, এবং কোঁৎকে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতিতে কোঁৎ-দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নি। যদি হত, তা হলে বাংলা সাহিত্যে এই বিচিত্র দার্শনিক মনোভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রকাশিত হতে পারত। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কোঁৎ-দর্শন-চর্চার অনেক সূত্র নির্দেশ করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করা যেতে পারে, অবশ্য নানা প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ আবহাওয়া এবং টুলো পণ্ডিতের ঘরে যাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে, সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ধরনের শিক্ষায় যাঁর কৈশোর-যৌবন গঠিত হয়েছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা কি করে যে আধুনিক য়ুরোপীয় মননের অধিকারী হয়েছিলেন, গীতার জ্ঞান-কর্ম-প্রেমকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তারই সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে কখনও সংশয়বাদে, কখনও নাস্তিক্যবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ভাবলে হতবাক হতে হয়। বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হিন্দু

কলেজের যে-কোন সেরা ছাত্রের মতোই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের কর্ণধার হয়ে শিক্ষাসংস্কারের ইচ্ছায় সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ও রক্ষণ-শীল শিক্ষাবিধিকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শে ঢেলে সাজতে চেয়েছিলেন। দেবভাষার সংরক্ষক ও পরিপোষ্টা হয়েও তিনি সংস্কৃত কলেজের সাধারণ শিক্ষাবিধি থেকে বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্র এবং স্থায়-মীমাংসা প্রভৃতি আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে নিরর্থক বলে তুলে দেবার সুপারিশ করেছিলেন।[১২] উপযোগবাদে ( প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্ ) বিশ্বাসী বিদ্যাসাগর মানুষের বাস্তব কল্যাণের প্রতি অধিকতর সচেতন ছিলেন, যে বিদ্যার সঙ্গে ঐহিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই, তাকে তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে মানতে চান নি।

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভক্তশিষ্যের কোন কোন উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি হিন্দুর প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও স্মার্ত সংস্কারের প্রতি কিছু উদাসীন ছিলেন। হিন্দুর উপবীত, বিবাহ ও ঔর্ধ্বদৈহিক সংস্কার অবশ্য তিনি সামাজিক রীতি অনুসারে মেনে চলতেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি কোন দিনই আসক্ত ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে বলতেন: "ধর্মকর্ম সব দলবাঁধা কাণ্ড" ( 'বিদ্যাসাগর— বিহারীলাল সরকার ), তবু তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের মতো তিনি কখনও হিন্দুধর্ম ও আচরণবিধির বিরুদ্ধে ক্রুশেড ঘোষণা করেন নি, অথবা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মতো হিন্দুর স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে বর্জন করার কথাও বলেন নি। আসলে তিনি নরের বাস্তব দুঃখবেদনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নারায়ণের কথা ভাববার বিশেষ সময় পান নি, সেরকম মানসিক প্রবণতার অধিকারীও ছিলেন না। কেউ তাঁর কাছে নীতি-উপদেশ চাইলে তিনি গীতার কথা বলতেন, কিন্তু নিজে কোন পারমার্থিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা তাঁর রচনা থেকে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৫১) তিনি বালকদের জন্য নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্পর্কে নিবন্ধ লিখলেও ঈশ্বরসম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। শোনা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে[১৩] তিনি নাকি 'বোধোদয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ঈশ্বরবিষয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যোগ করেছিলেন।[১৪] এটি পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত হয়ে নিম্নরূপ ধারণ করে: "ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড় সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে

কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান ; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন ; ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।”[১৫] তাঁর অন্য কোন রচনায় বড়ো একটা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নেই, বরং তিনি হিন্দুধর্মের অলৌকিকতার পরিপন্থী ছিলেন। ‘সীতার বনবাস’-এ ( ১৮৬০ ) সীতার পাতাল-প্রবেশ বর্জন করে মানসিক আঘাতে জনকনন্দিনীর আকস্মিক মৃত্যু বর্ণনা করেছেন— এর জন্য সে যুগের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কিছু কিছু আপত্তি তুলেছিল। ‘শকুন্তলা’-র (১৮৫৪) অনুবাদেও তিনি অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব বাদ দিয়েছিলেন। কেবল ‘আখ্যানমঞ্জরী’-র (১৮৬৩-১৮৮৮) দু’একটি গল্পে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে বটে, তবে ‘আখ্যানমঞ্জরী’ তাঁর মৌলিক রচনা নয়, ইংরেজী কাহিনীর বাংলা গদ্যে অনুবাদ। মূলে যেখানে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে, সেগুলিকে তিনি বাদ না দিয়ে অনুবাদে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমত কতকটা প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত ছিল বলে তাঁর কোন কোন জীবনচরিতকার ( বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র ) তাঁকে যথার্থ হিন্দু বলে গ্রহণ করতে পারেন নি, এবং তাঁর তথাকথিত অহিন্দু মতামতের জন্য এঁদের কেউ কেউ তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন, তিনি কিন্তু শিক্ষাগুরুকে নাস্তিক বলেই প্রচার করেছেন।[১৬]

বিদ্যাসাগরের বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বাল্যে তিনি নাকি প্রতিমাপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, প্রখর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও উপবীত সংস্কারের পর বাল্যে গায়ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন এবং পিতার কাছে তার জন্য যথেষ্ট তর্জিতও হয়েছিলেন। উত্তরকালে পিতা ও পিতামহীর অনুরোধ সত্ত্বেও গুরুর কাছে দীক্ষা ও মন্ত্র নেন নি ; উইলে নানাখাতে অর্থ বরাদ্দ করলেও দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পূজাপার্বন প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে এক কপর্দকও দিয়ে যান নি ; কাশীধামে গিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে দেবদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন নি, তার পরিবর্তে জনকজননীকেই সাক্ষাৎ শিবদুর্গা জ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। একখানি যাত্রীবাহী জাহাজডুবির ফলে বহু বালবৃদ্ধবনিতার বিনা কারণে প্রাণ বিনাশ হলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও পরমকারুণিকত্বে ঘোর অনাস্থা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, “এইসকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।”[১৭] অন্য একসময়ে বলেছিলেন : “এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা

বেশ বুঝি ; তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না" ( চণ্ডীচরণ, পৃ. ৫৪১ )। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি ঈশ্বরকে সমদর্শী বলে স্বীকার করেছিলেন। এইসমস্ত উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, ঈশ্বরসত্তায় তিনি ঘোরতর অবিশ্বাসী নন, কিন্তু ঈশ্বরসাধনার জন্য কোন নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বা সাধন-প্রণালীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রাজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তাঁর মন্তব্যটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য :

"স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না ; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন" ( রামেন্দ্র রচনাবলী, ২য়, সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ )।

অবশ্য শেষজীবনে জীবনসংগ্রামে ও লোকবঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত বিদ্যাসাগর বোধ হয় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। অখিলউদ্দিন নামে এক মুসলমান বাউলকে তিনি কলকাতার বাড়িতে আনিয়ে মাঝে মাঝে তার দেহতত্ত্ববিষয়ক গান শুনে মানসিক প্রদাহ থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পেতেন। অখিলউদ্দিন যখন একতারা বাজিয়ে গাইত :

তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখব কোথা
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞি চাঁদ বাউল বলে—
সে নাম ভুলব নারে প্রাণ গেলে।

তখন কঠোর মানববাদী এবং ঈশ্বরচেতনায় সংশয়ী বিদ্যাসাগরের অশান্ত ক্লান্ত চিত্ত কি আপন সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে "ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিন," গানের এই প্রশ্নের সমাধানে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হত? সে যাই হোক, তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকলেই তাঁকে নাস্তিক বা সংশয়বাদী বলে জানলেও তাঁর রচনা থেকে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই সময়ে বা এর কিছু পূর্ব থেকে শিক্ষিত বাঙালীসমাজে খ্রীস্টান মিসনারী সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড আধিপত্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে কেউ কেউ ভারতীয় সাধনায় আবার ফিরে এলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ডিরোজিওর বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রথম যৌবনে কিছুদিন শালগ্রামশিলায় ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করেছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতের এই পুত্রটি যজ্ঞোপবীতকে নিতান্তই সূত্রগুচ্ছ বলে কয়েকদিনের জন্য পরিত্যাগও করেছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ভূয়োদর্শী পিতা বিশ্বনাথের উপদেশে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ডিরোজিও-ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার পান এবং পুনরায় স্মার্ত হিন্দুর দেববিশ্বাসে ফিরে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের পুনর্গঠনের জন্য সদাচার সুনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, পুরাতন দেব-বিশ্বাসকেও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মাদি গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে ঐহিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে বটে, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক স্মার্ত বিশ্বাস ও আচার পরিত্যাগ করলে চলবে না। যুগধর্মের সঙ্গে নিত্যধর্মের বিরোধ ঘুচিয়ে যথাসম্ভব সমন্বয়ের পথ নিতে হবে। বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানি যে নিন্দনীয় অপকর্ম নয়, এবং আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে যথার্থ হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ নেই, একথা তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচারপ্রবন্ধে' আলোচনা করেছিলেন এবং আদর্শ গৃহস্থের গৃহজীবনের যথার্থ অবলম্বন কি হবে, তা দেখাবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধে'র অনেক স্থলে হিন্দুর সনাতন আদর্শ, স্মৃতিশাসিত সমাজব্যবস্থা, গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায় ; তার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশের হিত-চিন্তাও ব্যক্ত হয়েছে। ধর্মমতের দিক থেকে ভূদেব শেষপর্যন্ত গীতাকেই সার বলে জেনেছিলেন। দল-উপদলগত বিবাদে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব হতে থাকলে গীতার প্রভাবই শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

৪.

এই যুগে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) নাম ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় একটু বিচিত্র বোধ হতে পারে। অদ্ভুত প্রতিভাধর, বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী

ইংরেজী শিক্ষা ও হিন্দুকলেজ-ডিরোজিও-প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফল প্যারীচাঁদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-সমাজে ও ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। দেশবিদেশ থেকে তিনি প্রতিভার উপযুক্ত সম্মানও পেয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং আরও খানকতক আখ্যানের রচনাকার সুরসিক ব্যক্তি বলেই জানে। বাংলা কথা-সাহিত্যের জন্মলগ্নে গল্পলেখকরূপে তাঁর আবির্ভাব অত্যন্ত শুভ যোগাযোগ বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বলে সম্মান করতে হবে। পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন এবং বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন পিতার পুত্রদ্বয় প্যারীচাঁদ এবং কিশোরীচাঁদ আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিতে সুপরিচিত। পাশ্চাত্ত্য ধরনের কৃষিবিজ্ঞানচর্চা, কৃষিবিজ্ঞানবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্যারীচাঁদ শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবন ও কর্ম অভিনব বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সাহিত্যচর্চা, কৃষিবিজ্ঞান আলোচনা, প্রেততত্ত্বচর্চা ও থিয়োজফির নানা শাখাকে তিনি পরিপুষ্ট করেছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে আত্মীয়তার যোগাযোগ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার বিশিষ্ট সম্পর্ক কোথায়, তা হয়তো সুরসিক টেকচাঁদ ঠাকুর বলতে পারতেন।

প্যারীচাঁদ প্রথম যৌবনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ডিরোজিও-চক্রের প্রভাবে এসেছিলেন এবং তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-সুলভ কালাপাহাড়ী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি অশন-বসনের কদাচারকে প্রগতি বলে মনে করতেন না। প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্ম-বিষয়ক ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ পড়ে গভীরভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন— "There is but one God of infinite perfection."[১৮] সে যুগের নব্যশিক্ষিত কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যুবকদের মতো তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হলেন— "I became a theist or Brahma." ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাঁর আত্মিক জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্ত্রীর প্রতি নিবিড় দাম্পত্য প্রেম তাঁকে ক্রমে ক্রমে প্রেততত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে গেল। এর পর তিনি বাইরের ধর্মচর্চা থেকে সরে এসে গভীরভাবে প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মেতে

উঠলেন। বোধ করি অশরীরী স্ত্রীর ছায়া-সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল প্যারীচাঁদ বিদেশ থেকে প্রেততত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থ আনিয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলন শুরু করে দিলেন। প্রেততত্ত্ববিষয়ক বিদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, পাশ্চাত্ত্যের প্রেততত্ত্ব-সংক্রান্ত সভা ও কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় স্থাপিত হল। ১৮৮২ সালে লণ্ডনে 'Central Association of Spiritualists' গঠিত হলে তিনি তার সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হলেন। তার কিছু আগে (১৮৮০) এদেশে United Association of Spiritualists স্থাপিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। ইংরেজীতে-লেখা প্রেততত্ত্ব-সংক্রান্ত তাঁর যে-সমস্ত প্রবন্ধ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই তাঁর *The Spiritual Stray Leaves* (1879) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর *Stray Thoughts on Spiritualism* (1880), *On the Soul : Its Nature and Development* (1881), *Notes on the Soul* (1908— মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), *Yoga and Spiritualism* (1909) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অধিকাংশ রচনা সংগৃহীত হয়েছে। 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী, (১৮৭১), 'ঈশ্বর উপাসনা,' 'উপাসনা' প্রভৃতি আখ্যান ও তত্ত্বগ্রন্থে তিনি প্রথমে প্রেততত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা প্রভৃতি আলোচনার পর অধ্যাত্মবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে জীবতত্ত্বের সম্পর্কবিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেন, তাতে একদিকে হিন্দুর ষড়দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি যেমন তাঁর নিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল, তেমনি কর্নেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাট্স্কির থিয়োজফিতেও তাঁর প্রবল অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৮৮২ সালে পাশ্চাত্ত্য থিয়োজফি প্রচারের নেতা কর্নেল ওলকট কলকাতায় এলে শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন, এবং ৫ই এপ্রিল (১৮৮২) কলকাতা টাউন হলে তিনি 'Theosophy : The Scientific Basis of Religion' এই শিরোনামায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। প্যারীচাঁদ সেই সভার সভাপতি হয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ থিয়োজফি সম্বন্ধে মাদাম ব্লাভাট্স্কিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ওলকট-সংবর্ধনা সভায় (১লা মে, ১৮৮২) তিনি মাদাম সম্বন্ধে বলেন : "The most exalted lady Madame Blavtsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears……" সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি ব্লাভাট্স্কির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সহজেই

অনুমেয়। ১৮৭৫ সালে নিউইয়র্কে ওলকট-ব্লাভাট্‌স্কির নেতৃত্বে থিয়োজফিকাল সোসাইটি গঠিত হয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "To promote the study of the esoteric religious philosophies of the East." সুতরাং এ যুগে থিয়োজফি-প্রেমিক পাশ্চাত্ত্য-চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতীয় দর্শন ও গুহ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

প্যারীচাঁদ বিশ্বাস করতেন : "The end of spiritualism is Theosophy. Spiritualists and Theosophists should, therefore, be united and bring their thoughts to bear on this great end."[১৯] প্রেততত্ত্ব শেষপর্যন্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বে পৌঁছে দেয়, পাশ্চাত্ত্য থিয়োজফিস্টদের মতো প্যারীচাঁদ একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ ছিলেন। বিদেশী থিয়োজফিকে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বুঝে নিতে গিয়ে তিনি ভারতীয় মুনি-ঋষিদের বিহিত মার্গই অনুসরণ করেছেন এবং আত্মার অবিনাশিতা ও জীবাত্মা পরমাত্মার পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ে ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের অনুবর্তন করেছেন। কর্নেল ওলকটের সংবর্ধনাসভায় প্যারীচাঁদ এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন : "What the *Maharshis* and *Rishis* had taught in the *Vedas*, *Upanishadas*, *Yoga*, *Tantras* and *Puranas*, is, that Divinity is in humanity, and that life assimilated to Divinity, is the spiritual life—the life of *Nirvana* which is attainable by extinguishing the natural life by *Yoga*, culminating in the development of the spiritual life." এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্ব ছাড়িয়ে ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর বাংলা নিবন্ধগ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং আধ্যাত্মিক রূপক-উপন্যাস 'অভেদী'-তে রহস্যবাদ-সংক্রান্ত অনেক গূঢ় সংকেত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী থিয়োজফিস্টরা বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ; তার মূলে ছিল প্যারীচাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব। তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলি এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুচ্ছ ('গীতাঙ্কুর') এ বিষয়ে মৌলিকতা দাবি করতে পারে। তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা ও গভীর ভাবনিষ্ঠ রচনা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

"হে পরমাত্মন্! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সঙ্কীর্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমামৃত

উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতিস্বরূপ, গতিস্বরূপ আকর্ষণস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সম্মেলনস্বরূপ, সৌন্দর্য-স্বরূপ, সুগন্ধস্বরূপ, সুরম্য ধ্বনিস্বরূপ। তুমি সর্বনিয়ন্তা— সর্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্জলিত, তেমনি অন্তররাজ্যের তুমি সূর্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়— যে আত্মা যত পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক প্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্জ্বল্যমান।" ( 'যৎকিঞ্চিৎ' )

৫.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের পুরাণবিরোধিতা এবং উপনিষদ-বেদান্তানুরক্তি ইংরেজী-শিক্ষিতসমাজে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমন কি, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বেপরোয়া ইয়ং বেঙ্গল দল যে নবীনসমাজকে গ্রাস করতে পারে নি, তার অন্যতম কারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বয়ং দেবেন্দ্র-নাথ সরল ভাষায় উপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাক্যর অনুবাদসহ যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ ( ১ম ও ২য় ১৮৫০—১৮৫২ ) এবং 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' ( ১৮৫২ ) প্রকাশ করেন, তার দ্বারা ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষতঃ তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে যে আত্মস্থ ভক্তি ও পবিত্রতার সাত্বিক ভাব দেখা যায়, গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

পরবর্তী কালে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের অধ্যাত্ম রচনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁরই বাসনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে ( 'অদ্বৈতমতের সমালোচনা'—১৮৯১, ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচনা—১৮৯৭, 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও 'ব্রহ্মসাধনা'—১৯০০, 'হারামণির অন্বেষণ'—১৯০৮, 'গীতাপাঠ'—১৯১৫, ইত্যাদি ) একধারে ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যে নিগূঢ় সমন্বয় দেখা যায়, বাংলার দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তাঁর রচনা থেকে এমনি একটি বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে :

"আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না।

আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোন অভাবই থাকে না। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না— তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কতবড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মাশক্তি— অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি ঘটিতেছে সেই ঐশী শক্তি কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।" ( অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র )

এই সমস্ত অধ্যাত্ম-চিন্তাকে তিনি পরিচ্ছন্ন যুক্তিমার্গের দ্বারা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, নিগূঢ় তত্ত্ববিদ্যা যুক্তিবুদ্ধির গোচরীভূত হতে পেরেছে। পরবর্তী কালে বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিজস্ব ধর্মানুভূতি ও দর্শনচিন্তার কথা অতি ঋজুভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অজ্ঞেয়-বাদীদের তিনি নাস্তিক বলেই মনে করতেন। তাঁর উক্তি : "এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন?" এইপ্রসঙ্গে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক মত স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন :

> "শঙ্কর বলিলেন—প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না ; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইজন্য ওকে আমি অবিদ্যা বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে ; উহা অবিদ্যা, মায়া, illusion, তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন। শঙ্কর ওপথ একেবারেই ধরিলেন না।...আসল কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয়, সে-আমি কি একটা accident? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে? তবে যদি না হয়, তবে?" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ' )

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদী সাধকের মনে কখনও সংশয় জাগিয়েছে, কখনও নাস্তিক্যের গহ্বরে সমস্ত চৈতন্যকে নিক্ষেপ করেছে, আবার কখনও-বা আত্মপ্রত্যয়ের ত্বরিৎ তড়িতালোকে চিদানন্দময় শিবতত্ত্বকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"

থেকে রক্ষা করেছে। আর্ষবাণীর অনুবর্তন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে তত্ত্ব-বিস্তার যে আয়োজন করেছেন, এবং যার ফলে আমাদের দর্শনসাহিত্যের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে, এখনও তাঁর সেই কৃতিত্বের যথার্থ পরিমাপ হয় নি।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ এবং শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে তার প্রতিক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) যোগদান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নানাভাবে উপকৃত করেছিল। বৈষ্ণববংশের সন্তান কেশবচন্দ্রের ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল শুদ্ধা ভক্তি। নানাবিধ প্রগতিশীল আন্দোলন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা ব্যাপারের তিনি ছিলেন কর্ণধার, যুবসমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত শীলসাধনা ও যমনিয়মের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা। পাশ্চাত্ত্য দর্শন যখন তাঁর মানসিক প্রদাহ শান্ত করতে পারল না, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' পাঠ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম হলেন। বাগ্মী, প্রগতিশীল, অথচ ধর্মনিষ্ঠ যুবক, কলকাতার বিদ্বৎগোষ্ঠীর নেতা কেশবচন্দ্র মহর্ষির গভীর সান্নিধ্যে এসে ধর্মৈষণার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার দিক থেকে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল। মহর্ষি ছিলেন উপনিষদের রসে লালিত শান্ত ভক্তির মানুষ। তার চেয়ে বড়ো কথা— তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাই ধর্মসাধনার প্রধান পথ-প্রদর্শক। উপনিষদ তাঁর একমাত্র শরণ্য হলেও তিনি প্রচলিত উপনিষদের সবগুলিকেই শিরোধার্য করতেন না। বরং তিনি উপনিষদ থেকে মনোমত শ্লোক ও বাক্য বাছাই করে এবং কোন কোন শ্লোকের তাৎপর্য অমান্য করে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ চিন্তার অধিকতর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। যুবক কেশবচন্দ্রকে মহর্ষি পুত্রাধিক স্নেহ করলেও তাঁর মনঃপ্রকৃতির মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে সচেতন হন। পরে প্রবীণ মহর্ষি ও নবীন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। মতপার্থক্য শেষপর্যন্ত মতবিরোধে পর্যবসিত হল। ১৮৬৪ সালের শেষভাগে অতিশয় প্রগতিশীল এবং আবেগপ্রবণ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দিল, নবীনের দল কেশবের দিকে

চলে পড়লেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালনা ও সম্পত্তির ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করলেন। এর ফলে ১৮৬৪ সালের পৌষ মাসে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগী নবীন ব্রাহ্মের দল ( তারকনাথ দত্ত, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রভৃতি ) দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেন এবং তার কিছুকাল পরে ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (The Brahmo Samaj of India) স্থাপন করলেন। উদার ধর্মীয় মনোভাবের ফলে কেশবচন্দ্র সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করে তিনি ধন্য হলেন। "Jesus Christ : Asia and Europe" বক্তৃতায় এমনভাবে খ্রীস্টপ্রীতি প্রকাশ করলেন যে, শুধু বাঙালীরাই নয়, অনেক য়ুরোপীয় রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আশা করেছিলেন যে, কেশব ত্বরায় খ্রীস্টান হবেন। খ্রীস্টানী অনুতাপ ও আদিম পাপভীতি, বৈষ্ণবদের লীলারস ও স্মরণকীর্তন, শাক্তের মাতৃভাব, মহম্মদীয় ধর্মের প্রবল ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্য— এ সমস্তই তিনি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আরও নানাপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি যুবসমাজকে প্রবলবেগে নিজ কক্ষপথে টেনে নিলেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কোন দিক থেকে কিছু রক্ষণশীল ও হিন্দুভাবাপন্ন ছিল বলে অধিকাংশ নবীন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করলেন।[২০] ধর্মীয় উন্মাদনা ও অধ্যাত্ম ভাবাবেগে কেশব যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্রাহ্ম-প্রতিকূল প্রধান ব্যক্তিও বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌ব্রাহ্মণের গৌরব দিতে দ্বিধা করলেন না।[২১]

অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী স্বাভাবিক কারণেই কেশবচন্দ্রের অতি-প্রগতিবাদ, উদ্দাম ভক্তিভাব এবং খ্রীস্টধর্মানুরক্তি বিশেষ পছন্দ করতেন না। নানাকারণে কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অপ্রসন্নতা সঞ্চারিত হয়েছিল।[২২] একবার তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক পত্রে কেশবচন্দ্রের অভিনব ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন :

> "ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ( কেশবচন্দ্র ) সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই-বা কোথায় ? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার-সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে ? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন,

কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান্‌-দি-বেপটাইষ্টের দ্বারা বেপটাইষ্ট্‌ হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীশা, সক্রেটিসের সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন— তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে?······কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্যবিরোধই উপস্থিত হইতেছে।" (যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ, ৮০-৮১)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়, বিশেষতঃ খ্রীস্টানধর্মানুরক্তি মহর্ষির আদৌ পছন্দ হয় নি। কেশব ভক্তির আবেগের দ্বারা উদ্বেল হয়ে সর্বধর্মের মধ্যে সার সত্যের সন্ধান করেছিলেন— সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। উপরন্তু বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে ; ফলে উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদ তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। সেই ভাবাবেশের ফলে তিনি এদেশের পুকুরের জলে জর্ডন নদীর তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেতেন, কখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তনের অনুকরণে খোল-করতালসহ নগ্নপদে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নগরসঙ্কীর্তন করতে বেরোতেন এবং সভক্ত ভক্তি-মুক্তির গান গাইতেন। কখনও খ্রীস্টানি অনুতাপানলে বিলাপ করতেন, কখনও-বা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতো পুলকে-প্রেমে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে পড়তেন, ঘন ঘন শ্রীহরির নামকীর্তন করতেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের এই ধরনের বাড়াবাড়িকে আদৌ সমর্থন করতেন না। কথাপ্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন :

"কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোন ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্রাচীন culture-এর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না ; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিতে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন ; নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাঁচে তাহার নাম দিলেন—New Dispensation— নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন,— এইখানে সমস্ত reform movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষৎ ছুঁইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু

অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন ?…তিনি কীর্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁর নববিধানে কীর্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এদিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের[২৩] কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।"[২৪] ('পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন সংস্করণ, পৃঃ ২৯৫-২৯৬)

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বিরস মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মসাধনার মননের দিকটাকে অপ্রধান করে আবেগমূলক সাধনার দিকে কেশবচন্দ্র বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই একই সঙ্গে বুদ্ধ-খ্রীস্ট-মহম্মদ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি তাঁর অনুরাগী যুবসমাজকে প্রভাবিত করেন। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীস্টান ধর্ম, অঘোরনাথ গুপ্তের (সাধু অঘোরনাথ) বৌদ্ধশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেনের ইসলামি শাস্ত্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ('চিরঞ্জীব শর্মা') গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মনিবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছিল— একথা স্বীকার করতে হবে। বলা বাহুল্য, তাঁদের কর্মোদ্যমের মূলে ছিল কেশব-ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক স্পর্শ।

কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের কোন কোন অংশ যেমন মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মনঃপূত হয় নি, তেমনি তাঁর কোন কোন আচরণও অতি-প্রগতিবাদী তরুণ শিষ্যেরাও শিরোধার্য করতে পারলেন না। ১৮৬৮ সালের দিকে অত্যন্ত ভাবাবেগের বশে কোন কোন কেশবভক্ত "কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলি-গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন"।[২৫] এর ফলে কেশবগোষ্ঠীতে নরপূজা ও গুরুবাদের প্রকাশ্য অনুপ্রবেশ দেখে তাঁর তরুণ শিষ্যদের কেউ কেউ শঙ্কিত হলেন। তাঁরা মনে করলেন, কেশবচন্দ্র উন্নত ব্রাহ্ম আদর্শ ছেড়ে দিয়ে 'হিঁদুয়ানি'-র মধ্যে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ এতে অতি স্থূল প্রতীকোপাসনা বা পৌত্তলিকতার গন্ধ পেলেন। ক্রমেই তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। কেউ কেউ তাঁর সংঘ ও সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই এই উত্তাপ মন্দীভূত হয়ে আসে। কেশবের ভক্তি ও প্রগতিশীল সমাজসংস্কারবোধ নবীন সমাজকে দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৮৭২ সালের দিকে কেশবের

ভক্তসমাজে আবার লোষ্ট্রপাত হল। কোনও বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ভক্তের দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষপর্যন্ত ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কেশবচন্দ্রের অনুকূলে তার নিষ্পত্তি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে একদল নবীন ব্রাহ্মের প্রতিকূলতা বেড়েই চলল। শিবনাথ শাস্ত্রী হলেন এই উপদলের নেতা। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ( ১৮৭৪ ) তাঁর সম্পাদনায় কেশববিরোধী নবীন-দলের মুখপত্র 'সমদর্শী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হল এবং এতে কেশবের মত ও আচরণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। আরও নানা কারণে তাঁর সঙ্গে নবীনদলের প্রচ্ছন্ন বিরোধ ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। কিন্তু লোষ্ট্রপাত ক্রমে বজ্রাঘাতে পরিণত হল ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একে 'কুচবিহার পর্ব' বলে। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহার-রাজের বিবাহ সংঘটিত হলে, কেশবের বিরুদ্ধে তাঁর গোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তখন তাঁর কন্যার বয়স তের বৎসরের সামান্য বেশী। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নি বলে তরুণদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র পদত্যাগে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৭৮ সালের ১৫ মে তারিখে কলকাতা টাউন হলে সমবেত হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন— কেশবের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের এইভাবে নিষ্পত্তি হল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি কেশববিরোধী ব্রাহ্মযুবকেরা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্রও অল্পদিন পরে 'নববিধান' বা '**New Dispensation**' নামে নতুন নামে নিজপ্রভাবাধীন আর এক ব্রাহ্ম-সমাজের পত্তন করলেন এবং তার জন্য নতুন নিয়মকানুন তৈরী করলেন।[২৬] সে যাই হোক, ১৮৭৯ সালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিনখণ্ড হয়ে গেল— মহর্ষি-প্রভাবিত আদিব্রাহ্মসমাজ, কেশব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান এবং নবীনদলের ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের ঐক্য ত্রিধাবিভক্ত হলে শিক্ষিত-সমাজের ওপর এর প্রভাবও কিঞ্চিৎ হ্রাস পেতে আরম্ভ করল এবং বাংলার ধর্মজাগরণের আর এক পর্বের শুরু হল— এটির নাম দেওয়া যেতে পারে বঙ্কিমপর্ব। হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুত্থান এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য— যাকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল **Hindu Revival** বলেছিলেন।

বাংলার ধর্মচেতনায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব যে সুগভীর তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর জলন্ত ভক্তি ও অধ্যাত্মানুভূতির এমন প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাষণ এবং 'জীবনবেদ', 'মহোৎসব', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর ভাবোন্মাদনাময় স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে। অবশ্য "কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলা ভাষায় মিষ্টিসিজ্‌ম্ আনয়ন করেন", এই মন্তব্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও "তিনি ছিলেন ভাষাশিল্পী— নূতন শব্দপ্রণয়নে ছিল তাঁহার অশেষ দক্ষতা",[১৭] তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ধর্মচিন্তায় প্রবলভাবে ভাবাবেগ ও ব্যক্তিচিত্তকে মিশ্রিত করে, তিনি একটি বিশিষ্ট গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সেকথা তাঁর 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে। এখানে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কয়েকটি গদ্যানুচ্ছেদ উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. "কেহ কোন কীর্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতে হইবে। দ্বিজ হইতে চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্ততঃ কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। এই যে উপনয়নসংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড়মড় করিয়া হৃদয়ের হাড় ভাঙিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্টযন্ত্রণার মধ্যে ফিরিয়ে এস।" ('জীবনবেদ')

২. "শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে! তোমার যে এতবড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্ব-জননী যখন তোমার সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতর এমন কি

বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসনে লাভ করিলে ?…হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জক সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন !" ( 'সাধু-সমাগম' )

৩. "পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙালী কালো, তুমি কাফ্রি আরো কালো, তুমি ইংরেজ সাদা। কিন্তু আকাশের সব এক। চিদাকাশে পায়রা-আত্মা উড়িল, জ্ঞানসূর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ সকল উড়িতেছে। হিংসা, নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয় ; আকাশে এসব কিছুই নাই। অতএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি ! আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন-পাখীও উড়িয়া গেল।" ( 'মাঘোৎসব : পায়রা উড়ান' )

এ ভাষার আবেগ, সাত্ত্বিকতা ও গভীর তাৎপর্য বাংলা নিবন্ধ-সাহিত্যের একটা বিচিত্র দিক খুলে দিয়েছে। ব্রহ্মানন্দের চরিত্র ও মন এই উক্তির মধ্যে দর্পণে-প্রতিফলনের মতো প্রকাশ পেয়েছে। এই রীতির সঙ্গে বিরাট পৌরুষের বীর্যোত্তাপ সঞ্চারিত হলে এটি একটি অভিনব রসরূপ লাভ করিতে পারত, যার বিশিষ্ট পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন গদ্যরচনায় ফুটে উঠেছে।

কেশবচন্দ্রের প্রভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের দিন শুরু হল। হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য, যা এতদিন খ্রীস্টান মিসনারী ও ব্রাহ্মগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তার আবার সুদিন এল। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশেও ভারতের পুরাণ, স্মৃতিসংহিতা, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, ষড়দর্শন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে অংশের প্রতি এতদিন ধরে শিক্ষিত বাঙালীরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, সেই পুরাণ ও মহাকাব্যকেন্দ্রিক আদর্শকে সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র নবপ্রবুদ্ধ চিদাত্মক প্রবণতা ও মানব-হিতবাদের আদর্শে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ শুরু করলেন ; অনৈসর্গিকতা ও ভাবাবেগের

উন্মত্ততা পরিহার করে তাঁরা বিশুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির নিরিখে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং ভগবান বাসুদেবের মানবাদর্শকে যুগধর্মের দ্বারা শোধন করে নিয়ে ভাগবতী চেতনা ও নব্য-মানবতাবাদকে ( neo-humanism ) গীতাতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধকের সন্তানেরা— বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ, মহাতাপস অভেদানন্দ প্রভৃতি অগ্নিহোত্রীর দল ভারতের মনে এমন দিব্যদাহ সৃষ্টি করলেন যে, অগ্নিগর্ভ শমীশাখার প্রতি তন্তুতে বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেল, তার স্পর্শ সঞ্চারিত হল বাংলার জীবন ও সাধনায়, বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যে। সে অন্যযুগের কাহিনী, অন্যভাবের ইতিহাস।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ( আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য ), নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩১

২. এ-বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. *Calcutta Review*-এ ( ১৮৪৫ ) কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তি।

৫. দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মূলে কতকটা এই মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করেছিলেন : "যদিও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে। পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে।"—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', ( ৩য় সং ), পৃ : ১০৬

৬. পথ্যপ্রদানে' ( ১৮২৩ ) গৌরাঙ্গদেব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে রামমোহন সব্যঙ্গে বলেছিলেন, "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাঁহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"

৭. 'কবিতকারের সহিত বিচারে' ( ১৮২০ ) রামমোহন লিখেছিলেন, "ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজের ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে

তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন।"

৮. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

৯. সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্ উপনিষদে আকৃষ্ট ছিলেন, ৫২ খানি প্রচলিত উপনিষদের ফারসি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি উপনিষদের তত্ত্বের সঙ্গে সুফীতত্ত্ব ও অন্যান্য অধ্যাত্ম তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। বেদান্ত-উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব এবং ইসলামি অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'তৌহীদ,' হিন্দুশাস্ত্রের 'সোঽহম অস্মি' এবং ইসলামি শাস্ত্রের 'অনল হক' প্রায় একই রকম। সুতরাং তাঁর দ্বারা 'আল্লোপনিষদ' রচিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই। ( দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃঃ ৭৭ )

১১. বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর "The substance of Religion is Culture" এবং কোঁতের "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals"— বাক্যে মানবধর্মেরই জয় দেখতে পেয়েছিলেন। ( ধর্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র— খ )

১২. বিদ্যাসাগর বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলেছেন। এমনকি সমগ্র হিন্দু দর্শনকে 'অপদার্থ' বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। দ্রষ্টব্য: : *Iswar Chandra Vidyasagar as an Educationist*—Brajendra Nath Banerjee ( 'Modern Review', Oct. 1927 ) ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৮ )

১৩. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিদ্যাসাগর ( ১৮৯৫ ), পৃঃ ৫২১

১৪. প্রথমে বোধ হয় এই অনুচ্ছেদের আকার কতকটা এই রকম ছিল : "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" দেবেন্দ্রনাথ নাকি ১৮৪১ সালে সর্বপ্রথম 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' বাক্যটি বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর ( ৩য় সং, পৃঃ ৬৯ ) সম্পাদকের মতে, "বোধোদয়-এর উক্ত অনুচ্ছেদ দেবেন্দ্রনাথের উক্তির অনুকরণ।" সে যাই হোক, বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিষয়ক 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই উক্তি গোঁড়া হিন্দুদের অনেকেই সমর্থন করেন নি। বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' এবং সুবলচন্দ্র মিত্রের 'Iswar Chandra Vidyasagar'

গ্রন্থে এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। বিহারীলাল তো স্পষ্টই বলেছেন : "বোধোদয় হিন্দুসন্তানদের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।" ('বিদ্যাসাগর', ৪র্থ সং, পৃঃ ২৪৮)

১৫. দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩

১৬. 'পুরাতন প্রসঙ্গে' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনবিহারী গুপ্তের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-সাগরকে একবার নাস্তিক, আর একবার অজ্ঞেয়বাদী বলেছেন। বিপিনবিহারীর প্রশ্ন, "বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?" দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তর, "ঐ একরকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী"। (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সং, পৃঃ ২৯৩)

১৭. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫২২

১৮. প্যারীচাঁদের *On the Soul* গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

১৯. ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত থিয়োজফিকাল সোসাইটির মুখপত্র 'Theosophist' পত্রে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Inner God' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীচাঁদ মিত্র' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

২০. আদি ব্রাহ্মসমাজের এই বিব্রতাবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন, "আপনারা (অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন। আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা অন্যদিকে অত্যুগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।" (চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫১৩)

২১. 'ধর্মতত্ত্ব' (সাহিত্য পরিষদ সং, পৃঃ ৬২) বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্ব্রাহ্মণ বলেই ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণও অনুমোদন করেন।

২২. অবশ্য কেশবচন্দ্রের তিরোধানের (১৮৮৪) পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ, ১৮০৫ শক) তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রচুর প্রশস্তিবাক্য ব্যয় করা হয়েছিল। যথা— "এই শ্রীমান ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না। ইঁহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল।"

২৩. শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে। 'Indian Mirror' পত্রিকায় ( ২৮ মার্চ, ১৮৬৫ ) এই সাক্ষাতের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হচ্ছে : "We met one ( a sincere Hindu dvotee ) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit." ( সাহিত্যসাধক চরিতমালা, 'কেশবচন্দ্র সেন', পৃঃ ৬৫ )

২৪. শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথই নন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' মাতাল স্বামী পূর্ণ এবং তার কেশবভক্ত স্ত্রী বিধুমুখীর মধ্যে কথোপকথনে কেশবচন্দ্র সেনকে 'স্যান্‌জা' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে। স্ত্রী এজন্য সক্ষোভে বলল, "আমাদের পরমগুরু, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কিনা তুমি স্যান্‌জা বল্লে?" মাতাল স্বামী বিদ্রূপভরে কেশবের আশ্রমকে ( 'কমলকুটীর' ) "সাঁইজির গির্জা" বলেছিল।

২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( নিউ এজ সংস্করণ ), পৃঃ ২৪৬

২৬. কেশবের ঘোর প্রতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এই সময়ের আচরণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন, "ইহার কিছুদিন পরে ( অর্থাৎ কুচবিহার বিবাহের পর ) কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান' নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণীর গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমত প্রয়াসী হইলেন।" ( রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' পৃঃ ২৪৮ )

২৭. যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কেশবচন্দ্র সেন' থেকে উদ্ধৃত।

# বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা

১.

ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরাণ ঐতিহ্যের একটি বিশেষ প্রকরণ তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের পর ভারতচেতনা পুরাণ-বাহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবের পর ভারতের পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে পড়লে খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচার-আচরণকে পুনরায় নৈষ্ঠিক অনুশীলনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সমাজে সদাচার ও ত্রিদেবতাশ্রয়ী পৌরাণিক অনুভাবনাকে নানাভাবে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, হব্যকব্য, যাগযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল— বৌদ্ধধর্মের nihilism ধরনের সর্ববৈনাশিক শূন্যতা, তত্ত্বের দিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনের দিক থেকে মারাত্মক। বৌদ্ধধর্ম ভাঙল অনেক কিছু। 'ত্রিশরণ'-এর ত্রিশূলের খোঁচায় বর্ণাশ্রম- সমাজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নেতিবাদী শূন্যতা মানুষের মনে স্থায়ী সান্ত্বনা এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। সঙ্ঘারাম গৃহজীবনের সুখশান্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থী শাস্ত্রযাজী সম্প্রদায় যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করেননি, তার সাক্ষী হচ্ছে পুরাণ ও উপপুরাণ নামে ছত্রিশখানি গ্রন্থের প্রচার। এই পুরাণ সাহিত্য বেদব্যাসের রচনা বলে চললেও এগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু জনের চেষ্টায় রচিত হয়েছে। অনেকের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাণগুলির পৌর্বাপর্য, গঠন ও রচনার মধ্যে অনেক স্থলে শিথিলতা প্রবেশ করেছে। কতকগুলি তো অর্বাচীন কালের রচনা। তাই কেউ কেউ ( উইলসন ) পৌরাণিক সাহিত্যকে হাজারখানেক বছরের রচনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্‌্তারনিৎজ স্বীকার করেছেন যে, পুরাণের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুরাণেরও উল্লেখ আছে। সূত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুরাণের যথার্থ গড়নটি ধরা পড়েছে। 'গৌতমধর্মসূত্রে' এবং 'আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে' পুরাণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি অতি প্রাচীন, খ্রীস্টের জন্মের চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বের রচনা। সুতরাং অনুমান

পুরাণের পূর্বরূপ খ্রীস্টের জন্মের পরে নয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের মহাকাব্যে, বিশেষতঃ মহাভারতের গড়নটিতে পৌরাণিক ছাঁদ লক্ষ্য করা যাবে।

ভারতীয় আর্যসমাজে খ্রীস্টের জন্মের পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব থেকে পুরাণের ধারা বহমান থাকলেও, আমরা যে-আকারে পুরাণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব প্রথম খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুরাণকে অর্বাচীন বললেও ভ্যান্স্ কেনেডি উইলসনের এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পুরাণগুলি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক। একাদশ শতকের তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেরুনী আঠারটি পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুরাণ পড়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং উইলসনের পুরাণের কাল-সম্পর্কিত অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। সে যাই হোক, পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত ( সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত ) পুরাণগ্রন্থ আদৌ অর্বাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুরাণে কবিত্ব ও রূপকের ভাষায় এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে, যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা মুনি ও রাজবংশের তালিকা এবং আরও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু অংশ বালসুলভ মনে হতে পারে। কিন্তু এর বাহ্য বিস্তার ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছেড়ে দিলে এর মধ্যে একযুগের সমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমৎকার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা স্বীকার করতে হবে। পুরাণ ইতিহাস না হলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের খনি। খ্রীস্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ সমগ্র ভারত-মানসকে ধারণ করে রেখেছে। আধুনিক যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্যসমাজ প্রাক্-পৌরাণিক শ্রৌতযুগে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেও সেকাল এবং একালের হিন্দুভারত কতটুকুই-বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? উপনিষদ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন তো করাঙ্গুলি-গণনীয় মুমুক্ষু মানবের আধ্যাত্মিক পলান্ন। বস্তুতঃ প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আর্যধর্ম, পরে হিন্দুধর্ম, একালে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, —যে ধরনের প্রেরণা ও নির্দেশ ভারতীয় হিন্দুসমাজকে চালনা করেছে, তার প্রায় সবটাই পুরাণাশ্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মমহামণ্ডল গড়ে উঠেছে, মুনি-ঋষি-দেবতারা যে পরিমণ্ডলের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও ভূগোলে যে সমস্ত যক্ষ-রক্ষ-

গন্ধর্বাদির বিচিত্র শোভাযাত্রা খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে একাল পর্যন্ত প্রসৃত —তার মূলটা পৌরাণিক।

২.

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত সাহিত্যের সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুরাণের প্রতি তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বোধ হয় উইলসন-ই সর্বপ্রথম তাঁর *Essays on Sanskrit Literature* ( *1832* )-এ এবং তাঁর অনূদিত বিষ্ণুপুরাণে পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভ্যান্‌স্ কেনেডি তারও এক বছর আগে *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Medieval Hindu Mythology*-তে পুরাণের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। ইউজেন বুর্নুফ, জুলিয়াস এগেলিং, মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, উইনডিশ, লুডার্স, পার্জিটার, ফার্কুহার— এঁরা নানাভাবে পুরাণের প্রামাণিকতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিশাল সাহিত্যের অনেক বিচিত্র দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। এঁদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক আচারানুষ্ঠান ও ভাবধারা ইদানীং ভারতে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পুরাণকেন্দ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকটা বজায় আছে। সুতরাং হাজার দুই বছরের ভারতীয় মানুষের মূল রহস্য বুঝতে গেলে পুরাণ-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। প্রায় দেড় শ' বছর ধরে তাঁরা নানাভাবে সে কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশে একালে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে দু'-এক কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুরাণের ঘোর বিরুদ্ধতা করে দোম আন্তোনিও দো রোজারিও নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী ক্যাথলিক খ্রীস্টান 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে' অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় আচার-আচরণের নিন্দা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল খ্রীস্টানধর্ম প্রচার। পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ করে তৎস্থলে 'মথিলিখিত সুসমাচার' প্রচারের দিকেই তাঁরা নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। তাঁরা কুক্রিয়াসক্ত ও পুতুলপূজক

কৃষ্ণকায় হীদেনদের যিশুখ্রীস্টের করুণার ধর্ম অর্থাৎ 'Religion of Mercy'-র ছায়াতলে আনতে চেয়েছিলেন। এ কার্যে কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখলেন, সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত পুরাণের অপ্রতিহত প্রভাব। তখন তাঁরা পুরাণকাহিনী ও *motif*-এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও দুর্নীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য হেলেনীয়, হিব্রু ও খ্রীস্টানী শাস্ত্র-সংহিতা ও পুরাণে যে অনুরূপ ব্যাপার প্রচুর আছে এবং পৌরাণিক যুগের সাহিত্য ঐ রকমই হয়ে থাকে, একথা তাঁরা মানতে চাননি—ধর্মপ্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিরোধী বাধে তারও মূল কারণ— এই পৌরাণিক সংস্কারের মূল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ। মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণ তন্ত্রাদির নিন্দা করলে রামমোহন 'ব্রাহ্মণসেবধি'-তে বলেন যে, মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণগ্রন্থকে যে জন্য নিন্দা করছেন, ঠিক অনুরূপ ব্যাপার খ্রীস্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে ভারতীয় পুরাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। সংস্কৃত পুরাণ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরোপাসনার প্রাথমিক সোপান। উচ্চস্তরে উঠলে পুরাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনার সারভাগ— মিশনারীরা যার বিশেষ সংবাদ রাখতেন না। রামমোহন এইজন্য 'ব্রাহ্মণসেবধি'তে তাঁদের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী রামমোহন পুরাণের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখান নি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তের জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদ তত্ত্বতঃ একবস্তু নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা সমাজসংরক্ষণের জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অপরদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং-বেঙ্গল'-দল, খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তানগণ এবং রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীরা— একে অপরের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য অবলম্বন করলেও, একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল। তা হল পুরাণাদির প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুরাণ অনূদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচারলাভ করেছিল। বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণু-কৃষ্ণবিষয়ক পুরাণের মুদ্রণ ও প্রচার ধর্মীয় কৃত্যের অন্যতম অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও

একাধিক বৈষ্ণব পুরাণ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মমত প্রভৃতি সিঁড়িগুলি একে একে পার হয়ে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তিকায় স্বীকার করেন, "নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।" 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় তিনি যে 'হিন্দুমহাসমিতি' গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীরা উপেক্ষিত হননি। তাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমিতির কার্য আরম্ভের পূর্বে "কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠিত হইবে।" তাঁর মতে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম দু'দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথম— এই বিশেষ দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন করে উপনিষদ-বেদান্তাদি-নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বে পৌঁছান সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয়— সমগ্র ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির দিক থেকে একতাবদ্ধ করতে হলে সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থাৎ পৌরাণিক মত, তাকেই অবলম্বন করতে হবে। রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীর দল, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানের 'কৈশবী দল' ও ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ— এদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষৎ মত-পার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই কমবেশী পুরাণবিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় ততটা পুরাণবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ভক্তির আবেগে পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেছিলেন। পুরাণ-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল।

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে পারস্পরিক বিরোধে ব্রাহ্মসমাজ কিছু হীনবল হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক ব্রাহ্ম পুরাণকে আর কুসংস্কার বলে অবহেলা করলেন না। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের যুব-সমাজের উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ধর্মকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবায় সঞ্চারিত হল। এরই কিছু পূর্ব থেকে পাশ্চাত্ত্য ভারততত্ত্ববিদেরা পুরাণের ইংরেজী অনুবাদ করে এবং পুরাণের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে শিক্ষিত ভারতবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি এর প্রতি ফেরাতে সমর্থ হলেন। এই

পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য ধরনের শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ঝোঁকে ব্রাহ্মসমাজ ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দিকে ঢলে পড়েন নি। তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর এবং পরবর্তীকালে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' আলোচনা করার সময়ে হিন্দুধর্ম ও পৌরাণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এর অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টির সঙ্গে লিপিযুদ্ধ থেকে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে মোটা-মুটি ধারণা করা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তও বোঝা যায়।

১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'প্রচারে' "রাধাকৃষ্ণ" নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরদাস বাবাজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন :

> "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণ-কার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া এই ধর্মার্থরূপকটি গঠন করিয়াছিলেন।...কৃষ্ণ রূপক নহেন...তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত রূপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা স্বীকার করেন নি। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> "ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।"

এখানে লক্ষ্য করা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তাঁদের সাকার বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং সেই সমস্ত পৌরাণিক কথাকে "অদ্ভুত উপন্যাসের বিষয়" বলে ব্যঙ্গই করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে একটু গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকারান্তরে পৌরাণিক দেববাদ ও ঐতিহ্যকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলে স্বীকার করেছেন— "আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসর্গিক, অসম্ভব ও অবাস্তব— এমন বিস্তর ব্যাপার অন্যদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজস্র আছে। লিভি, হেরোডোটস, ফেরিশ্‌তা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকারগণ সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের রং মেশাতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্যে ও ইতিহাসে এই ধরনের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যাবে। সেই অতিরঞ্জন ও অলীক কথা থেকে পুরাণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে রক্ষা করতে পারলে তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের নতুন স্বরূপ ফুটে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করলেও নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্যে— যাকে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বলা হয়, তার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র— এঁরা সকলেই পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পুরাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেবরেই গ্রহণ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে পুরাকথাকে মার্জিত করে নিয়ে সাহিত্যে তাকে গ্রহণ করা— উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনৈসর্গিকতা, অতিরঞ্জন ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রক্ষেপের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুরাণে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার অনুপ্রবেশ করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা করে একালের অনেকে পুরাণের বাগ্‌বাহুল্যের মধ্য থেকে প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের

চেষ্টা করছিলেন। কেউ প্রাচীন কাহিনীর অন্তরালে রূপকাশ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-বা পুরাণের মধ্যে একালের ইতিহাসের অনুরূপ ব্যাপার সন্ধান করছিলেন।

পৌরাণিক দেবমণ্ডলের দুই প্রধান কুলপতি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয়। এই নব্য বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা মধ্য যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নয়। আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একধরনের মানবহিতবাদমূলক নৈতিক আদর্শের পটভূমিকায় কৃষ্ণকে উপস্থাপনার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয়। নবীনচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' মহাকাব্যে কৃষ্ণচরিত পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সমাজ, যাঁরা মোটামুটিভাবে পরম্পরাগত ভারত-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পুরাণের কৃষ্ণকেই নতুন করে যুগোপযোগী করে নিতে চাইলেন। এই মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌরাণিকতা। পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন না দিয়ে তার অতিরঞ্জন ও রূপকের খোলসের মধ্য থেকে তার যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা, ইতিহাসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুঁজে বার করা— এই যুগের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এর একটা উগ্র *chauvinistic* রূপ শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচারের মধ্যে ফুটে উঠল যা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে নি। সে যাই হোক, ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও খ্রীস্টান মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা করে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করেন নি। তাঁর পূর্বে বিদ্যাসাগর, যিনি পৌরাণিকতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না, তিনিও ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত'-এর কিয়দংশ রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাঁর অন্যতম ভক্ত ও পার্শ্বচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ('চিরঞ্জীব শর্মা') তাঁরই নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কখনও কখনও আবেগ বশতঃ 'নির্বিকার হরি' এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন :

"মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তির দয়া, মা আমার

পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক, পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা !···এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"
( 'আচার্যের প্রার্থনা' )

আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র পৌরাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন একথা স্বীকার করতে হবে।

৪.

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করবার জন্য একটি জীবন্ত বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কোঁৎ-পন্থী হলেও পরবর্তী কালে তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সংযুক্ত করেছিলেন। এই সেশ্বর কোঁৎদর্শনই তাঁকে অনুশীলন ধর্ম (*Religion of Culture*) অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যীভূত মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল। "গৌরদাস বাবজির ভিক্ষার ঝুলি" ( 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় খণ্ড ) এবং 'ধর্মতত্ত্বে' ( ক্রোড়পত্র-খ ) গুরু-শিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় বৈরাগ্যবাদ বা মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানী সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। মানববৃত্তি সমূহের সুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুরুষার্থে ( ঈশ্বরভক্তি ) উন্নয়ন —একথাই তিনি ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুর ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মার অন্তরে। এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, আচারসর্বস্ব কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হিন্দু হিন্দু নয়, বরং আচারবিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবনযাপনকারী ব্যক্তি— তিনিই যথার্থ হিন্দু। এই দুই ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়— তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি? একব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু

বলিতে হয়" ('দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম')। অর্থাৎ আচার নয়, সদ্বর্মগামী নরোত্তমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। সেই সর্বোত্তম নরোত্তমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য অনুশীলন করতে লাগলেন, বহু পরিশ্রম করে তিনি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণচরিত্রকে সেই আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধারণ করলেন। এ সম্পর্কে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপক্রমণিকা থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে :

> "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণে ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার-কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।"

বলা বাহুল্য এই 'পাপোপাখ্যান'-এর প্রায় সবটাই কৃষ্ণ-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-রাধা গোপীলীলার প্রতি তিনি অতিশয় প্রতিকূল ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, "এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাস মাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।" 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' গীতার এই বাণী সত্ত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পরদারাভিমর্ষণ বলে নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব হানিকর উপন্যাস অতিশয় অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধনতত্ত্ব অনেক সময়ে তাঁর কাছে "কামকুসুমদামশোভিত" ইন্দ্রিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' ও জয়দেব সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা এই ধরনের প্রতিকূল—"যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।" তাঁর ধারণা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায় সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য।" কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অযথা দুর্নীতিপূর্ণ গালগল্প স্থান পেয়েছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতে যে ধরনের কৃষ্ণ-গোপীলীলা বর্ণিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু মাঝখানে বাদ সেধেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এ পুরাণের

প্রাচীন রচনায় কি ছিল জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচারিত হয়েছে তাতে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র আদিরসের উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে। তাঁদের আচার-আচরণ ভাববৃন্দাবনের তুরীয়লোক ছেড়ে ভৌমবৃন্দাবনের ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব দেখা যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ।" সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্র এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণের অনৈসর্গিক বাল্যলীলা এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের এইভাবে ধমক দিয়েছেন— "যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে— পিশাচ" (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়)। এই ধরনের লীলাকে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' আধ্যাত্মিক বলে শোধন করেছেন— "সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করামাত্র।" অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণের গোপীলীলাকে তিনি **'with a grain of salt'** গ্রহণ করতে চান— আদিরসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে রাধাকে প্রত্যক্ষ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে অবিকল তার মতো ছিল না, তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন:

'একজন ভক্ত বলিলেন, "শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।"— কথামৃত, ৩য়।

পরে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, "ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।" তখন 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে পূজার প্রাক্কালে 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ' নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত

হয়। এর ছ'বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম সংস্করণের চেয়ে অনেক বিস্তারিত-ভাবে ও বিশাল আকারে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ছ' বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন :—

> 'প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।"

'আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ' বাক্যাংশের অর্থ— প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের যাবতীয় অলৌকিক লীলা, যা নৈসর্গিকতাকে লঙ্ঘন করে এবং রাধা-কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গোপীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত করে তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ) 'মানস-বিকাশ' নামক একখানি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এর পর প্রায় দু' বছর পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৮১, চৈত্র) 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন :

> "বৈষ্ণবকবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারত-বর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।"

এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন—মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি এক চরিত্র? "চারিজন গ্রন্থকারই (অর্থাৎ মহাভারতের ব্যাসদেব, ভাগবতকার, জয়দেব ও বিদ্যাপতি) কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি একপ্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?" অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিৎ জবাব দেবার চেষ্টা করলেন 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) গ্রন্থে "কৃষ্ণচরিত্র" নিবন্ধে। 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন 'প্রচারে'র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 'প্রচারে' প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি কৃষ্ণচরিত্র লিখতে থাকেন। এর কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ঐ 'প্রচারে'-ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পরিচ্ছেদ ('প্রস্তাব' ও 'যাত্রা'—দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ' বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ গোপীলীলাদি আদিরসের কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্য আবিল আদিরসকে ভক্তিরসের গঙ্গোদকে শোধন করে নিয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণ যে বৎসর এবং যে মাসে (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মর্ত্যলীলা নির্বাহ করলে দেখতে পেতেন, ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার করেছেন, এমনকি বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার "আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ" হলেও এবং "সেই সকল বর্ণনার বাহ্য দৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে" (কৃষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পরি.)। তার পর তিনি গীতার বচন উদ্ধৃত করে বলছেন:

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ—ইতি বাক্যের অনুবর্তী

হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারী হইল।"

শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।......রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা তিনিই রাধা বা রাধিকা।"

পরিশেষে এই বলে উপসংহার করেছেন : "রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই।"

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে জগদীশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যী-ভূত নরোত্তম, ভক্তের ভগবান, প্রার্থীর বাঞ্ছাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য চক্রধারী 'কলয়সি করবালম্'। তাঁর মতে "খ্রীস্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা" কিন্তু কৃষ্ণই হচ্ছেন নরজাতির একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক। সে যাই হোক, এই সময়ে পুরাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে দুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেলে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন, "সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত।" প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এঁরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে "মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।" আর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যের 'ইণ্ডোলজিস্ট'গণ, যাকে বলতে পারি আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাঁদের অনেকেই ঔপনিবেশিক দম্ভ বশতঃ প্রাচীন ভারতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে 'পাথুর‍্যা' প্রমাণ রয়েছে বলে সেটির খ্রীস্টপূর্ব প্রাচীনতা কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের কারও কারও মানসিক 'অ্যালার্জি' আছে। "তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য।"[৬]

আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দুই দলকে বাদ দিলেন। এ ছাড়া আর এক দল আছে। এঁরা হলেন ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণকারী। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঝাঁঝালো হলেও অযৌক্তিক নয়—"যাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না,"—বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেরুদণ্ডী জীবদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও "দেশবৎসল ও সত্যপ্রিয়", বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্যই কৃষ্ণচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথবা শাস্ত্রচর্চার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণালোচনা এবং কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হননি। কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যার মধ্যে দৈবী মহিমা নয়, মানুষের মর্যাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। পুরাণাদি বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুরাণকারেরা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে ভূতলচারী সামান্য মানুষে পরিণত করেছেন; মানুষের নানা ধরনের চারিত্রিক দুর্বলতাও তাঁর চরিত্রে রয়েছে। মহাভারত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুরাণের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, যে পুরাণ যত অর্বাচীন, তাতে কৃষ্ণচরিত্রের অনৈসর্গিকতা ও মানবিক দুর্বলতার ভাগ তত বেশী।[৭] শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণ কেন, শৈব পুরাণেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালের পাঠক চমকে উঠবেন। বলা বাহুল্য পুরাণগুলি একসময়ে বা একহাতের লেখা নয়। হাজারখানেক বছর ধরে পুরাণের বহু পুঁথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপার উচ্চতর দার্শনিকতার সঙ্গে অবিরোধে এর মধ্যে বাস করে আসছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, দেবভাষায় লেখা পুরাণমাত্রেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁর পক্ষে পুরাণকথাকে পুরোপুরি হজম করা কঠিন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে তণ্ডুল ও তুষ আলাদা করবার চেষ্টা করলেন। তিনি কালানুক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করে, কোথায় তুষের ভাগ অধিক তা নির্দেশের জন্য সাধারণ জ্ঞান, বাস্তব চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির যৌক্তিকতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। যেখানে

স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উদ্ভট অলৌকিকতার বাহুল্য প্রবেশ করেছে, সঙ্গতিবোধের অভাব ঘটেছে, পুরাণের সেই অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যাগ করবার পক্ষপাতী। অবশ্য পুরাণের মধ্যে কতটুকু প্রাচীন ও যথার্থ, আর কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। আমরা যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতি ও সম্ভাব্যতার মাপকাঠি দিয়ে পুরাণসাহিত্য বিচারে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহৃত। কিন্তু গ্রীক, হিব্রু ও খ্রীস্টান পুরাণেও এমন অনেক গালগল্প আছে যে, তার মধ্যেও যুক্তিবুদ্ধি বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্বিত গজকাঠি দিয়ে মাপলে পশ্চিমের তামাম পুরাণগ্রন্থকে বাতিল করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর— যখন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাপারের প্রতি স্বাদেশিক ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুরাণকেও অশ্রদ্ধার আঘাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তার পরতে পরতে ধূলোবালি জমেছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সে মলিন আস্তরণ ভেদ করতে অপারগ হয়ে পৌরাণিক ঐতিহ্যের শুধু দোষকীর্তন করেছেন। পুরাণকে যুগসঞ্চিত মালিন্য থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে মধ্যস্থ মেনে অগ্রসর হলে না। পুরাণ ভক্তিগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলেই নয়,— বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করলে এবং তণ্ডুলকণা থেকে তুষ ঝেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।[৮] এই দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক হাতে পাশ্চাত্ত্য দোষদর্শী গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্ধভক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদের নয়নে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করতে হয়েছে। পুরাণকে নবীকরণ নয়, পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথার্থ বর্ণনা স্ফীত হয়ে মূলকে আবৃত করেছে, কোথাও কোথাও বিকৃত করেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তারই বিরুদ্ধে যুক্তির অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাড্যের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করা মহাসত্ত্ববান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। 'বঙ্গদর্শন'গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় এদিক থেকে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যত্রয় আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই যুগকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরকে 'Hindu religious revival'-এর যুগ বলেছিলেন। কিন্তু revival শব্দটিতে পুরাতনের অনুবৃত্তি

বোঝায়। বঙ্কিম-প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুয়ানিকে কি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করেছিল? এ যুগে যখন ঘরে ফেরার পালা শুরু হল তখন স্রোতোধারা গোমুখীগহ্বরে ফিরে যাবার বৃথাচেষ্টা করেনি; জীবন ও ঐতিহ্য নতুন পথেই চলতে শুরু করল। পুরাতন সাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে অনুস্বর-বিসর্গের টঙ্কার সৃষ্টি করতে চাননি। বুদ্ধি ও বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে পুরাণকে গ্রহণ করতে হবে। বেদব্যাস, বোপদেব বা অন্যান্য লেখক, যাঁরাই পুরাণ রচনা করুন না কেন, এর মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপার প্রবেশ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার থেকে পুরাণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কল্মষ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয়, যুগধর্ম-সন্ধানেরও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে পুরাণকে নব্যজীবনের পাশাপাশি দাঁড় করাতে হলে এই গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত্ন মহিমায় স্থাপন করতে হবে। নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডেই পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনের মূল কথা হল মানবিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণের মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান করতে লাগলেন। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায় নেই, যা যুগধর্ম বিরোধী, পুরাণের সেই অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল না— অনেকটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-আনুগত্যের মতো। যদিও উপনিষদ মহর্ষির আত্মার খাদ্যপানীয়ে পর্যবসিত হয়েছিল, তবু তিনি বহুপ্রচারিত এগারখানি উপনিষদের সব মন্ত্রই ব্রাহ্মসমাজের অনুকূল বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' নিয়ে মহর্ষি বড়োই চিন্তায় পড়লেন। আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্যসহ সব উপনিষদগুলি কি ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক বীজ হতে পারে? উপনিষদের যে-সমস্ত মন্ত্র তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছা বাছা ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তা তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন। এইভাবে ঘণ্টা তিনেকের অনুলিখনে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহর্ষি স্বানুভাবানুকূল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন, সমগ্র উপনিষদকে নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি এ-ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধের মতো গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখাননি। তাঁর

আদর্শ ও উদ্দেশ্য যার দ্বারা সিদ্ধ হবে, তিনি উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচারে নিয়োগ করেন। বঙ্কিম যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কার্যকারণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতার যৌক্তিকতা নির্ধারণে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মোটকথা পুরাণ ও পুরাণজাতীয় ভারতীয় ঐতিহ্যের যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও স্বাভাবিকতা-অনুমোদিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌকিকতার মোহমুক্ত, তাকেই আমরা নব্য পৌরাণিকতা বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের দল সেই পথের পথিক। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বেদানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তব নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারের এই রীতিটি বাংলাদেশ থেকেই সারা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ও ষড়দর্শনের প্রভাব একালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত। এখনও আমরা মুখে বেদান্ত-উপনিষদের কথা বললেও আচারে-আচরণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোরতর পৌরাণিক। ইদানীং সার্বজনীন পূজাপার্বণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা যে কোনও সুদূর ভবিষ্যতেও স্থূল পৌরাণিকতা ছেড়ে সূক্ষ্মতর উপনিষদ-বেদান্ত তত্ত্বে উপনীত হব এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত নব্য পৌরাণিকতার একটি দুর্বলতর দিক আছে। শুধু যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেনে নিলে পৌরাণিক ব্যাপারের মধ্যে বহু ছিদ্র আবিষ্কার করা যাবে। স্বাভাবিকতা ও লৌকিকতার দ্বারা বিচার করলে এবং প্রাকৃত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে পুরাণের বহু অংশ পরিত্যাগ করতে হবে। পরিত্যাগ না করলে দোটানায় পড়তে হবে। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই ধরণের বিপদে পড়তে হয়েছে। লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী পরিপাক করা দুরূহ হবে। এই জন্য ভক্ত বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাকৃত এবং অচিন্ত্য বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ঠ, রাধা— সবই রূপক।[১১] তাঁর মতে, নিদিধ্যাসন করলে ঈশ্বরোপাসনার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করি :

"যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।"[১২]

এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন: "ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।" এই যে জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, এতে কি তাঁর অন্তরের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছিল? 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন:

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি।......এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।"[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমার্গীয় নব্য পৌরাণিকতা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় এসে পৌরাণিকতার নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস ভারতের শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সর্বযুগের শরণ্য, এবং শুধু বুদ্ধিবিচার নয়, জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম সত্তায় পৌরাণিক ভাবমূর্তিকে যথাযথভাবে পরিস্থাপনা— এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও বিশ্বসভায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সে আর এক যুগের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালীসমাজকে ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহলী করেছিলেন, পুরাণের প্রতি আধুনিক ভারতীয়ের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন, এর জন্য ভারতবর্ষ তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবে।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমজন্মোৎসব সভায় পঠিত)

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. M. Winternitz— *A History of Indian Literature*, vol. I, Part II, 1963 (C.U.) pp. 455-56

২. পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাই বলুন, একালের অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভারতীয় পুরাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিনতারনিৎজ মণিলাল দ্বিবেদী নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ খ্রী: অব্দে স্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ভিনতারনিৎজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "As a man of western education he spoke of anthropology and geology, of Darwin and Haeckle, Spencer and Quatrefages, but only in order to prove that the view of life of the puranas and their teachings upon the creation are scientific truth and he finds in them altogether only the highest truth and deepest wisdom— if only understands it all correctly, i. e, symbolically."— Winteritz, Ibid, p. 404

৩. বাইবেলের মধ্যে যে একই রকম পৌরাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামমোহন লেখেন, "অতএব মিশনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট য়িশু খ্রীষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা, আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর য়িশু খ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ভোগ মানেন কিনা···তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন কিনা ও তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কিনা এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপ-বিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবেশ করিতেন কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশু খ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কিনা যদি এসকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ-দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণমতে ঈশ্বরের নামরূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্র বিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকার বিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যেহেতু এসকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব সম্পূর্ণমতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।"— ব্রাহ্মণ সেবধি,

সংখ্যা ২

৪. 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের ( 'প্রচারে' প্রকাশিত ) পাদটীকায় শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন : "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।" ( 'বিবিধ প্রবন্ধ'— বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ পৃঃ ১৮৭ )

৫. লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক স্যর জন রবার্ট সীলী ( ১৮৩৪-৯৫ ) মূলতঃ ইতিহাসে আসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ (*Ecce Homo*, 1865) খ্রীস্টানধর্ম-সংক্রান্ত, যাতে তিনি খ্রীস্টের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই গ্রন্থেই তিনি সবিস্তারে অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'দেবীচৌধুরাণী' এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ধর্মতত্ত্বে' ( ১২৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর কথা উদ্ধৃত করেছেন— "The substane of religion is Culture ; the fruit of it, the Highest Life." (*Ecce Homo*, p. 145)। তাঁর চিন্তায় সীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয়।

৬. 'লোকরহস্যে' "রামায়ণ সমালোচনা— কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত" কৌতুকপ্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের পল্লবগ্রাহী বিলাতী পাণ্ডিত্যকে সরস ব্যঙ্গ করেছেন।

৭. ভিনতারনিৎজ-ও এই মতে বিশ্বাসী, তিনি এ-সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন, "The later the Purana this may be regarded as a general rule—the more boundless are the exaggerations." (*Indian Literature*, Vol. I, Part II, p. 4c5, C. U., 1963 )

৮. *Indian Literature*, Vol. I, Part II, pp. 464-65

৯. B. N. Seal—*New Essays in Criticism*

১০. দ্রষ্টব্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ( পৃঃ ১৩৪ ), বিশ্বভারতী সং, ১৯৬২

১১. দ্রষ্টব্য : বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য় )— "গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি"

১২. ঐ

১৩. ধর্মতত্ত্ব, ১১শ অধ্যায় ( "ঈশ্বরে ভক্তি" )

# রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের ইতিহাস

১০

"ইতি হ আস" যে যথার্থ ইতিহাস নয়, তা বোধ হয় অধুনা ইতিহাস-রসিকেরাই স্বীকার করবেন। অনেকেই সক্ষোভে বলেন যে, প্রাচীন ভারতে আর কিছু থাক আর নাই থাক, ইতিহাস যে ছিল না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশ ও কালের সমবায়ী সত্তার নাম ইতিহাস। ঘটনা বলতে গেলেই তার একটা পরিমিত কালবন্ধন ও ভৌগোলিক সংস্থান-চেতনা এসে পড়ে। 'ইতি হ আস' (এইরূপই ছিল) — অর্থাৎ কিনা ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনাপরম্পরার যথাযথ বিবৃতি। প্রাচীন ভারত সনতারিখের ক্রনলজি সম্বন্ধে প্রায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছে। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে মাটির প্রতি মায়া মায়াবাদ বলে বর্জিত হয়েছে। ফলে বিদেশীর ভারত আক্রমণই হোক, অথবা ভারতের নিজস্ব জীবনকথার কালগত পরিমাপই হোক— কোন বিষয়েই প্রাচীন ভারতের কালবিচার নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কাল সম্বন্ধে আমরা নির্বিকল্প। তাই আমাদের কাছে ব্রহ্মার ষষ্টিসহস্র বর্ষ যেন ঘণ্টামিনিটের ব্যাপার বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য জাতি এবিষয়ে খুব সতর্ক; সনতারিখের নজির না মিলিয়ে তাঁরা এক পাও অগ্রসর হন না। তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধান করতে এসে 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান না এবং ইতিহাসচেতনার প্রতি ভারতবর্ষের উদাসীনতাকে জগতের প্রতি অনাস্থা মনে করে ভারতসভ্যতার ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আধুনিক কালে যিনি ইতিহাস-দর্শনের ছাত্র, তিনি ইতিহাস বলতে শুধু 'ইতি হ আস'-কে গ্রহণ করতে রাজী হবেন না। তাঁর মতে, বোধ হয়, সনতারিখের ব্যূহসজ্জা এবং অতীত ঘটনার তালিকাবর্ণনা ইতিহাস-চেতনার নিতান্তই প্রাথমিক ব্যাপার। ইতিহাসের অর্থ— ঘটনার বিবৃত নয়, ঘটনার ব্যাখ্যান; সনতারিখের সমরসজ্জা নয়, দেশ ও কালের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ। কাশ্মীরী কবি কহ্লণ তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'-তে ইতিহাস সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের মূল কথা— 'ভূতার্থকথন,' অর্থাৎ

অতীতের তাৎপর্য, প্রাচীনের ব্যাখ্যান। আধুনিক ইতিহাসকারও ভারত-কথনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে চান।

প্রাচীন ভারত সনতারিখের হিসাব রাখেনি বটে; কিন্তু পুরাণে-মহাকাব্যে-স্মৃতিসংহিতায় ইতিহাসের যথার্থ স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে নানারূপ বিচিত্র বর্ণনা এবং অনৈসর্গিক প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের সত্যকারের ইতিহাস, তার জনজীবনধারা, তার মন ও প্রাণের স্বরূপ এর মধ্যে সংগুপ্ত অবস্থায় আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা সে দিকটাকে অনেক সময় উপেক্ষা করেছেন, বা অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ-বা সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক অংশগুলিকে রূপক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বার বার ধিক্কার দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের ইতিহাস নেই; এবং ইতিহাস যখন নেই, তখন অতীত ছিল না এবং ভবিষ্যৎ-ও থাকবে না; থাকবে শুধু বর্তমান —ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিবৃত্ত!

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে দেখি, বিদ্যাসাগর নিজে একজন ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক ছিলেন, দেশী বিদেশী বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বোধ হয় বাংলার একখানি মৌলিক ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কর্মযোগী মহাপুরুষের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের লেখা ভারতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে যে অজ্ঞতা এবং বিজয়ী-জাতিসুলভ দাম্ভিকতা ফুটে উঠেছে, তা' উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী পাঠ্যকেতাব হিসেবে মুখস্ত করলেও মনে মনে এই সমস্ত মিথ্যা জল্পনাকে কখনও মেনে নিতে পারেনি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নজিরের প্রতি নজর রেখে ভারতের যথার্থ পুরাতত্ত্ব সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর শিষ্য-মণ্ডলীও ভারত ও বাংলার ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন।* সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উনিশ শতকে বাংলার যে নবজাগরণ হল, ইতিহাস-চেতনা তার একটা বড়ো লক্ষণ। রেনেসাঁসের য়ুরোপ যেমন নতুন করে প্রাচীন ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন করেছিল, উনিশ শতকের বাংলা দেশও সেই রকম প্রাচীন ভারত ও বাংলার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করে জাতি ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক চেতনার উদ্বোধন

* প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, ইতিহাসে অতিশয় তন্নিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দও ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের অভিপ্রায়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

করলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।" অন্য প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন : "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।" একথা তিনি বলেছিলেন ১৮৮২ সালে ('বঙ্গদর্শন', ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ)। 'ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান'— এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপের কথা ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল এই প্রবন্ধ রচনার কুড়ি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে। ১৩০৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখলেন, তাতেই সর্বপ্রথম ভারত-ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ল ; এদেশের প্রবহমান ঐতিহ্যের প্রাণরহস্য প্রকাশ্য আলোকে আত্মপ্রকাশ করল।

২.

ভারত-ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল বিরোধের মধ্যে মিলন, বিবিধের মধ্যে ঐক্য। এই স্বরূপটি পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রায় অনুপস্থিত। এই যে বৃহৎ ভারতবর্ষ, এখানে বিধাতার সৃষ্টির একটা বড় রকমের পরীক্ষা হয়েছে ; এখানে প্রাচীনকাল থেকে কত জাতি বহু নদনদী-গিরিদরী পার হয়ে এসেছে। কেউ এসেছে লোভের বশে, কেউ এসেছে জিগীষার তাড়নায়, কেউ এসেছে বীরের বেশে, কেউ এসেছে প্রাণহননের পাশব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু ক্রমে রক্তের তাণ্ডব প্রশমিত হয়েছে ; আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়, যবন-শক-হূন, তাতার-তুর্কী-খোরাসানী-মোঙ্গল— সবই শেষ পর্যন্ত "এক দেহে হ'ল লীন"। এই ঐক্যের স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার সবচেয়ে সার্থক দান। ভারতবর্ষের এই ঐক্য বহু সংঘর্ষ সহ্য করে নিজ সত্তা রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, একথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা— বাহিরে

যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের প্রাণতত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের এই গাঢবন্ধ উক্তির মধ্যে আশ্চর্য স্বচ্ছরূপে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষাণদের (যেমন 'নীল আন্দোলন') মধ্যেও খানিকটা অর্থনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং ইংরেজ রাজত্বের ঈশ্বরাদিষ্ট মহিমা সম্বন্ধে অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হতে আরম্ভ করেছিল। ঠাকুর-বাড়ীর উদ্যোগে এবং নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে 'হিন্দু মেলা'র (১৮৬৭) অধিবেশনে সর্বপ্রথম স্বদেশচেতনা বাস্তব আকারে স্ফূর্তি লাভ করল। দেশকে নতুন করে চেনা, ইতরভদ্রের সঙ্গে মিলনের প্রচেষ্টা, দেশী শিল্পকে আবার সমাজে প্রচার করা প্রভৃতি গঠনমূলক স্বাদেশিকতা সর্বপ্রথম এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তখন পালে উত্তেজনার হাওয়া লেগেছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬)-এর আন্দোলন এবং ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ-বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি উগ্র উত্তেজনার প্রতিষেধকরূপে কাজ করেছিল। তিনি ইতিহাসকে স্বদেশমন্ত্রের দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও স্বেচ্ছাক্রমে ঐতিহাসিক মনোভাব পরিত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই রাজনৈতিক আবহাওয়ার উত্তাপ বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে 'সাধনা' পত্রে স্বাদেশিকতার স্বরূপ নিধারণ করতে আরম্ভ করলেন এবং নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনাকে বাদ দিয়ে বরং দেশকে সামগ্রিক চেতনার পক্ষ থেকে আহ্বান করলেন। বিদেশী শাসনকে তিনি নিন্দা করলেন বটে, কিন্তু সে নিন্দার কারণ এই নয় যে, মধ্যবিত্ত সমাজ যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে না। ইংরেজ আমলে ভারত-ইতিহাসের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, জাতি ও জীবনের সামগ্রিকতা খর্ব হয়ে গেছে। যখন বাংলা দেশে শুধু ক্ষমতা-পদ-চাকুরীকামী রাজনৈতিক কলরব আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ফেলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তচিত্তে ভারতের ইতিহাস-দেবতার রথচক্রের দিক-নির্দেশ করেছিলেন।

বিদেশীরা ভারতবর্ষকে জানে না। ঔপনিবেশিক ও বণিগ্‌ধর্মী য়ুরোপ ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে ভারতের যথার্থ পরিচয় পায়নি। দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়,

সমাজ, ভাষা, আচার-আচরণ থাকলেও চিরদিনই সেটা ভারতবর্ষকে ঘিরে একটা সমগ্র দেশ-চেতনা বজায় রেখেছিল। জৈন মহাবীর বাংলায় এসেছিলেন, দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য ভারতের চতুঃসীমায় চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন, চৈতন্যদেব উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে যুগে যাঁরা কোনো নতুন কথা, কোনো নতুন প্রেরণার আদর্শ বলতে চেয়েছেন তাঁরা সমস্ত ভারতের কর্ণগোচর করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, শুধু নিজ নিজ আঞ্চলিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। আধুনিক কালে ইংরেজী সভ্যতা ও শাসন প্রণালীই যে আমাদের ভারত-ঐক্য দান করেছে তা ঠিক নয়। মধ্যযুগে বা তারও আগে এই জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা মমতাবোধ ছিল। তবে সে মমতা বা ঐক্যবোধ মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক জনতাকে এক-খোঁয়াড়ে পুরে যে ঐক্যের পরিকল্পনা, তা ইংরেজের শাসন-কারখানাঘরের সৃষ্টি— যার থেকে ১৯শ শতাব্দীতে আমরা স্বজাতিকামী ও পরজাতিদ্বেষী ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর পাঠ নিয়েছিলাম। কিন্তু বিভিন্নতাকে জোর করে রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে আনা যায় না, এই সত্যটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকায় যাঁরা বাস্তু নির্মাণ করেছেন, তাঁরা ভিন্নদেশবাসী ও পৃথগ্‌ভাষী হলেও আমেরিকার ধরন-ধারণ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিজ দেশ, ভাষা ও আচার-আচরণকে যথাসম্ভব ভুলতে চেষ্টা করেছেন। আমেরিকার সংস্কৃতির অর্থ একাকারের ইতিহাস, ঐক্যের ইতিহাস নয়। একাকারের মূলকথা— বিবিধ, বি-ষম, বিচিত্রের পৃথক সত্তাকে জোর করে বা, কৌশলে চূর্ণ করে একটি রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ তৈরি করা। ভারতবর্ষের ইতিহাস ঐক্যের ইতিহাস। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেও ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতি আন্তরিক টান থাকতে পারে, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রমাণ দিয়েছে। কারণ ভারতবর্ষ জানত :

"পৃথক্‌কে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত।"

রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন যে, স্বীকরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বড়ো ধর্ম। আর্যেতর জাতির কাছ থেকে ভারতবর্ষের আর্যেরা অনেক কিছু নিয়েছেন। আচার-আচরণ, দেববিশ্বাস, ধর্মীয় কৃত্য,

আধিমানসিক চর্যা, জনন-মরণাশৌচ, বৈবাহিক সংস্কার— আর্যেরা এসব ব্যাপারে বহু স্থলে স্থানীয় রীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়: "ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।" ইংরেজ আমলে এই মন্ত্রটি আমরা ভুলেছি। মাৎসিনি, গারিবল্ডি, কাভুার, বিসমার্কের আদর্শে আমরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই করেছি (অবশ্য অনেকটাই বায়বীয় ব্যায়াম!)। কেউ কেউ এর জন্য প্রাণ বলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তবু শেষ পর্যন্ত আমরা চরিত্রকে বাঁচাতে পারি নি। হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে লোভ দেখিয়ে সুকৌশলে দলে টানার চেষ্টা করেছি, মধ্যযুগীয় খিলাফত আন্দোলনকে স্বাদেশিক গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করেছি, 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি অবলম্বন করে ভাবের ঘরে বেমালুম চুরি করেছি, চতুর্দশ দফার ফরমুলা শিরোধার্য করে পাশ্চাত্য ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের রীতিমত চেষ্টা করেছি। তার ফলাফল হয়েছে দুঃসহ। চরিত্রনীতি ভেঙেছে, সমাজবন্ধন শিথিল হয়েছে, পরিবার ভগ্নমূল হয়েছে, জীবন-নীতির মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিবেশী হয়েছে ঘোরতর শত্রু। তার কারণ, "পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে।" তা হলে পারস্পরিক পার্থক্যকে কীভাবে ভারতবর্ষ ঐক্যের বন্ধনে এনেছিল? "সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়— তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া।" জোর করে, কৌশলে, প্রলোভনে এক করবার বিড়ম্বনা আজ আমরা দুর্মূল্য দিয়ে বুঝতে পারছি। রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তার গতিপথের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের রাজনৈতিক বিধাতারা ভুল করেছিলেন বলেই আজ চারিদিকে ভাঙনের স্রোত বয়ে চলেছে।

৩.

রবীন্দ্রনাথ এই যে ঐক্যতত্ত্বের আবিষ্কার করলেন, এটি কি পাশ্চাত্য ইথ্‌নোলজিস্টদের অনুকরণে লেখা, অথবা তাঁর মনগড়া থিওরী? কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে ভারত-সংস্কৃতিসম্মত, ভারত-ইতিহাসের মধ্যেই সে-তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে।

আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা অর্ধসভ্য নিষাদজাতি এবং সুসভ্য দ্রাবিড়ভাষী জাতির বিরোধের সামনে দাঁড়ালেন, এবং সে বিরোধে একটা বড় কাজ হল আর্যদের দলগত ঐক্যের সংহতি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে মন্ত্র-গোত্র-দেবতা নিয়েও অন্তর্বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে এসে তাঁদের এমন প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে নামতে হল যে, নিজেদের দল-উপদলগত পার্থক্য দূর হয়ে গেল এবং একটা সামগ্রিক আর্য-ঐক্য গড়ে উঠল। সেই উদ্যোগপর্বের ইতিহাসই তো রামায়ণে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সেই ঐক্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখলেন যে, রামায়ণের যুগের তিনটি ব্যক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়— জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এরা তিনজন সমসাময়িক কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করতে পারেন ; কিন্তু ভাবের দিক থেকে তাঁরা একই যুগমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে তখন মন্ত্র ও বিদ্যা নিয়ে কুলপতিদের মধ্যে কি একটু-আধটু সঙ্কটের সৃষ্টি হয়নি? হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যাবতীয় বিদ্যা ও যজনকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়-সমাজ দেশরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহে অধিকতর ব্যস্ত বলে এ সমস্ত বিদ্যানুশীলনে কিছু উদাসীন ছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ নামক বিশেষ শ্রেণীর উপর যজ্ঞকর্ম ও তদানুষঙ্গিক বিদ্যার ভার অর্পিত হল, এবং সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীসচেতন স্বার্থের সৃষ্টি হল। এই শ্রেণীস্বার্থ থেকে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিরোধের উৎপত্তি। অপর দিকে ক্ষত্রিয়সমাজ যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হলেও রাজবিদ্যা-ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁরাও অতি সচেতন এবং তার ন্যাসরক্ষক ছিলেন। এঁদের মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। ভক্তি ও প্রেমের দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ— দু'জনেই ক্ষত্রিয়সমাজভুক্ত। সকাম যজ্ঞীয় বিদ্যা এবং নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে কিছু বিরোধ থাকাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর অন্তরালে একটা সুপ্রাচীন বিরোধ ও সংঘর্ষের আভাস পেয়েছেন। তাঁর মতে, "গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজ-বিপ্লব।" এই আদর্শের নিরিখে তিনি গোটা রামায়ণের পশ্চাদ্‌পটে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে নতুনরূপে প্রতিফলিত করলেন।*

* কবি নবীনচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' কাব্যে (রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এই ধরনের সমাজবিপ্লব ও শ্রেণীসংঘর্ষের পরিকল্পনা করেছিলেন।

মহাভারত প্রসঙ্গেও তিনি বিরোধ ও মিলনের ইঙ্গিত পেলেন : "মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্যে দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।" কিন্তু যখন বিরোধটাই বড়ো হল, ব্রাহ্মণ্যশক্তি সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করল, শ্রেণীবন্ধন প্রকৃতই বন্ধন হয়ে উঠল, তখন ধ্বংসের দেবতা দুইরূপে অবতরণ করলেন— মহাবীর ও বুদ্ধদেব। এঁরা দীর্ঘকালসঞ্চিত গলিত স্তূপকে ভস্মসাৎ করলেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও আর্য-অনার্যের ভেদবিভেদকে একেবারে ভেঙে দিলেন। ফলে বৈষম্যবোধ দূর হল বটে, কিন্তু পূর্বতন ঐক্যবোধও ভেঙে পড়ল। এই একাকারের যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি চমকপ্রদ :

"বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল— যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।"

তারপর শক হূন প্রভৃতি বহির্ভারতীয় আর্যেতর সম্প্রদায় ভারতে এল। আগন্তুকদের জীবন ও সাধনাকে মিলিয়ে নেবার শক্তি তখন আর্য-সমাজের খর্ব হয়েছে। তারপর "বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল।" ফলে একাকার হল, কিন্তু ভারতের ঐক্যের আদর্শটি বিপন্ন হল। পরে অবশ্য পৌরাণিক যুগে পুরাণের সাহায্যে এবং স্মৃতি-সংহিতার বেড়া দিয়ে কিছুকাল সঙ্কটকে স্থগিত রাখা হয়েছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-অধ্যুষিত এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দু-সমাজের সেই ঐক্য বিধানের শক্তি বিদায় নিল। যদিও ব্রাহ্মণসমাজ নতুন হিন্দুসমাজকে নানা বন্ধনের দ্বারা বিশ্লিষ্টতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শৃঙ্খলা শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলে পরিণত হল। কারণ, "বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায়···বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা।" সে সাধনা শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হতে বসেছিল। তারপর অন্ধকার নামল :

"সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে ; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন মন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে, এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর রচিত

কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাপ আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী ?"

অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে প্রচণ্ড জীবনের বন্যাবেগ ছিল, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবাণী সত্ত্বেও এই ধরনের নির্মমতা, মৎসরতা এবং বিবিধ পাশব বলের উল্লাস ভারতীয় জীবনে ও ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন ভারত ধর্মের সাধনা করেছিল— যা পদে পদে ক্ষমার দ্বারা সংযত। কিন্তু মুসলমান যুগের ইতিহাস অধিকাংশ সময়ে ভ্রূক্ষেপহীন বীর্য ও মনুষ্যত্বহীন দম্ভের ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, "হিন্দু-সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব জাতিহিতৈষার অভাব"— এর ফলে ভারতীয় ঐক্য বার বার খণ্ডিত হয়েছে। তাঁর মতে হিন্দুর বর্ণবিভেদ থেকেই জাতিগত অনৈক্য, সংগ্রাম-সংঘর্ষে দলবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগের প্রতি উদাসীনতা, জাতির সামগ্রিক স্বার্থ সম্বন্ধে সংমোহ প্রভৃতি তামসিকতার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে দলগত বা জাতিগত প্রচণ্ডতা— যা খানিকটা পশু-ধর্মের ধার ঘেঁষে যায়, আমাদের গেরুয়া মাটির গুণে এদেশে তার কিছু অভাব আছে। আমাদের ইতিহাসের ঐক্য পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়েছে পরদেশী অবিবেকী পাশব বলের কাছে। আমরা শাস্ত্র দিয়ে প্রাচীর গড়েছি, কিন্তু শস্ত্র দিয়ে উপদ্রব-কারীর ব্যূহ ভেদ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যম দেখাতে পারি নি। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মুসলমান শাসন সম্পর্কে একটি গূঢ় মন্তব্য করেছেন :

"কিন্তু শাস্ত্র যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে দানবটা আছে সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সঙ্গত।"

এই সঙ্গত কাজটাকে ভারতের ইতিহাস একটু অবহেলা করেছে ; ফলে এ জাতির ধ্যানধর্ম বার বার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, বিদেশী শাসনের জগদ্দল শিলা

আত্মাকে মূর্ছিত করেছে, মহৎ আত্মদান হয়েছে নির্বীর্য আত্মহননের সামিল।

ইতিহাসের ক্রান্তিরেখার পরেও ইতিহাস আছে। ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের গতিপথ এবং ভারতভাগ্যবিধাতার অঙ্গুলিসঙ্কেত প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন— মধ্যযুগের মধ্যযাম উত্তীর্ণ হয়েছে, ভারত-ইতিহাস এবার নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা করতে উৎসুক। সে পথ নতুনও বটে, পুরাতনও বটে। "আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি, ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।" ১৯১২ সালের বৈশাখ মাসের রুদ্ররৌদ্রাকীর্ণ পট-ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের ভারতবর্ষকে নতুন আলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আজ অর্ধ শতাব্দীরও পরে ভারতের বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে সেই মানবাত্মাকে, সেই 'আপনার সত্যকে' আমরা কি প্রত্যক্ষ করতে পারছি? আজকের ইতিহাস অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা এবং ক্ষুদ্র গণ্ডীচেতনার বিষে মুমূর্ষু। আধুনিক ভারত-ইতিহাসের ক্ষীণায়ু বুদ্‌বুদ্‌গুলি মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে পারঘাটের দিকে চেয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ভারত-ইতিহাসকে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুরপন্থায় জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, আজ সে ইতিহাসকে শুধু পুঁথিতেই পাওয়া যাবে, জীবনে নয়। (১৩৬৯)

# রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা-প্রসঙ্গ

১০

মানুষের ব্যক্তিত্ব হল কমলহীরের মতো। কমলহীরেতে আলোকসম্পাত হলে যেমন বিচিত্র বর্ণবিভা বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি বিশেষ ব্যক্তির চিত্তভাবনা আদর্শ ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতি সত্তার চারদিকে প্রজ্ঞার আলোককণিকা বিকীর্ণ করে। সে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা ভগিনী নিবেদিতার কথা স্মরণ করি। এই বিদেশিনী কী ভাবে নিজের কুলগত সংস্কারকে জীর্ণ নির্মোকের মতো পরিত্যাগ করে, জন্মান্তরীণ পুণ্যফলের মতো একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি, বিপরীত জীবনতত্ত্বকে নিজে শিরোধার্য করলেন, সম্মুখচারিণী হয়ে পিছনের সেতুটি পর্যন্ত নিজের হাতে বিনাশ করে এলেন, সে কাহিনী মহাকাব্যের মতো বিশাল, গীতিকবিতার মতো মধুর, উপন্যাসের মতো অভিজ্ঞতাময়, নাটকের মতো ঘটনার চমৎকারিত্বে বিচিত্র।

নিবেদিতার প্রতিভা সহস্রমুখী, চরিত্র গহনগভীর, প্রত্যয় নিশিত তরবারি, কর্মে তিনি অনলস, চিন্তায় তিনি প্রাচীন-নবীনের সমন্বয়, নিষ্ঠায় তিনি বাকভূণী,— ত্যাগ ও তিতিক্ষায়, ধৈর্য ও বীর্যে তাঁর মতো নারীচরিত্র গত দু'চার শতকের বিশ্বের ইতিহাসে চোখে পড়ে না। বিদেশিনী এই নারী জাতিস্মর হয়েই যেন স্বামীজীর ছায়াতলে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের দীপ্ত দীপশালাকা তাঁর অন্তরপ্রদীপটিকে অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জন্মের পূর্বেই তাঁর জননী তাঁকে দেবতার চরণে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল্ নিজেকে ভারতের চরণে নিবেদন করে দিয়ে নবজন্ম লাভ করলেন। পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব।

নিবেদিতার প্রতিভা ও চরিত্র বিচিত্র বলে সমসাময়িক অনেকে তাঁকে নানাভাবে দর্শন করেছেন। কেউ ছিলেন তাঁর বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, কেউ গুরুজনের মতো শ্রদ্ধার্হ, কেউ বালকের মতো স্নেহের পাত্র— ভর্ৎসনার পাত্রও বটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেরই নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রত্যেককেই তিনি ভারতপ্রেমের

দীপ্তি ও দাহ দান করেছিলেন। ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্য ও ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধা করে, জীবনের কেন্দ্রস্থলে হিন্দুধর্মকে স্থাপন করে ভারতকে পুনরায় প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম, তিল তিল করে জীবনের সব কিছু সমর্পণের কাহিনী আজকের দেশবাসীর কাছে অপরিচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "নিবেদিতা" শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধে এই মহীয়সী মহিলার জীবন ও সাধনার স্বরূপ নানা দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে এই প্রবন্ধটি তাঁর 'পরিচয়ে' সঙ্কলিত হয়েছিল। এর দু'মাস পূর্বে আশ্বিন মাসে দার্জিলিঙের শীতার্ত প্রভাতে মর্ত্যতনু ত্যাগ করে নিবেদিতার অমৃত-আত্মা দিব্যধামে যাত্রা করে। রবীন্দ্রনাথ এ সংবাদে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা এই প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যাবে। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর— এঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের ভক্তিপুষ্পগুলিকে শিল্পচন্দনের রসে গন্ধবাসিত করে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতি ও সংস্কৃতিগতভাবে কতটা মুগ্ধ করেছিলেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে দিয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নিবেদিতার চরিত্র সে যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কতটা প্রভাবিত ও চমৎকৃত করেছিল, তাঁদের উক্তি থেকেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

নিবেদিতার সম্বন্ধে সকলের কাছে বলতেন, "নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। ·····নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।"[১] বাস্তবিক নিবেদিতা দীনদরিদ্র ভারতবাসীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেই এসেছিলেন, দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ধ্বজদণ্ড শিরে বহন করে তিনি ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব জাগাতে চেয়েছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না। দেশ উপযুক্ত হলে তাঁর কদর বুঝবে।" শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতাকে অনুপমা করে তুলেছেন কয়েকটি রূপব্যঞ্জনার বর্ণসম্পাতে। নিবেদিতার তাপসী মূর্তিকে অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে চিত্রিত করেছেন: "গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগ্‌রা, গলায় ছোট্ট

ছোট্ট রুদ্রাক্ষের মালা ; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।" "চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া" মূর্তিমতী মহাশ্বেতার সঙ্গেই যিনি তুলনীয়া, "তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত। ···নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল, কি করে বোঝাই যে কেমন চেহারা, দুটি যে দেখিনি আর, উপমা দেব কি ?" এই নিরুপম সৌন্দর্য, যিনি "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ", তাঁর সেই অপার্থিব লাবণ্য ও অনমনীয় বীর্য ভারতীয় মনীষীদের যে কত দিক থেকে আকৃষ্ট করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে সমসাময়িক ইতিহাসের মধ্যে। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হত না, তাঁরাও তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। বিপিনচন্দ্র নিবেদিতার হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও আসক্তিকে তেমন পছন্দ করতেন না। ফলে দু'জনের বাক্যালাপে প্রায়শই স্ফুলিঙ্গের বর্ষণ হত। কিন্তু দু'জনের মত ও আদর্শ ভিন্ন হলেও বিপিনচন্দ্র এই মহীয়সী রমণীকে শ্রদ্ধাদানে কৃপণতা করেন নি। তিনি বলেছেন, "নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালোবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালোবাসিতে পরিয়াছে কি না সন্দেহ।" দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *History of Bengali Language and Literature*-এর পাণ্ডুলিপি নিবেদিতাকে দিয়ে দেখিয়ে এবং সংশোধন করিয়ে নিতে প্রায়ই বোসপাড়া লেনের বাসায় আসতেন। নিবেদিতা প্রতিদিন সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর কর্মৈষণার মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত বিগ্রহকে দেখতে পেয়েছিলেন , তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী—কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম-কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম— তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।" বিনয় সরকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক ভাষায় বলেছিলেন, "নিবেদিতা তুখোড় মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে।" সে যুগের অগ্নিহোত্রী বিপ্লবী ও সন্ত্রাস-

বাদীদের সকলেই তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, তারকনাথ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরা তাঁর কাছ থেকেই বিপ্লবীজীবনের দীক্ষালাভ করেছিলেন। এমন কি, তৎকালীন গুপ্ত আন্দোলন ও রক্তক্ষরা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, 'এমন কথাও বিপ্লবের ইতিহাসকারেরা মনে করেন। আবার অপর দিকে শিল্পী নন্দলাল বলেছেন, ভারতশিল্পের যথার্থ মূল্যাবধারণা সম্বন্ধে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন নিবেদিতা। নিবেদিতার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সে যুগের ভারতের জ্ঞানী, কর্মী, দেশসেবক, সমাজসেবী, বিপ্লবী, শিল্পীকে নব নব জীবনপ্রত্যয় দিয়েছিল। কমলহীরে থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-কণিকা কত দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা কে বলতে পারে।

২.

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিবেদিতার স্বরূপ আলোচনা করব। তাঁর 'নিবেদিতা' প্রবন্ধটি নিবেদিতার দেহত্যাগের অল্প পরেই রচিত হয়েছিল। নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঠাকুরবাড়ীতে নিবেদিতার যাতায়াতও ছিল। একদা রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে নিজ সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষাসম্পর্কে আলাপাদি হয়। কবিগুরু এই প্রসঙ্গে তারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিবেদিতার চারিত্র-পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েছেন। যখন তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন নিবেদিতার সদ্য তিরোধানে তাঁর মন শোকাচ্ছন্ন। তবু তিনি শোকের মেঘাপসারণ করে নিবেদিতার উর্জস্বল স্বরূপকে দিব্যবিভায় তুলে ধরেছেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় মিতবাক। "রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চর্যভাবে উদাসীন। একের সমসাময়িক রচনার মধ্যে অন্যের উল্লেখ নাই।......বিবেকানন্দের ধর্মবিজয় সমসাময়িক ভারতের চিত্তকে এমন আশ্চর্যভাবে মথিত করিয়াছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনায় কোথাও তাহার পরিচয় পাই না" ( প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী', ২য় খণ্ড )। অবশ্য বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন তা নয়। স্বামীজীর তিরোধানের ছ'বৎসর পরে তিনি একটি প্রবন্ধে ( 'পূর্ব ও পশ্চিম'— ১৩১৫ সনের ভাদ্র মাসের

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ) বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন :

"অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[২] ( 'সমাজ' )

এখানে পরিমিত ভাষায় তিনি বিবেকানন্দের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু তা হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিবেকানন্দের জীবনসাধনা, বিশেষতঃ ধর্মবিশ্বাস ও কৃত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না, যদিও স্বামীজীর নরসেবাব্রত, শিক্ষা-প্রচার, সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা ও আধুনিক মনোভাব সঞ্চারের প্রয়াসকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বলে মনে হয়। নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার বিশেষ কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি তাই স্বামীজীর শিষ্য নিবেদিতাকে সাধারণ খ্রীস্টান মিসনারি মহিলাদের ভগিনীস্থানীয় মনে করেছিলেন :

"আমি ভাবিয়াছিলাম, সাধারণতঃ ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন, ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।" ( 'ভগিনী নিবেদিতা' )

অর্থাৎ নিবেদিতার ধর্মবিশ্বাস অনেকটা খ্রীস্টান মিসনারিদেব মতো সঙ্কীর্ণ, পরমত-অসহিষ্ণু, অযৌক্তিক এবং রক্ষণশীল। তবে তিনি খ্রীস্টানী আদর্শ গ্রহণ করেন নি, বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুর স্মার্ত, আচারী ধর্মাদর্শ ও সনাতনী ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের মন নিবেদিতার প্রতি পুরোপুরি প্রসন্ন হতে পারে নি। ভেবেছিলেন তৎকালীন হিন্দুসম্প্রদায়ের হাস্যকর 'আর্যামি'র মতো এঁর ধর্মাদর্শও একপ্রকার উগ্র অহং-বোধের নামান্তর। তাই তাঁকে শুধু তাঁর সন্তানদের শিক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করে তাঁর কাছে সেই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সামান্য আলাপেই

তিনি ভগিনীর মধ্যে অসামান্য নারীকে প্রত্যক্ষ করলেন, যাঁকে সাধারণ ধর্ম-প্রচারিকার পংক্তিতে স্থাপন করতে তিনি স্বতই কুণ্ঠা বোধ করছেন। নিবেদিতা বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী হয়ে এদেশে আসেন নি, তিনি "বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে" আত্মনিবেদন করেছিলেন, "সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে ; শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন।" বস্তুতঃ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও সমগ্র জাতির জীবনে শিক্ষা জাগিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখছিলেন। এই অংশে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মানসিক ঐক্য স্থাপিত হল। নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে বললেন, "বাহির হইতে কোনো একটি শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী ? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি।" এ আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরও মনোগত আদর্শ, যা তিনি উত্তরকালে শান্তিনিকেতনে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তবে এই যে 'জাতিগত নৈপুণ্য' ও 'ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা'— শিক্ষার এ আদর্শ মূলতঃ বিবেকানন্দেরই শিক্ষাদর্শ। নিবেদিতা গুরুর কাছ থেকে, শিক্ষার মূল আদর্শ যে "জাতিগত নৈপুণ্যের" পটভূমিকায় ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ্য স্ফুরণ, তাই লাভ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের প্রয়োগগত কিছু পার্থক্য আছে। নিবেদিতা মূলতঃ ভারতীয় হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে, মেয়েদের পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে হিন্দুর নানা ধরনের ঘরোয়া সংস্কারের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। তাঁর স্কুলে খুব ঘটা করে সরস্বতী পুজো হত, তিনি তাতে বালিকার মতো উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে যোগদান করতেন, স্থানীয় মেয়েদের কথকতা ও চণ্ডীপাঠের আসরে আহ্বান করতেন, মুখে মুখে তাদের পৌরাণিক গল্প শোনাতেন, গীতাপাঠের আসরে তিনি সাগ্রহে যোগ দিতেন, মেয়েদেরও যোগ দিতে বলতেন। তাঁর বিদ্যায়তনে কুমারী, সধবা, বিধবা— সবরকম ছাত্রীই ছিল। লোকে বলত 'সিস্টার নিবেদিতার স্কুল'। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বোসপাড়া লেনের স্কুলটি রামকৃষ্ণ গার্লস্ স্কুল নামে অভিহিত হবে। য়ুরোপীয়েরা বলতেন 'বিবেকানন্দ স্কুল'। কিন্তু নিবেদিতার লোকান্তরের পর এই স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিসনের অন্তর্ভুক্ত হলে এর নাম রাখা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিসন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল'।

নিবেদিতা কন্যা, মাতা, বধূদের জীবনে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে, প্রাচীন ও

নবীন ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে যে শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন, তার প্রয়োগবিধি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না ; কিন্তু নিবেদিতা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে ভারতীয় নারীর স্বাভাবিক শিক্ষাসংস্কারকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাদের মনের প্রবণতা অনুসারে শিক্ষাবিধিকে কেটেছেঁটে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুরূহ সাধু প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

নিবেদিতা "একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।" রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই আশ্চর্য, অপরিমেয়, নিত্যশুদ্ধ আত্মনিবেদনকে ভক্তের দৃষ্টিতে আরতি করেছেন। ১৮৯৯ সালে ২৫শে মার্চ নিবেদিতাকে দিয়ে স্বামীজী শিব-পুজো করিয়ে নিলেন, তারপর তাঁকে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা দিলেন, তাঁকে ভগবানের চরণে নিবেদন করে দিয়ে কুমারী মার্গারেট নোবলের নতুন নামকরণ করলেন— নিবেদিতা। এই দিন নিবেদিতার নব জন্মলাভ হল। সেই পবিত্র প্রভাতের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছেন, "সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত।" সেইদিন থেকে তিনি শুধু ঈশ্বরের কাছে নয়, সমগ্র ভারতের কাছে নিবেদিত হলেন। তার জন্য তাঁকে ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসিনীর মতো সুকঠোর ব্রতকৃত্য পালন করতে হয়েছে। কিন্তু আসলে তিনি সমস্ত ভারতের কল্যাণ, মুক্তি, উৎকর্ষ ও গৌরবকে জাতির জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনায় সমস্ত জীবন সমর্পণ করেছিলেন। অভ্যস্ত জীবন ও স্বদেশীয় আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে দরিদ্র ভারতের সেবায় তাঁর সুমহৎ আত্মনিয়োগ-কেই নিবেদন বলে। কলকাতায় প্লেগের সময়ে তাঁর বরাভয়প্রদায়িনী মূর্তি জঘন্য বস্তির নীরন্ধ্র অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলেছিল। এ দেশকে কতটা ভালোবাসা যায়, নিজেকে কতটা নিঃশেষে ও নিষ্কামভাবে দান করা যায়, তিনি যেন তারই পরীক্ষা করেছেন। এই আত্মনিবেদন, যাকে প্রকৃত আত্মবিসর্জন বলা যায়, তার মহত্তম কল্যাণের দিকটি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে তিনি কলকণ্ঠে বলেছেন :

> "প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার মনে

ছিল, যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছুই না— ভয় নয়, সঙ্কোচ নয়, আরাম নয়, বিশ্রাম নয়।" ('পরিচয়')

এই যে আরামবিরামহীন অনলস কর্মসাধনা, যাকে আমরা 'ফলিত নিষ্কাম-তত্ত্ব' নাম দিতে পারি তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের জনসাধারণ। এদের সেবা করা, যত্ন করা, চক্ষুষ্মান করা, এই ছিল নিবেদিতার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শুধু যদি অধ্যাত্মমুখী ও ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা তাঁর উদ্দেশ্য হত, তা হলে তিনি সেভিয়ার দম্পতির মতো শৈলসানু আশ্রয় করে মুক্তিসাধনায় কালক্ষেপ করতেন।[৩] কিন্তু সে পন্থা পরিত্যাগ করে তিনি ভারতের মূক জনসাধারণকে যেন সন্তানের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সন্তানের মতোই আদর করতেন। রবীন্দ্রনাথ 'লোকমাতা' নিবেদিতার এই অপূর্ব মমত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন :

> "কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল'-কে, এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত, তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের ওপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।" ('পরিচয়')

অথচ এই 'আওয়ার পীপ্‌ল' বলে তিনি যাদের বুকে টেনে নিতেন, তাদের কাছ থেকেই প্রতিকূল ও অসম্মানজনক ব্যবহার পেতেন বেশী। তিনি দীক্ষা নিয়ে ব্রতচারিণী হয়েছিলেন, নিত্যশুদ্ধ জীবন-যাপন করে গেছেন, হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ও আচারানুষ্ঠানের কৃত্য প্রকৃত হিন্দুর চেয়েও নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। কিন্তু খ্রীস্টান জনক-জননী থেকে মর্ত্যদেহ পেয়েছিলেন বলে হিন্দুর সমাজ ও দেব-মন্দিরের দ্বার অনেক সময় তাঁর মুখের ওপরেই রুদ্ধ হয়ে যেত। তাঁর স্কুলের কোনো কোনো ছাত্রী তাঁর স্পৃষ্ট জল পানে সঙ্কুচিত হত, গৃহের দাসীও কর্মাবসানে স্নান করে শুদ্ধ হত। বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মহাশয় ব্যক্তিও নিবেদিতার দেওয়া মিষ্টান্ন সেবনে ও জলপানে অতিশয় বিব্রত বোধ করতেন। আমাদের এই সমস্ত ছোটখাট আচার-বিচারের গণ্ডীর সীমা

নিবেদিতাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করত, কিন্তু তিনি হাসিমুখেই সে সব অসম্মান সহ্য করেছিলেন। এ জাতিকে তিনি যথার্থই প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। একি শুধু রোমান্টিক অতীতকে ভালোবাসা? সংস্কৃত-পুঁথিপুরাণে-পড়া কল্পিত ভারত-বর্ষের দিকে কল্পনানয়নে চেয়ে থাকা? এ হল প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ; ধূলামাটি মেখেই তিনি ধূলা থেকে মানুষকে তুলে নিয়েছেন। শুধু মহৎ আইডিয়াকে ভালোবাসলে তিনি কিছুতেই এ জাতির নীচতা ও অসম্পূর্ণতার ত্রুটিকে ভুলতে পারতেন না। মা তো সন্তানের দোষগুণ বিচার করে না, সন্তান যত অকৃতী, যত অবুঝ, যত দুরন্ত, মায়ের স্নেহ যেন তারই প্রতি তত বেশী উৎসারিত হয়। নিবেদিতা নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা আচার-বিচারের গণ্ডী টেনে তাঁকে বিমুখ করেছি, সব সময়ে প্রসন্ন মনে দুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করতে পারি নি।

৩.

নিবেদিতা যে ভারতকে ভালোবাসতেন, সে ভারত প্রতিদিনের ধূলিমলিন ভারতবর্ষ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে যে ভারত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো নিষ্প্রভ হয়ে ছিল। নিবেদিতা সেই ভস্মাবশেষ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বহ্নির দাহিকা শক্তিকে আবার জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ যাঁদের নিয়ে তাঁর কাজ-কারবার, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর মতের মিল ছিল না। যাদের তিনি ভালোবাসতেন, সেবা করতেন, তারা অনেক সময়ে তার যোগ্য ছিল না। অনেকে তাঁকে নানাভাবে প্রতারণাও করেছে। তবু তিনি এই হতভাগ্য জাতিকে "শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো" ভালোবাসতেন কি করে? এই তত্ত্বকথাটি রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে-তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল— তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনীদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ

অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না ; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন, সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।" ('পরিচয়')

সতী-উমা কদাচারী, ভস্মভূষিত, শ্মশানবাসী শিবের মধ্যে ভাবের রস খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই হেমন্তকুমারী নগ্নক্ষপণকের গলে বরমাল্য দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও এ দেশের দীন-দুর্বল জনসাধারণের বাইরের মলিনতা দেখে বিমুখ হন নি, এদের প্রাণপুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষগুলিকে সস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোন প্রতিকূল সমালোচক বা বিদেশী এই ভারতীয় জনসাধারণকে কোন কঠোর কথা বললে, ব্যঙ্গ করলে নিবেদিতা রুদ্রাণীর মূর্তিতে আবির্ভূত হতেন। যে রাজশক্তি এদেশের ওপর চণ্ডনীতি চালাচ্ছিল, সে শক্তি তাঁরই স্বদেশ থেকে উত্থিত হয়েছে ; তাই তাদের প্রতি তাঁর মনে শুধু দুর্নিবার ঘৃণা সঞ্চিত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তিনি সমকালীন বিপ্লবী আন্দোলনকে কতদিক থেকে যে সহায়তা ও প্রভাবিত করেছেন তার কথা সে যুগের বিপ্লবীরা ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করতেন। ভারতবর্ষকে ভালোবাসা তাঁর আত্মার অত্যাজ্য ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তাই সেই ভারতবর্ষের অঙ্গে যারা হস্তক্ষেপ করতে চায়, তারা ইংরেজ শাসকই হোক, বিদেশী খ্রীস্টান মিসনারি হোক, বা নব্য 'রিফর্মড্ হিণ্ডুজ' হোক, তিনি তাদের সামনে করালী মূর্তি ধরে অবতীর্ণ হতেন। এই জন্যই তিনি সর্বাগ্রে ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার এতটা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

ধর্মমতে নিবেদিতা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু, এর সঙ্গে তাঁর মনে ছিল গভীর শাক্তভাব। আদ্যাশক্তি তাঁর হৃদয়ে বল সঞ্চার করেছিলেন। রাষ্ট্রদর্শনে তিনি রক্তাক্ত পথের পথিক। নরমপন্থী মডারেটরা যারা শুধু হোমরুল চাইত, ইংরেজের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের নিরাপদ আশ্রয়তলে বাস করতে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করত, তিনি তাদের ভীরুতাকে বাক্যবাণে ভস্ম করতে চাইতেন। শাসক ও শোষক ইংরেজের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল দুর্নিবার। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে

লেখা তাঁর চিঠিপত্রেই তার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাই সে যুগের বিপ্লবীরা তাঁর চারদিকে বৃত্ত রচনা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বিপ্লবী তাঁর কাছ থেকে আদর্শলাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ ভারতের রাজনৈতিক পটতলে নিবেদিতা বজ্রধারিণী হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই অসহিষ্ণু আইরিশ কন্যা ভারতকন্যকা হলেন বটে, কিন্তু শিরাধমনীর মধ্যে আইরিশ রক্তের তাণ্ডব মিলিয়ে যায় নি। তাঁর রাজনীতিতে আপোষ-রফার স্থান ছিল না। বজ্রবৎ অমোঘ আঘাতে অত্যাচারীর ওপর ভেঙে পড়াই তাঁর রাজনীতি। ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতা ছিল তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর স্কুলের মেয়েদের কাছে প্রাচীনকালের বীর ভারতের কথা বলতে বলতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন, ভাবমুগ্ধচিত্তে বলে উঠতেন "ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে— ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!" এই বলে তিনি নিমীলনয়নে জপমালা নিয়ে জপ করতেন, "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা, মা!"

এক সময়ে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সেই ধরনের একখানি পাতাকার নিদর্শনও দেখিয়েছিলেন— "গাঢ় রক্তবর্ণের জমির উপর সোনালী সুতার বজ্র ও উহার পার্শ্বে লেখা 'বন্দেমাতরম্।" এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড রকমের যোদ্ধভাব ফুটে উঠত। তাঁর চরিত্রের চারিদিকেই কোমলতার সঙ্গে প্রধর্ষী আক্রমণের ভাবও ছিল। ১৯০৫ সালে তিনি ***Aggresive Hinduism*** নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন তাতে তিনি হিন্দু ধর্মের ক্লীবতা দূর করে তাকে বীর্যের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার নিকট-সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রে "প্রবল শক্তি" ও "যোদ্ধৃত্ব" ভাবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন— যাকে তিনি "দুর্দান্ত জোর" ও "বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড স্নেহ" বলেছেন। নিবেদিতার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করলেও এই "বলবান আক্রমণের বাধা" কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একই সঙ্গে "গভীর বাধা" এবং "গভীর ভক্তি" জাগ্রত হয়েছিল। গভীর ভক্তি কেন জেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার ত্যাগপূত বৈরাগিণী মূর্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সবিস্তারে তা বলেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্ততলে নিবেদিতার প্রতি বাধা এল কোন্ রন্ধ্রপথে, তার কারণ আলোচনা করা যেতে

পারে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তরসাস্পদ ঔপনিষদিক ভক্তি ও বৈষ্ণব লীলারসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য এবং বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম-দর্শননীতি তাঁর মনোমতো এবং প্রীতিকর না হওয়াই স্বাভাবিক।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলায় ব্রাহ্ম মতাদর্শ হীনবল হয়ে পড়ে। পূর্বেই তা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায়। যুক্তিবাদ ও স্বদেশ-প্রেমকে আশ্রয় করে, প্রাচীন ঐতিহ্যকে যুগোপযোগী রূপ দান করে নব্য হিন্দুধর্ম শিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্তে অভিনব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একে কেউ কেউ Hindu Revival, Neo-Hindu Renaissance, Re-orientation of nationalism with Hindu bias অথবা Re-orientation of Hinduism with national bias[৪] ইত্যাকার নাম দিয়ে থাকেন। এ সব নামরূপের চটকদারী বৈচিত্র্য বাদ দিলেও একটা ঐতিহাসিক তথ্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এই যুগে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজাদর্শের পটভূমিকায় হিন্দুচেতনার নবজাগৃতি শুরু হয়েছিল। একে 'হিন্দু' নাম দিয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার জন্য বিষণ্ণ এবং লজ্জিত হবার কারণ নেই। কারণ যাঁরা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তাঁরা কেউ-ই অযুক্তিবাদী সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলেন না। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদারতা সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন নিঃসংশয়। কিন্তু তাই বলে অন্য ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায়কে হীন দৃষ্টিতে দেখেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'— এর চেয়ে উদারতার আদর্শ পৃথিবীর আর কোন্ ধর্মে পাওয়া যাবে? আরও একটি কথা, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কয়েকজন য়ুরোপীয় ভারততাত্ত্বিক প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের অনেক সিদ্ধান্ত ও অনুসন্ধান-প্রণালীর গুণগত ও গবেষণাগত মূল্য যাই হোক না কেন, বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-সংহিতাসংক্রান্ত তাঁদের প্রশংসাবাণী ও ভক্তির উচ্ছ্বাস এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত-সমাজকে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করেছিল। ম্যাক্সম্যুলর এদিক থেকে হিন্দু-ভারতের প্রভূত উপকার করেছিলেন।

সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গের আধারে পৌরাণিক সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ নতুন দিকে মোড় ফিরল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা-

নন্দের আদর্শে স্মৃতি-সংহিতা-সাহিত্য-পুরাণের অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে নতুন করে শ্রদ্ধাবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুলল। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে, অর্থাৎ বাংলাভাষী অঞ্চলে এবং ইংরেজীশিক্ষিত-বাঙালিসমাজে প্রসার লাভ করল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ সমগ্র ভারতের নানা স্তরেই নতুন আশার বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করেছিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পুরাতন ঐতিহ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও গ্রহণের ইঙ্গিত প্রভৃতি ব্যাপার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রবীন্দ্রনাথ— যিনি উপনিষদের ভাবরস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্ত ভক্তি এবং বৈষ্ণব লীলারসে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি খুব একটা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন নি। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নব্য হিন্দুধর্মের আত্মপ্রসার, দলগঠন, শিক্ষিত যুবসমাজকে স্বদেশপ্রেমাত্মক হিন্দুচেতনায় দীক্ষাদান— ইত্যাদি ব্যাপার কবিগুরুর ততটা মনঃপূত হয় নি। হিন্দুর এই নবজাগরণকে তিনি বোধ হয় প্রধর্ষী ও আগ্রাসী উগ্রতা বলে মনে করতেন এবং গোরার উদ্ধত উক্তির মধ্যে সেই দিকটার তীব্র দম্ভ ও দুর্বলতাকে ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইরিশ গোরার সঙ্গে আইরিশ মার্গারেট নোব্‌লের কোন দিক দিয়েই মিল ছিল না। গোরার হিন্দুসংস্কারের অনেকটা উচ্ছ্বাস হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিক্ষা ও উপদেশের ফল। তাঁর প্রভাবেই সে উগ্র সনাতনী হয়ে উঠেছে। "দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা" করবার সাধনা তার যতই আন্তরিক হোক, আসলে সে আইডিয়ার সাধনা করেছে, মানুষের নয়। কাজেই দেশভ্রমণের উপলক্ষে যখন তার সঙ্গে নানা-সংস্কারে-জড়িত ও জাড্য-আশ্রিত বৃহৎ পিণ্ডবৎ হিন্দুসমাজের যোগ ঘটল, তখন তার তথাকথিত সুমহৎ হিন্দুত্বের খোলস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল, নন্দের অপমৃত্যু-রূপ একটি ঘটনায় তার বিশ্বাসের গ্রন্থিও শ্লথ হয়ে গেল। তার চিত্তপরিবর্তনের এই হল নঙর্থক দিক। এর অস্ত্যর্থক দিক হল পরেশবাবুর সীমাগণ্ডিহীন উদার মানব-ধর্ম এবং সুচরিতার স্নিগ্ধ-সুকুমার নারীহৃদয়ের স্পর্শ। সুতরাং যে মুহূর্তে গোরা আবিষ্কার করল, সে জন্মসূত্রে ভারতীয় নয়— খ্রীস্টান কেল্টিক সন্তান, সে মুহূর্তেই তার হিন্দুসংস্কারের শেষ বন্ধনটুকুও শিথিল হয়ে গেল। নিজ গোত্র-পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত গোরার হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা মোহ মাত্র; তাই সেই মোহ ভঙ্গ হতে বিলম্ব হয় নি। কিন্তু নিবেদিতার 'যোদ্ধৃত্ব' বা 'জোর-জবরদস্তি'র

মূলে কোন মোহমুগ্ধতা বা অজ্ঞতা ছিল না। ভারতের চিরাগত সংস্কার, তার মনপ্রাণের গূঢ় রহস্য এবং ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীসম্প্রদায় সম্বন্ধে এই বিদেশিনী যেভাবে সচেতন ছিলেন এ যুগের খুব কম ভারতীয়ই তার নাগাল ধরতে পারবেন। বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দেশেই নিবেদিতার সমগ্র সত্তা প্রকৃত ভারতবর্ষকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, এবং অত্যন্ত গভীর ভাবে ভারত-আত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয়েছিল। সে ভারতবর্ষ একাধারে ধ্যানের ভারতবর্ষ, জ্ঞান ও কর্মের ভারতবর্ষ, অতীতের গৌরবময় ভারতবর্ষ, বর্তমানের হৃতশ্রী ভারতবর্ষ,— গভীর পরিচয় না ঘটলে এই হতভাগ্য দেশের অসহায় জনসাধারণের প্রতি তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহমাধুর্য এভাবে ক্ষরিত হতে পারত না। তিনি যে আবেগব্যাকুল কণ্ঠে এই মূক জনতাকে 'Our pople' বলতেন, তা রাজ-নীতিকের বাক্‌চাতুরী নয়; যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে মায়ের মতোই লালন করতে চেয়েছিলেন। এদেশের দোষত্রুটি, অবক্ষয়— সব সত্ত্বেও তিনি এই ভারতভূমিকে ভালোবেসেছিলেন। সে ভালোবাসায় কেউ আঘাত দিলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন, তখন এই বীরাঙ্গনার কণ্ঠ থেকে বজ্র এবং নয়ন থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হত। তাঁর সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ততটা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিবেদিতার প্রবল শক্তি, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দুর্দান্ত জোর", অর্থাৎ "পাশ্চাত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা"— এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য হয় নি।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, তার সঙ্গে দল-গড়া ও মতপ্রচারের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের মতাদর্শের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু মূলেই ছিল বিরোধ। একথা অবশ্য ঠিক, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাস হইতে এত পৃথক যে, কাহারও পক্ষে কাহারও মতের সমর্থন আশা করা যায় না।"[৫] এই জন্যই হিন্দুধর্মের কাছে নিবেদিতার একান্ত আত্মসমর্পণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। নিবেদিতার হিন্দু সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন:

"আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি, তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন, একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দধর্ম ও হিন্দসমাজকে

যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন— তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্তচিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমান কালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে, কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।" ('পরিচয়')

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বর্তমানে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান, বারব্রত পালন করি এবং পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকি, নিবেদিতার হিন্দুধর্ম সে রকমের ছিল না। আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে সমগ্র হিন্দুধর্মের যা-কিছু শ্রেয়, যাকে ভারতধর্ম বলা যায়, নিবেদিতা তারই অনুরাগিণী হয়েছিলেন। তাই তিনি বুদ্ধদেবকে অতিশয় ভক্তি করতেন, মুসলমান জাতির প্রতিও তাঁর সাধারণ আচারী হিন্দুর মতো কোন অপ্রসন্ন মনোভাব ছিল না। হিন্দু-ভারতের যে-গৌরব তার সাহিত্যে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তিনি তাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাকেই সর্বত্র প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের অন্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তার প্রতি চক্ষুষ্মান করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আচারপরায়ণ হিন্দুধর্মের কৃত্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চান নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।" ('পরিচয়')

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মূল তাৎপর্য হল, নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনুরাগিণী হয়েছিলেন বলে আমরা আমাদের হিন্দুয়ানির সঙ্কীর্ণ কোটর থেকে তাঁকে দেখছি এবং "আমরা বলিতেছি, তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই।" হিন্দুধর্মের

প্রতি ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের কোন কক্ষেই স্থান নির্দেশ করা যায় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে,

"তাঁহার ( বিবেকানন্দের ) আদর্শান্বিত হিন্দুসমাজের সাধ্য ছিল না যে, আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গারেট নোবল্‌কে ভগিনী নিবেদিতা আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোনো পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বর্জন না করিয়া কোনো ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল" ( রবীন্দ্র-জীবনী ২য় )।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, নিবেদিতা ব্রহ্মচর্যধর্মে দীক্ষা নিলেও এ বিচিত্র ধর্মের স্মৃতি-সংহিতাশাসিত প্রকোষ্ঠে তাঁর স্থান হওয়া সুকঠিন— সে কথা তাঁর চেয়ে কে বেশী জানত? ছুঁৎমার্গের তীব্রতা এই বৈরাগিণীকে নিজের জীবনে বহুবার বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়েছে। অশিক্ষিত সমাজের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ যখন তার সঙ্গে পানভোজনের ব্যবধান রক্ষা করে চলতেন, তখন তিনি যে মনে মনে কত ব্যথা পেতেন তার সংবাদ আমরা কতটুকুই-বা জানি? তবু তিনি নিষ্ঠাবান আচারী হিন্দুর মতো আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, কখনও কখনও আমিষ আহার ত্যাগ করতেন, দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানে সোৎসাহে যোগ দিতেন— কালীপূজা-সংক্রান্ত তাঁর বক্তৃতা ও পুস্তিকা সুপরিচিত। শুধু হিন্দুর উচ্চতম ধর্মসাধনা ও দর্শনপ্রস্থান নয়, এ ধর্মাদর্শের নানাবিধ কৃত্য কুলসংস্কারকে তিনি অনুসরণ করতেন, পালন করতেন। সুতরাং তাঁকে শুধু ভারতপ্রেমিক ইণ্ডোলজিস্ট রূপে দেখলে তাঁর যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে না। হিন্দুর আচারমার্গ পরিত্যাগ করে তিনি শুধু হিন্দুত্বের নির্যাসটুকু নিয়েছিলেন— তাঁর চরিত্রকথা থেকে তা মনে হয় না। মনেপ্রাণে, আচারে-অনুষ্ঠানে, জ্ঞানে-কর্মে-সাধনায় এই বিদেশিনী হিন্দু হবার জন্য দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন। সে সাধনার উত্তরসাধক ছিলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ।

নিবেদিতা মনুষ্যত্বের গৌরবে আমাদের ধন্য করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর অর্জিত হিন্দু সংস্কারকেও অস্বীকার করা যায় না। সে যাই হোক, এই দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দুস্তর মতপার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মত-

পার্থক্যের আরও একটি কারণ— নিবেদিতার চণ্ড রাজনীতি। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী আদর্শের জলন্ত শিখাস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁর ভারতপ্রেম নিতান্ত অহিংস ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ১৯০১ সালে একবার বাগবাজারে নিবেদিতার বাসায় এসে আলাপাদি করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি এই বিদেশিনীর উচ্ছ্বসিত প্রেমের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু "কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্যের সূত্র ধরা পড়িল না।" এর কারণ বোধ হয়, নিবে-দিতার হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি একনিষ্ঠ আসক্তি এবং রাজনৈতিক মতের উত্তাপ। মডারেট পন্থার মোলায়েম দেশসেবা নিবেদিতার চক্ষুশূল ছিল, ইংরেজের স্তাবকতা তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। নরম পন্থী দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি প্রকাশ্যেই কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন, "দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়ে আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নয়, মর্মপীড়া দেয়…।" তাঁর দেশসেবার মধ্যে যে প্রচণ্ড দাহ ছিল রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সমস্ত কারণে একদিকে তিনি নিবেদিতার প্রতি যেমন যথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তেমনি আবার ভগিনীর চারিত্রিক ঋজুতা ও বিপ্লবী মনোভাবের চণ্ডতাকে ( যেগুলিকে তিনি বোধ হয় বিবেকানন্দের প্রভাব বলে মনে করতেন ) পরিহার করে চলতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, উপন্যাসে, আলোচনায় প্রধর্ষী দেশপ্রেমকে কখনও স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। নিবেদিতা এসব ব্যাপারে আইরিশ-বিপ্লবের আদর্শে অগ্নিকণা ছড়াতে চাইতেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলবার জন্য তিনি আগ্রাসী স্বদেশপ্রেমকে অধিকতর মূল্য দিতেন। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনও রকম মিল ঘটা সম্ভব ছিল না। তবু এ বিরোধ ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরতিশয় ভক্তি করতেন। তিনি সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে বলেছেন, "তাঁর সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"

আদর্শের পার্থক্যসত্ত্বেও লোকমাতা নিবেদিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। মর্ত্যদেহ পরিত্যাগের পূর্বে রোগাতুর নিবেদিতা আবৃত্তি করতেন— "অসত মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং

সময়। আবিরাবির্ম এধি।" এ তো রবীন্দ্রনাথেরই মনের প্রার্থনা। মৃত্যুর পূর্বে নিবেদিতাকে বুদ্ধবাণী ( নিবেদিতারই অনুবাদ ) শোনানো হয়েছিল :

"Let all things that breathe, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path. In the East and in the West, in the North, and in the South, let all beings that are without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path."

সেই চিরন্তন পথ ধরেই নিবেদিতা সাধনা করেছিলেন; নিজের পৈতৃক কুল-সংস্কার ভুলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, এদেশের মাটিতেই তাঁর শেষশয্যা রচিত হয়েছিল, চিতাভস্ম সংগ্রহ করে শোকাচ্ছন্ন অনুরাগীর দল নতমস্তকে শীতার্ত শৈলনিবাসে ফিরে গিয়েছিলেন। তারই অল্প কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রচিত হয়। তাই এতে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতি এমন নিবিড় ভক্তির রসে ভরে উঠেছে। ( ১৩৭৩ )

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কোন কোন তথ্য ও উদ্ধৃতি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'ভগিনী নিবেদিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে,

২. আর এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গর্ব রাষ্ট্রতন্ত্র।" ( 'স্বদেশ,—"সমাজভেদ" ) এখানে এ মন্তব্যের তাৎপর্য রাষ্ট্রতন্ত্রে-উদ্বুদ্ধ ইংরেজ জাতি বিবেকানন্দ ও ধর্মপাল প্রচারিত ধর্মসাধনার প্রতি উদাসীন, কারণ ধর্ম তাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ নয়।

৩. অবশ্য সেভিয়ার দম্পতী বৃদ্ধবয়সে নতুন করে কর্মোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলেও শ্রীমতী সেভিয়ার ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার সঙ্গে পাহাড়ী জাতিদের সেবাকর্মের ভারও নিয়েছিলেন।

৪. রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য।

৫. ঐ, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড

# টলস্টয়ের গদ্যকবিতা

বিশ্ববিশ্রুত কথাসাহিত্যিক ও মনীষী টলস্টয়ের (১৮২৯-১৯১৮) সার্ধ-শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে নানা আলোচনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। তিনি ছিলেন রুশ-জীবনের ভাষ্যকার। জীবনের দুঃখদুর্গতি, সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের এমন বিশাল, গভীর ও নিপুণ বর্ণনা এই শতাব্দীর মধ্যে আর কেহ এমন মহাকাব্যোচিত বিশাল পটভূমিকায় সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গেল, টলস্টয় কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতির চূড়ান্ত শীর্ষ অবলম্বন করিলেও মনে মনে বোধ হয় কবিতা রচনার প্রেরণাও অনুভব করিতেন। একবার ছদ্মনামে একটি গদ্যকবিতাও রচনা করেন। বহু দিন তাহার সন্ধান ছিল না, পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার বিশাল গ্রন্থসঙ্কলনে সেটি মুদ্রিত হইলেও তাহা রুশদেশের বাহিরে বড়ো কাহারো দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সম্প্রতি 'সোভিয়েট লিটারেচার' পত্রিকায় (আগস্ট ১৯৭৮) ভ্যালাণ্টাইন ড্‌মিট্রিয়েভ এই গদ্য কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এবং সেই সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলজনক বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিতভাবেই তাহার আলোচনা করা হইল। গদ্যকবিতাটির নাম 'স্বপ্ন' ('The Dream')। প্রথমে ইহার সরল বঙ্গানুবাদের চেষ্টা করি— অবশ্য ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে।

## স্বপ্ন

### নাটালিয়া ওখোটনিট্‌স্‌কায়া[১]

"আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন দাঁড়িয়ে আছি কম্পমান শুভ্র সৈকতে। সাবাইকে আমি মনের সেই-সব কথা বলছিলাম, যা কোনোদিন আমার মনে পড়েনি। স্বপ্নে আমার ভাবনাগুলি বড়ো আশ্চর্য হয়ে দেখা দিল, তারা অনুপ্রেরণার শব্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। আমি যা বলেছি তাতে চমৎকৃত হলাম, আমার

কণ্ঠস্বর আমাকেই খুশি করল। কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু বুঝতে পারলাম— আমার চারিদিকে জনসমুদ্র। তাদের আমি চিনতাম না জানতাম না, তবু তারাই আমার দোসর। তারা যেন আমার পাশেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল। অনেক দূরে আঁধার সমুদ্র গর্জন করে উঠল, যেন জনতার কোলাহল।

"আমি যখন কথা বলছিলাম, তখন বাতাস এসে আমার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিল সারা অরণ্যভূমির অন্তর্লোকে। বাতাস আমাকে এনে দিল বিশুদ্ধ আনন্দ, জনতাকেও। যখন আমি চুপ করে থাকতাম তখন মনে হত, সমুদ্র যেন নিশ্বাস ফেলছে। সমুদ্র আর অরণ্য যেন জনতার সঙ্গী হয়ে যেত। আমি তো কিছুই দেখতাম না, কিন্তু মনে হত— সবাই যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি অনুভব করতাম, তারা আমাকেই দেখছে। তারা যদি আমার দিকে চেয়ে না থাকত তাহলে বোধহয় আমি দাঁড়াতেই পারতাম না। তখন আমার বড়ো কষ্টের জীবন, কিন্তু তবু তা ছিল আনন্দে ভরপুর। আমি যেমন তাদের নাড়া-দিয়েছিলাম, তারাও তেমনি আমাকে চঞ্চল করে তুলে-ছিল। আমার যে কত শক্তি তা আমি বেশ বুঝতাম, তাদের ওপরও আমার শক্তি ছিল অপরিমেয়।

"কেবল আমার মধ্যে একটি স্বর বলত, 'বড়ো ভয়ঙ্কর'। কিন্তু আমি চলতাম— দ্রুতবেগে চলতাম। যেন দম নিতেও পারতাম না। চাপা ভয় আমার আনন্দকেই বাড়িয়ে দিত। আমি যে সমুদ্রসৈকতে কোনোরকমে বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে চলতাম, সেই তটভূমিই যেন আমাকে কতদূরে তুলে ধরত। আর একটু হলেই সব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কে যেন আমার পিছনে আসছিল। আমি উপলব্ধি করলাম কোনো একজনের অজানা চোখের দৃষ্টি। আমি ফিরে চাইলাম না, কিন্তু না চেয়েও থাকতে পারলাম না— আমাকে চেয়ে থাকতেই হল।

"আমি একটি মেয়েকে দেখলাম। লজ্জা— লজ্জা এসে আমাকে ঢেকে দিল, আমি থমকে দাঁড়ালাম। জনতার সরে যাওয়ার সময় ছিল না, তাদের ওপর দিয়ে বাতাসের কান্না গুমরিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা পথ দিল না, মেয়েটি শান্তভাবে জনতার মধ্য দিয়ে চলে গেল, কিন্তু জনতার সঙ্গে মিশে গেল না। আমার বড়ো লজ্জা করছিল। আমি ভারসাম্য বজায় রেখে

চলবার চেষ্টা করলাম, কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না, আমি নিজেকে ঠকাতে পারলাম না। মেয়েটি কে তা জানি না, কিন্তু তার সব কিছুই সুন্দর। কোনো একটা দুর্দমনীয় শক্তি বড়ো আনন্দের মধ্য দিয়ে, বেদনার মধ্যে আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করল। এক লহমার জন্য সে আমার দিকে চেয়ে দেখল, তারপর উদাসিনীর মতো চলে গেল। আমি অস্পষ্টভাবে তার মুখের রেখা দেখতে পেলাম। সে চলে গেল, কিন্তু তার স্থির দৃষ্টি আমার সঙ্গেই রয়ে গেল। তার চোখে ছিল কেমন একটা নরম বিদ্রূপ, আর তার সঙ্গে অনুভবযোগ্য করুণা। আমি কী বলছিলাম সে কিছুই বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারে নি বলে কষ্টও পায় নি, বোধ হয় আমার জন্য কিছু বেদনা বোধ করেছিল।

"সে আমাদের তীব্র আনন্দ দেখল এবং আমাদের প্রতি কিছু করুণা বোধ করল। সে নারী ছিল সুখময়ী। কাউকেই সে চায় নি, এবং সেই জন্যই বুঝেছিলাম, তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। কম্পমান অন্ধকার আমার কাছ থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখল। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সব লজ্জা ছেড়ে দিয়ে সেই সুখের জন্য কেঁদে উঠলাম যা অনিবার্যভাবে চলে যায়। কোনো ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনা নেই বলেই আমার কান্নার অশ্রু-বিন্দুগুলি বর্তমানের সুখকেই আঁকড়ে ধরে রইল, চোখে জল এল লোকের সুখের কথা ভেবে।"

১৮৬৩ সালের কথা। তখন টলস্টয়ের *Childhood*, *Boyhood*, *Youth*, *Sevastopol Sketches* প্রভৃতি বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তিনি শুধু রুশ দেশে নহে, য়ুরোপেও সুখ্যাত লেখকরূপে পরিচিত হইয়াছেন। সে সময়ে তিনি পলিয়ানিয়ায় কৃষকসমাজের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। আরও বিবিধ রচনায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াও বোধহয় তখনো তিনি নিজের শিল্পজীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে ততটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বাস্তব জীবনের পরিচিত চিত্রই ছিল তাঁহার রচনার মূল অবলম্বন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার লেখনী হইতে এমন একটি রচনা নিঃসৃত হইল যাহা গল্প নহে, উপন্যাস নহে, স্মৃতিকথাও নহে—একটি বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা, উপরে যাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তিনি এই চমৎকার গদ্যকবিতাটি স্বনামে প্রকাশে সাহসী হইলেন না। তাঁহার রোজনামচায় তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৭ সালের

সমাপ্তির দিনে উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি এই কবিতা ( 'The Dream' ) রচনা করেন। ইহার স্বাদগন্ধ হইতে ইহার জাতিকুল নির্ণয় দুরূহ, কিন্তু ইহাকে গদ্যকবিতা বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। রহস্যময় ইহার ব্যঞ্জনা, সুদূরের ইঙ্গিত ইহার চিত্রকল্পে। ভ্যালেন্টাইন ড্‌মিট্রিয়েভও ইহাকে গদ্যকবিতা বলিয়াছেন। অবশ্য আমাদের বঙ্গানুবাদে ইহার কাব্যত্ব কিছুই রক্ষা পায় নাই। কারণ ইহা রুশ রচনার ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ, সুতরাং 'সাত নকলে আসল খাস্তা'।

১৮৫৮ সালে টলস্টয় আর-একজন রুশ লেখক এবং তাঁহার বন্ধু ভ্যাসিলি বোটফিন্‌-কে লিখিয়াছিলেন :

"স্ত্রীস্বাধীনতা-সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে রাশিয়ার সমাজে অত্যন্ত হৈ-চৈ চলেছে। আলোচনা, তর্কবিতর্ক, মতামতের কচকচিতে আমি জেরবার হয়ে পড়েছি। সেইটা প্রমাণ করবার জন্য আমি তোমার কাছে আমার এই নতুন লেখাটি পাঠাচ্ছি। এসম্বন্ধে তোমার মতামত শুনতে চাই। অবশ্য এটিকে আমি নিটোল নিখুঁত রচনা বলেই মনে করি, যদিও প্রকাশ করতে সাহস হচ্ছে না। টুর্গেনিভ যদি এখনও তোমার কাছে থাকেন, তাহলে তাঁকেও এটি পড়ে শুনিও। তোমরা বিচার করে দেখো, এটি কোনো কাজের জিনিস হয়েছে কি না।"

রচনাটি সম্বন্ধে বোটফিন ও টুর্গেনিভ কী অভিমত দিয়েছিলেন জানা যাইতেছে না। স্মরণীয় যে, উক্ত কবিতার সঙ্গে রুশদেশের নারী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। সে যাহা হউক, ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৩ সালে সামান্য পরিবর্তন করিয়া, হয়তো একটু সংক্ষেপে তিনি রচনাটি প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বনামে নহে। নিজ নাম গোপন করিয়া ইহাতে দুইটি আদ্যক্ষর ( N. O. ) ব্যবহার করেন। ইহার আড়ালে একটি স্ত্রীলোকের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে— নাটালিয়া ওখোটনিট্‌স্‌কায়া ( Natalia Okhotnitskaya )। এই স্ত্রীলোকটি কে, এবং কেন তাহার নামে টলস্টয় তাঁহার একমাত্র গদ্যকবিতা প্রকাশের চেষ্টা করেন, তাহা লইয়াও আলোচনা হইয়াছে। এই রমণীটি অসহায় আশ্রিতের মতো টলস্টয়ের এক আত্মীয়ার বাড়ীতে বাস করিত। টলস্টয় এই সামান্যা রমণীকে চিনিতেন, কিন্তু রচনায় কেন তাহার নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। একি নিতান্ত খেয়াল, রাজশেখর বসুর 'পরশুরাম' নাম

গ্রহণের মতো ? না, আরও কোনো গভীর কারণ ছিল? বলিতে পারি না। এই রমণীই কি গদ্যকবিতায় রহস্যময়ী নারীরূপে দেখা দিয়াছিল ? উত্তর নাই।

কবিতাটিকে মাজাঘষার পর তিনি *The Day* নামক এক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলেন— উক্ত ওখোটনিট্স্কায়ার ছদ্মনামে। তাহা হইলে কি কবিতাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ ছিল, অথবা বোটকিন ও টুর্গেনিভ এ সম্পর্কে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই ? যাহা হউক টলস্টয় ওখোটনিট্স্কায়ার নামে লিখিয়া কবিতাটি পত্রের সম্পাদককে পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে একখানি চিরকুটও লিখিয়া দিলেন ছদ্মবেশ পাকা করিবার জন্য। সম্পাদককে মেয়েটির জবানিতেই তিনি লিখিলেন :

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমার প্রথম রচনাটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি, অবশ্য যদি আপনার বিচারে গ্রহণযোগ্য হয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন--- টুলা, নাটালিয়া পেট্রোভনা ওখোটনিট্স্কায়া।"

সম্পাদক এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারেন নাই, এটি মহিলার রচনা মনে করিয়া লিখিলেন :

"প্রিয় মাদাম,

আপনার 'স্বপ্ন' নামে রচনাটি আমার কাগজে ছাপানো গেল না। এটি সাধারণ পাঠকের কাছে রহস্যময় দুর্বোধ্য মনে হবে। এর বিষয়বস্তু বড়ো অস্পষ্ট, বোধ হয় একমাত্র আপনার কাছেই এর অর্থ পরিষ্কার। আমার মতে আপনার প্রথম রচনা হিসেবে এটির রচনাভঙ্গি নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছে বিষয়, স্টাইল গৌণ।"

এই উত্তরে টলস্টয় কৌতুক না বেদনা, কী বোধ করিয়াছিলেন ? কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে এই রচনা তিনি আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার তিরোধানের আঠারো বৎসর পরে ১৯২৮ সালে তাঁহার গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়, ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁহার বিশাল গ্রন্থাবলীর ( ৯০ খণ্ডে প্রকাশিত ) সপ্তম খণ্ডে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ড মিট্রিয়েভ বলিয়াছেন যে, বাস্তব জীবনের শিল্পী টলস্টয়[২] বোধ হয় 'The Dream'-এর বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতার জন্য স্বনামে প্রকাশে সাহসী হন নাই, কিন্তু কবিতাটির স্মৃতি তাঁহার মনের

মধ্যে জাগরূক ছিল। *War and Peace*-এর পিয়ের বেজুখোবের স্বপ্নে ইহা ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন। শেকস্‌পীয়রের কৃষ্ণাঙ্গী প্রেয়সীর মতো মাদাম নাটালিয়া পেট্রোভনা ওঁখোটনিটস্‌কায়াও কি রহস্যময়ী রমণীরূপে কোনো নির্জন মুহূর্তে টলস্টয়ের স্বপ্নভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? মনে রাখিতে হইবে, কবিতাটি রচনার সময়ে টলস্টয় তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে পলিয়ানিয়ায় বাস করিতেছিলেন, নানা গঠনমূলক কর্মে আকণ্ঠ ডুবিয়াছিলেন। তখনই এই কবিতার রহস্যময়ী নায়িকা তাঁহার চিত্তলোকে হানা দিয়াছিল।

সঙ্কেতধর্মী এই কবিতায় টুর্গেনিভের গদ্যকবিতাসংগ্রহ *Stikhotvoreniyav Proze* (১৮৮২)-এর এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্য কবিতার স্বাদ পাওয়া যাইবে। অবশ্য তাঁহাদের অনেক পূর্বেই টলস্টয় এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আকারে গদ্যের পরিমিত বন্ধন মানিয়া চলিলেও ইহার অন্তরে আছে কবিতার বেদনামধুর রস। তাই তিনি রহস্যময় গীতিরসের মূর্ছনা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ইহাতে আবেগময়, কল্পনাসমৃদ্ধ, বাস্তবাতিচারী চিত্ররূপ ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে কথাকার টলস্টয় নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ বাস্তব পরিচিত পটভূমিকা ছাড়াইয়া কবির আত্মকেন্দ্রিক গহন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিজের কথা ছাড়াছাড়া ভাবে বলিয়াছেন, নিজেকে লইয়া মনের গভীরে তলাইয়া গিয়াছেন। ইহা তো স্বপ্নানুষঙ্গ, সুতরাং বাস্তব ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে বা যৌক্তিকতার সঙ্গে ইহার যোগ না থাকাই স্বাভাবিক। তবু দেখা যাইতেছে, রচনাটির মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতির বন্ধন আছে। নিঃসঙ্গ লেখক স্মৃতির সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছেন। বাহিরে রহিয়াছে জনতা, যাহাদের সঙ্গে তিনি কখনও আত্মীয়তা খুঁজিয়া পাইতেছেন, কখনো-বা পাইতেছেন না। নিজেও যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তি উপলব্ধি করিতেছেন তাহাও নহে; তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে, কে যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু লেখক তাহার আতপ্ত নিঃশ্বাস উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। ফিরিয়া দেখিলেন, একটি রমণী। তাহাকে তিনি চেনেন না, কথাও বোঝেন না, সেও তাঁহার কথা বোঝে না। উভয়ের মধ্যে অজানা রহস্যের ইঙ্গিত, কিন্তু সে রহস্য-সঙ্কেতের সঙ্গে মানবিক করুণাবোধ মিশিয়া গিয়াছিল। লেখক সে অপরিচিতাকে নিবিড় করিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে

ধরা দিল না, কম্পমান অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। এ যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'সিন্ধুপারে'-র নায়িকার মতো, হয়তো তাহা নিরুদ্দিষ্ট হোলিগ্রেল-সন্ধানে নাইটদের অভিযাত্রার মতো ব্যাপার। অশ্রুব্যাকুল লেখক এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, যাহা অধরা, অপ্রাপণীয়া, বাস্তবাতীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, তাহা বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে ধরা দেয় না। তখন বর্তমানকে লইয়া সুখের সন্ধান ভিন্ন আমাদের আর কী-ই বা করিবার থাকে।

বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কথাকার টলস্টয় ক্ষণিকের জন্য নিজ অন্তর-অন্তঃপুরের যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ একক। সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি একটি নারীমূর্তি রচনা করিলেন। তাহা তাঁহারই মানসী সৃষ্টি— কামনার রঙে-রসে নির্মিত। কিন্তু তাহা তো শরীরী সত্তা নহে, তাহার অস্তিত্ব তন্মাত্রের বাহিরে। ইন্দ্রিয় গোচরতায় তাহাকে আনা যায় না। রোমান্টিক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যুগ যুগ ধরিয়া মনের মানসী খুঁজিয়া চলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনার পটে সৃষ্টি। সুদূরের ব্যঞ্জনাবাহী আদর্শ-লোকের নামরূপহীন সূক্ষ্ম চেতনাকে কবি-শিল্পীরা আকার-আয়তন দিয়াছেন, তাহাকেই আত্মার সঙ্গী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপে আরতি করা যায় না, মানুষের সুখদুঃখ আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন শিল্পীকে জীবনসৈকত খ্যাপার মতো শুধু পরশপাথর খুঁজিয়া চলিতে হয়।

এই গদ্য নিবন্ধটি টলস্টয়ের কবিমনের পরিচয় বহন করিতেছে। সত্যই ইহার কেন্দ্রীয় বিষয় অপূর্ব রহস্যময়। ভাব, ভাষা ও চিত্ররূপের মধ্যেই সেই রহস্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। টলস্টয় কি কোন মানসীর সন্ধান করিতেছিলেন? গদ্যকবিতাটি রচনার সময়ে তিনি তরুণী স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছিলেন, নানা কাজকর্মে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন, কৃষকদের সন্তানের জন্য পাঠশালা খুলিতেছিলেন, স্কুল-মাস্টারদের প্রস্তুতির জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছিলেন। তখন *The Decenberist* উপন্যাস রচনা চলিয়াছে, সাধারণ লোকের জীবন লইয়া গল্প লিখিতেছিলেন ('Tikhon and Malnya' এবং 'Polikhshka')— মোটকথা বাহিরের দিকে তিনি অতিশয় ব্যস্ত। তাহারই মধ্যে কোথায় যে নিঃসঙ্গতার কীট তাঁহার অবসরের ফুলটিকে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সেই নির্জন মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা একটি নারীর রূপ ধরিয়া

আসিল, বোধ হয় অবচেতন মনে তিনি তাহারই সন্ধান করিতেছিলেন।

লেখাটি লইয়া তাঁহাকে দ্বিধায় পড়িতে হইয়াছিল, মনের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। প্রকাশ করিবেন, কি করিবেন না, লেখাটি কিছু একটা হইয়াছে, না নির্জন মুহূর্তের অর্থহীন দিবাস্বপ্নের ধূম্রজালে পরিণত হইয়াছে—বাস্তব জীবনের কথাকার টলস্টয়ের মনে এইরূপ সংশয় জাগিয়াছিল। তাই প্রকাশের জন্য দ্বিধা ও সংশয়। কেননা, ইহা বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত রচনা। ইহার বন্ধন কিছু শিথিল, সঙ্কেতধর্মিতা ইহার মূল বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয় রচনা তাঁহার এই প্রথম এবং এই শেষ। ইহার শিল্পমূল্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল বলিয়াই তিনি এটি কোনো-এক সামান্যা নারীর ছদ্মনামে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয়। অবশ্য রুশ দেশে, অন্যান্য দেশেও একাধিক কবি ও সাহিত্যিক নিজেদের কোনো কোনো রচনা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভোলটেয়র তাঁহার বেশ কয়েকটি রচনায় স্ত্রীলোকের নাম স্বাক্ষর করিতেন। একটি নাম ভোভ ডেনি— তাঁহার ভাইঝি। রমণীয় রমণী ( 'The Beautiful Lady' ), ফতিমা, শাথেরিন ভাদে প্রভৃতি স্ত্রীলোকের নামে নিজের রচনা ছাপাইয়া তিনি কী আনন্দ পাইতেন তাহা তিনিই জানেন। রুশ দেশেও এই কৌশল সাহিত্যিক মহলে বেশ চলিয়াছিল। বেট্স্কি এবং তাঁহার বন্ধু মিলার 'গ্যালাটিয়া' ও 'মোলেডিক' পত্রিকায় নাদেজদা এবং নাটালিয়া ভ্যাগিলকোভিচ এই দুই কল্পিত ভগিনীর নামে রচনা প্রকাশ করিতেন। আইভান ম্যাটলেভ ১৮৪০ সালে মাদাম কুর্ত্যকোভা এই ছদ্মনামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বলাই বাহুল্য এটি স্ত্রীলোকের কল্পিত নাম। ১৮৫৩ সালে গ্রেগরি ডানিলেভ্স্কি 'The Advocacy of Women' নামে একটি কবিতা ছাপিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেব নাম গোপন করিয়া ইভজেনিয়া সারাফানোভা নামে এক স্ত্রীলোকের নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এমন কি *Dictionary of Russian Women Writers* নামে বিশাল গ্রন্থেও এ-সমস্ত লেখা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশেও একালে অনিলা দেবী, নীহারিকা দেবী, অমলা দেবীদের কথা পাঠকের মনে পড়িবে।

টলস্টয়ের এই গদ্যকবিতা মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে এবং প্রকৃত রচনার প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলে তাঁহার

অন্তঃপুরের অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, এই গল্প-কবিতার সূক্ষ্ম রোমান্টিক রস এবং ধূম্রজ্যোতিপূর্ণ রহস্যভারাতুর ব্যঞ্জনা বিশ্বনন্দিত গল্প-কাহিনী-লেখকের আর-এক পরিচয় বহন করিয়া আনিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. এই কবিতা কোনো-এক মহিলার নামে টলস্টয় পত্রিকায় প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই মহিলার নাম ওখোটনিট্স্কায়া।

২. অবশ্য লেনিন টলস্টয়ের উচ্চ প্রশংসা করিলেও এই মহান শিল্পীর মধ্যে স্ববিরোধী ও আত্মসমর্পণমূলক খ্রীস্টান দীনতা দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। লেনিনের ভাষায় এই স্ববিরোধ এইরূপ : “On the one hand, we have the great artist, the genius who has not only drawn incomparable pictures of Russian life but has made first class contributions to world literature, on the other hand, we have the landlord obsessed with Christ…. On the one hand, merciless criticism of capitalist exploitation, exposure of government outrages, the facical courts and the state administration, and unmasking of the profound contradictions between the growth of poverty, degradation and misery among the working masses. On the other hand, the crakpot preaching of submission, ‘resist not evil’ with violence.” ( *Collected Works of Lenin*, Vol. 15

# বলাকা'র একটি কবিতা : বস্তুগত বিশ্লেষণ

১.

'বলাকা' কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতা ("সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা"), যেটি গোটা কাব্যের ধ্রুবপদ, তাহাকে বিশ্লেষণের বকযন্ত্রে ফেলিয়া, রাসায়নিক পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে চোঁয়াইয়া, ঘোরতর রকমের আধুনিক শিকাগো-পন্থী সমালোচনার বিচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে কাটাছেঁড়া করিয়া কবিতাটির মূল কথা ধরিবার চেষ্টা করা যাক। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদিগকে উৎসাহিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহা কবিগুরুর প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন। হৃদ্‌পিণ্ড দেহের ভিতরে থাকে, তাহাকে শবব্যবচ্ছেদের চৌকির উপরে ফেলিয়া কাটাকুটি করিলে জ্ঞানের পরিধি নিশ্চয় বাড়িয়া যায়, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের মালিকটির তাহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি হইতে পারে। সে যাহা হউক, জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা বাড়াইবার জন্য এমন অল্পস্বল্প ত্যাগ করিতেই হয়। এই কার্যের জন্য কবিগুরু সারস্বতলোক হইতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, অথবা পিতামহ ভীষ্মের মতো পাণ্ডবপক্ষ ও ধার্তরাষ্ট্রপক্ষ— উভয়কেই স্নেহহাস্যে সহ্য করিবেন তাহা লইয়া গোলে পড়িয়াছি। তবে বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নব্য সমালোচকের খনিত্রযন্ত্রের খোঁচাখুঁচি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অধুনা পশ্চিম বিশ্বে, বিশেষতঃ মার্কিন মুল্লুকে সাহিত্য-সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের নবপদ্ধতি পুরাতন আমলের আলোচনাকে বেবাক পাশ কাটাইয়া বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে, এদেশেও তাহার অল্পস্বল্প প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই সমস্ত বস্তুগত, নিঃস্পৃহ, বিজ্ঞানধর্মী গজকাঠির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের কোন-একটি কবিতার তাৎপর্য মাপিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। অবশ্য এ-কথা কবুল করিতে বাধা নাই যে, কোন বাঁধাধরা পুঁথিপত্রের নির্দেশ না মানিয়া শুধু ব্যক্তিগত চিন্তার ঘুনিজালে রবীন্দ্র-কাব্যের মহামীনটিকে ধরা যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্যই নিবন্ধকার লেখনী-কণ্ডুয়ন উপলব্ধি করিতেছেন।

২.

দীর্ঘকাল ধরিয়া কাব্যবিচার ও উপভোগের নানা পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। কখনো কাব্যের উপর, কখনো কবির উপর, কখনো-বা পাঠকের উপর গুরুত্ব দিয়া কাব্যকবিতার বিচার চলিতেছে। অ্যারিস্টটল-লংগাইনাস হইতে রিচার্ডস্, ভরত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত— প্রায় হাজার দুই বৎসর ধরিয়া সাহিত্যবোধ-বিচার-বিশ্লেষণ, কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও, একটা মূল ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। সাহিত্য বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাপার। বস্তুজগৎ কবিমনে প্রবেশ করিয়া আর একটি ভাবজগৎ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। সেই ভাবজগৎ-ই শিল্পরূপ লাভ করে। বলাই বাহুল্য কবির প্রকৃতি ও প্রবণতা শিল্পমূর্তি নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। মূলতঃ কবিচিত্তের স্বরূপ সন্ধানই কাব্য-সমালোচনার বাঁধাপথ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবির ভাঁড়ারের খবর সন্ধান একালের সমালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন। নিছক ষোল আনা রসিক বলিবেন, ভাঁড়ারে কী আছে বা না আছে তাহা জানিয়া লাভ নাই, স্বাদু খাদ্য পাতে পড়িলেই হইল। কিন্তু একালের সমালোচকের সতর্ক চক্ষু ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কবিসাহিত্যিকের মনোভূমির তলদেশে সুগোপনে তাঁহার মানসিক কূটৈষণা লুকাইয়া থাকে। বেদে যেমন সাপের হাঁচি চিনিতে পারে, তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকও লেখকের অন্তঃপুরের ঠিক খবরটি বাহির করিতে পারেন।

কবির রচনা একপ্রকার, পাঠকে তাহাকে আরেক প্রকার উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলে। বস্তুতঃ কবির বোধের জগৎ ও পাঠকের উপলব্ধির জগৎ কখনোই হুবহু একপ্রকার নহে। পাঠকে ও রসভোক্তায় কবিসৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে নিজ সৃষ্টি করিয়া লয়। কবির জগৎ পাঠকের মনোজগতে গিয়া আর একপ্রকার রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যক্তিভেদে তাই সাহিত্যবিচারের নানা ভেদ-পার্থক্য দেখা দেয়। একই কবির কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে লাঠালাঠি বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। লিউইস ( C. S. Lewis ) এবং লিভিস ( F. R. Leavis )— দুইজনেই *Paradise Lost*-এর রচনাকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। দুইজনেই পণ্ডিত-রসিক এবং সাহিত্যের শক্তিমান ভাষ্যকার। লিউইস মিল্টনের যে গুণের জন্য *Paradise Lost*-কে প্রশংসা করিয়াছেন, লিভিস কিন্তু সেই গুণকে দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উভয়ের মানসিক গড়নই একই বস্তুকে ল্যাজামুড়া হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়াছে। সাহিত্যবিচার ও ব্যাখ্যায় কাহার বক্তব্য অকাট্য তাহা বলা যায় না। পাঠক নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে সাহিত্যবিচারে অভ্যস্ত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কাব্য-সাহিত্য যেহেতু মানসিক ব্যাপার, এবং যেহেতু প্রত্যেকের মন পৃথক, সেই হেতু কোনো রচনার মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়া থাকে। তাহা ঘটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির মধ্যে কত না বৈচিত্র্য, মানুষের মনও বিচিত্র ধরনের। একমাত্র শাসনদণ্ড উঁচাইয়া, কোতলের ভয় দেখাইয়া সকলকে এক-ভাবে লিখিতে এবং পাঠককে একভাবে মূল্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাইতে পারে। কিন্তু এ-সমস্ত বিধি শেষ পর্যন্ত বিকল্পে পর্যবসিত হয়। ধর্ম-জগতের 'যত মত তত পথ' কথাটা সাহিত্যবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আর একটা শঙ্কার কথা আছে। সাহিত্যবিচারে ব্যক্তিগত মতামতই এক-মাত্র সমালোচনাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে মতামতের কচকচিতে সাধারণ রসবোধ ঘুলাইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত বিচারবোধ সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে কতটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে রিচার্ডস্ ( I. A. Richards ) ১৯২০ সালের দিকে যে কাব্যবিচার পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ-বাইশ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যবোধ লইয়া তিনি কাগজেকলমে একটি অভিনব পরীক্ষা করেন। তাঁহার বিশ্বাস ঐ বয়সেই ছাত্র-ছাত্রীগণ সাহিত্যবোধে ও উপভোগে লায়েক হইয়া উঠে, পরবর্তীকালে সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের আর নূতন করিয়া বিশেষ কিছু আয়ত্ত করিতে হয় না। বুদ্ধি থাকিলে তাহারা পাঁজিপুঁথি ঘাঁটিয়া বস্তা বস্তা তথ্য উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের রসভোগ ঐ বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যেই প্রায় পাকা হইয়া যায়। রিচার্ডস জ্ঞাতনামা অথবা অজ্ঞাতনামা কবিদের রচনার মূল্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা কাগজেকলমে তাহার যে উত্তর দিল তাহা বিভ্রান্তিকর। কোন একটি কবিতা সম্পর্কে কোন পড়ুয়া বলিল—চমৎকার, ভাবভাষার এমন রাজযোটক মিল সে আর কোথাও দেখে নাই। আর একজন পাঠার্থী কাটিয়া কুটিয়া দোষ দেখাইয়া কবিতাটিকে নয়ছয় করিয়া ফেলিল। উভয়েই যুক্তি খাড়া করিতে পিছপাও হইল না। তাহাদের সেই সমস্ত বিচিত্র, বিভিন্ন, পরস্পরবিরোধী মতামত একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া রিচার্ডস্

১৯২৯ সালে *Practical Criticism* গ্রন্থটি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিমতের ব্যঞ্জনা বোধহয় এই : সাহিত্যবিচার শুধু ব্যক্তিগত অর্থাৎ subjective হইলে কবিতার প্রকৃতস্বরূপ কখনোই স্পষ্ট হইতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত অভিরুচিকে আড়াল করিয়া objective method বা বস্তুগত রীতির দ্বারা কবিতার বিশ্লেষণ না হইলে তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা দিতে পারে। সুতরাং কোনো শিল্পবস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করিবার জন্য নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

৩.

রিচার্ডস্ তাঁহার *Interpretation of Teaching*-এ এই সমস্যার নানাদিক উত্থাপন করিয়াছেন। *Sacred Wood*-এ এলিয়ট, *Survey of Modernist Poetry*-তে রবার্ট গ্রীভ্স্ এবং *Seven Types of Ambiguities*-এ উইলিয়ম এম্পসন কাব্য-বিচারের নানা সমস্যা— বস্তুগত, শব্দগত ও শব্দানুসারী অর্থগত দিক হইতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাষাবিজ্ঞানের আত্মজ স্টাইলিসটিক অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত রচনারীতির দিক হইতে এবং explication অর্থাৎ প্রকরণ সংগঠন ও রচনাবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাবিচারের নূতন আয়তন ফুটাইয়া তুলিলেন। ইদানীং এ পদ্ধতি আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ফাউলার সাহেব কয়েকটি বক্তৃতায় এই পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একালে কবিতাকে সনাতন পন্থায় বিশ্লেষণ করা যুগধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করা হইতেছে এবং Textual criticism-পন্থী সমালোচকগণ অর্থাৎ শিকাগো সমালোচকগোষ্ঠী ও নব্য-অ্যারিস্টটলপন্থী— যাঁহারা নব্যসমালোচক বলিয়া পরিচিত, তাঁহার কবিতার পংক্তিবিন্যাস, ছন্দ, বিরামচিহ্ন, ধ্বনিতত্ত্ব, স্বনিম, বাক্যগঠন, উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্ক, উপপত্তি নির্ণয় প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বস্তুগতভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ও হিসাবনিকাশ-সংকুল গাণিতিক সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বারা কবিতার মোদ্দা কথাটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন। স্পিনগ্রান ( Joel E. Spingran ) ১৯১০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় এই পদ্ধতির প্রথম আভাস দিয়াছিলেন। র‍্যানসম ( John Growe Ransom ) ১৯৪১ সালে 'The New Criticism' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে এই রীতি বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করা হয়।

সমসাময়িক কালে রিচার্ডস, এম্পসন, এলিয়ট, উইনটার্স, অ্যালান টেট, ব্ল্যাকমুর, কেনেথ বার্ক প্রভৃতি নব্যপন্থী সমালোচকগণ কবিতার প্রতিটি পংক্তি ভাঙিয়া চুরিয়া, ছিঁড়িয়া ছেঁচিয়া, কাটিয়া কুটিয়া, মাপিয়া জুখিয়া সারস্বত সৃষ্টিকে কেমিস্ট বা ড্রাগস্টোরের শিশিবোতলে-ভরা পৃথক পৃথক ধাতব ও রাসায়নিক বস্তুতে পরিণত করিতে চাহিলেন। উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাব্য বিচারের যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, ইদানীং তাহা ঝাড়েবংশে লোপাট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কবিতার উপাদান, মূল্য যাচাই, রস-বিশ্লেষণ, কল্পনা-আবেগ-চিত্রকল্পের বিচিত্রতা বড়ো বেশী ব্যক্তিভাব-রঞ্জিত বলিয়া এ-সমস্ত উনিশ-শতকী রোমান্টিক ভাববিলাস বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাতিল হইতে বসিয়াছে।

অধুনা প্রচলিত বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য— অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যেক ছত্র বিশ্লেষণ করিতে হইবে, সেই বিশ্লেষণের মধ্যেই কবি-চেতনা ও কবিতার তাৎপর্য নিহিত আছে। কবিতার স্তবক বন্ধনকেও এই রীতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনি, অন্ত্যানুপ্রাস ও ছন্দস্পন্দ, পদ পরিচয়, শব্দ-প্রয়োগ-রীতি, বাক্য গঠন, বাক্যের মধ্যে শব্দ-বিন্যাস ও তাহার দ্বারা ভাবের সংহতি, বাহ্যিক অলঙ্করণ, নানা কলাকৌশল, চিত্রকল্পের বিচিত্রতা— এইভাবে আধাবৈয়াকরণ, আধা-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে কবিতার বস্তুগত স্বরূপ একালের উপযোগী গাণিতিক বা জ্যামিতিক যথাযথতায় ( mathematical accuracy ) সার্থক হইয়া উঠিবে। অবশ্য এই বিশ্লেষণকে আরো ঘোরালো করিতে হইলে আরো বিশুদ্ধ কল্পনাব্যতিরিক্ত, ইমেজিস্ট-গ্রুপ-প্রচারিত নিছক ব্যক্তিভাববিরহিত ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিতে হইলে ইহার সহিত সাংখ্যিক হিসাব ( statistical measurement ), বৈদ্যুতিক মাপজোখ ( electrical device ) এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ ( quantitative analysis )— এই সমস্ত বিচিত্র কর্মকাণ্ড যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে বিজ্ঞানপন্থী সমালোচকগণ এই ভাবিয়া খুশি হইবেন যে, কাব্যবিচার সাম্প্রতিক, বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক হইয়াছে। অবশ্য এই জাতীয় কাব্যকলাতত্ত্বের আলোচনা এখনো পর্যন্ত বুদ্ধির কসরত বলিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, এই পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য হইতে বিলম্ব আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হইতে গেলে আমাদের কাব্যপাঠপ্রবণতা ও রসভোগজনিত নান্দনিক

আনন্দের আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্টি ও নান্দনিক ভোগ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল না হইলে এই রীতি সর্বজনস্বীকার্য হইতে বিলম্ব ঘটিবে। পাণিনি, বোপদেব, কাত্যায়ন, বররুচি, চমস্কির দল যদি সরস্বতীর বীণাযন্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাতে ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের প্রাণঘাতী টঙ্কার দিতে থাকেন তাহা হইলে কাব্যরসপিপাসুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। এখনো পর্যন্ত এ-সব পদ্ধতি উদ্ভট খোশখেয়ালের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে, অন্তত আমাদের দেশে। সে যাহা হোক, এই নূতন পদ্ধতির 'ক্যালিডোস্কোপ' চোখে চড়াইয়া 'বলাকা' কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির ("সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা".) স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, এই পদ্ধতি কাব্যপাঠ-বোধ-ভোগের দিক হইতে কতটা প্রয়োজন।

৪.

আমাদের মতো যাহারা ভাষাতত্ত্ব ও শব্দশাস্ত্রে বুদ্ধিবৈগুণ্য বশতঃ দুর্মেধা তাহারা এই পদ্ধতির কতটা মূল্য বুঝিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। উপরন্তু কাব্য-বিশ্লেষণে ভোক্তার 'আমি'-কে কতটা দূরে সরাইয়া রাখা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এখনো বাকি আছে। যে ধরনের নিরাসক্তি ও নিঃস্পৃহতা বৈজ্ঞানিক বোধের জন্য আশু প্রয়োজন, যাঁহারা এতাবৎকাল ধরিয়া কাব্যরসে বুঁদ হইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁহারা বলিবেন, সাহিত্য বিচার, বিশ্লেষণ ও উপভোগ— সবই আমার মনোমুকুরে প্রতিফলিত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজদার্শনিক কাব্য-সাহিত্যকে তাঁহাদের স্ব স্ব কোটর হইতে অনেকভাবে দেখিতে পারেন বটে, কিন্তু রসিক পাঠকের তাহাতে কী লাভ? বস্তুগত সমালোচনায় বিশ্বাসীরা বলিবেন, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য— এ-সব উনিশ শতকী রোমান্টিক সংস্কার। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার পর যেমন ভূত, ভগবান ও প্রেম কবরস্থ হইয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানালোকিত আধুনিক যুগে কাব্যবিচারপদ্ধতির আবেগ-কলুষিত বাহ্বাস্ফোট নাভিশ্বাস গণনা করিতেছে। যাহা হউক, এই পদ্ধতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

১৯১৬ সালে 'বলাকা' প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ

কিছুদিন কাশ্মীরের শ্রীনগরে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ওখানেই দুইটি কবিতা রচিত হয়। কবিতা দুইটি 'বলাকা'র বর্তমান সংস্করণে ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যা রূপে মুদ্রিত হয়। ৩৫ সংখ্যক কবিতায় ("আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির ছল ছল") কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা ১৬টি ছোটবড়ো পংক্তির সাহায্যে বলা হইয়াছে। ৩৬ সংখ্যক কবিতাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, বলিতে গেলে ইহার নামেই কাব্যেরও নামকরণ। ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে এটি সমগ্র কাব্যেরই সারসংক্ষেপ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ মিলিবে এই কবিতায়।

এই কবিতায় মোট পঁয়ষট্টিটি চরণ আছে। প্রতি দুই চরণ মিত্রাক্ষর, দুই স্থানে তিন পংক্তির মিলও লক্ষ্য করা যায়:

"এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
স্নদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।"

কবিতাটি তানপ্রধান পয়ার জাতীয় ছন্দে বিন্যস্ত। ছোটবড়ো পংক্তিগুলিতে পর্ব সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। মাত্রা গণনা করিলে দেখা যাইবে, পঙক্তিতে ১৮, ১৪, ১০, ৮, ৬ ও ৪ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ারে ৮+৬ এবং ৮+১০ অর্থাৎ ১৪ ও ১৮ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেক ছত্রে শুধু ১০, ৮, ৬ ও ৪ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এগুলি ৮+৬ এবং ৮+১০-এর গুণিতক। পংক্তিগুলির মাপ ছোটবড়ো হইলেও মাত্রা সন্নিবেশে পয়ারের রীতি পুরাপুরি অনুসৃত হইয়াছে। যেখানে ছত্রটি ৮+৬ বা ৮+১০ নয়, সেখানে ইহার খণ্ড ইউনিট অর্থাৎ ৪, ৬, ৮ ১০— এই মাপেও ছত্র বিন্যস্ত হইয়াছে। ছত্রের মাপ ছোটবড়ো হইবার জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসও সেই অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একটানা একঘেয়ে ধ্বনির বদলে ছোটবড়ো মাপের পর্বের আঘাতে ছত্রটি ধ্বনিবৈচিত্র্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বলাকায় ছন্দের মুক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অন্ত্যমিল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে গোটা কবিতায় মাত্র আটটি হলন্ত মিল আছে (তলোয়ার, জোয়ার ; মগজ, বন ; আবেগ, মেঘ ; চঞ্চল, তৃণদল) স্বরান্ত মিলের সংখ্যা সাতান্ন। আকারান্ত—১৪, একারান্ত—২৮, ইঈ —১৫। এই গাণিতিক হিসাব হইতে কবিতার তাৎপর্য সম্বন্ধে কী ধারণা করা যায়? হলন্ত অক্ষর বা closed syllable ('বদ্ধাক্ষর'— বাংলা একাডেমি

প্রকাশিত 'ভাষা ও সাহিত্য পরিভাষা কোষ', ঢাকা ), অর্থাৎ যেখানে ধ্বনি স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে ; যেমন, মগন-বন, আবেগ-মেঘ। কবিতাটির তাৎপর্য নিরুদ্দেশ চলা, অবিরাম গতি। তাই কি বদ্ধ-অক্ষর মিলের সংখ্যা স্বল্পতম ? স্বরান্ত মিল ৫৭টি, স্বরান্ত মিল অর্থাৎ open syllable বা মুক্তাক্ষর— সেখানে পংক্তি বাধা পায় না। ইহার দ্বারা কি ধ্বনিগত গতিবেগ সূচিত হইতেছে ? ই-কারান্ত মিলগুলি সব কটি অসমাপিকা ক্রিয়াদ্যোতক— করি, গুমরি, শিহরি, মেলি, ফেলি, ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়াতেও রহিয়াছে অনিকেত যাত্রার ব্যঞ্জনা। অধিকাংশ এ-কারান্ত মিলে অধিকরণের স্থানিক ও কালিক নির্দেশ লক্ষ্য করা যাইবে। যথা— জলে, তলে, ক্ষণে, গগনে, প্রান্তরে, জলেস্থলে, জানায় ( জানাএ ), অজানায় ( অজানাএ )। অধিকরণ কারকে সমাপ্তি নির্দেশ বা থামার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাইবে। নির্দেশকত্ব অধিকরণ কারকের বৈশিষ্ট্য। যেমন— নিঃশব্দের তলে, শূন্যে জলে স্থলে, ক্ষণে, প্রান্তরে, আকাশে। এই হিসাবে মনে হইবে কবিতাটিতে সূক্ষ্মভাবে contradiction, অর্থাৎ স্বীকৃতির দিক হইতে কিছু বৈপরীত্য আছে। ই-কারান্ত মিলগুলিতে আছে অসমাপ্তি বা চলার বেগ, অপরদিকে এ-কারান্ত মিলগুলিতে বাধা, বন্ধন, বিরাম, থামার ইঙ্গিত আছে— তা স্থানের বন্ধন বা কালের বন্ধন, যাহাই হোক। বলাকার পক্ষধ্বনি কবির অন্তরে বাধাবন্ধহীন গতিবেগের অনির্দেশ্য অনিকেত যাত্রার সূচনা করিতেছে, ইহাই বোধহয় কবিতাটির তাত্ত্বিক তাৎপর্য। কিন্তু ইহার বাক্‌পুঞ্জের আলোচনা, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর-রীতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যুগপৎ গতি ও স্থিতি, বন্ধন ও মুক্তি, চলা ও থামা, ইকার-একার মিলের দ্বারা তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ সর্বশেষ স্তবকটি উল্লেখ করি। এই স্তবকে ১০টি পংক্তি, প্রত্যেক পংক্তিতেই একারান্ত মিল। যথা— দলে দলে, উড়ে চলে ; যুগান্তরে, অন্তরে ; সাথে, দিনেরাত্রে ; অন্ধকারে, পারে ; গানে, কোন্‌খানে। এই স্তবকে দেখা যাইতেছে, কবি অবিরাম যাত্রার শেষে 'অন্য কোনোখানে, অন্য কোথা'র সন্ধান পাইয়াছেন। 'হেথা নয়'— সেকথা ঠিক, কিন্তু নেতিবাচক শূন্যত্বে তিনি থামিতে পারিলেন না, 'কোনোখানে'র অস্তিত্ব তাঁহাকে ধাবমান কালস্রোতের মধ্যে শক্ত মাটির স্পর্শ দিল। হেরাক্লিটাস হইতে বার্গসঁ— যাঁহারা অকারণ অবারণ চলাকে বিবর্তনমূলক স্মৃতি-সত্তা-ভবিতব্যের মূলীভূত প্রেরণা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও

বৈজ্ঞানিক— সুতরাং নিঃস্পৃহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া তাহার চেতনার সঙ্গে যখন এই গতিরাগের সংঘাত ঘটিল, তখন তিনি উদ্দাম সৃষ্টিপ্রবাহে শুধু ভাসিয়া চলিলেন না, তাঁহাকে পথের প্রান্তে থামিতেও হইল। "যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে"— ইহাই তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। কৌতূহলী পাঠক এই কবিতার অন্ত্যমিলগুলি লক্ষ্য করিলে কবি-মানসের মূল স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। এইভাবে কবিতাটির প্রতিটি ধ্বনিগুচ্ছ ও প্রতিবিম্বের বিশ্লেষণ বিভাজন চলিতে পারে।

এই কবিতার রূপকল্প বা imagery-গুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার, দিনের ভাঁটা, রাত্রির জোয়ার, শব্দের বিদ্যুৎছটা, শূন্যের প্রান্তর, আনন্দের অট্টহাস, বিস্ময়ের জাগরণ, শব্দময়ী অপ্সর রমণী, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ, বেগের আবেগ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, মাটির বন্ধন, আকাশের কিনারা, বেদনার ঢেউ, স্তব্ধতার ঢাকা, মাটির আকাশ, মাটির আঁধার, বীজের বলাকা, উন্মুক্ত ডানা, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন, আলোর ক্রন্দন, বাসাছাড়া পাখি প্রভৃতি উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষায় কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যাইবে। পৌরাণিকতা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চেতনাকেই প্রভাবিত করিয়াছে, আধুনিক কবিরাও দেশ-বিদেশের ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য ও অন্যান্য কাব্য ও শিল্পকলার রূপ ও ধ্বনিগত বিশেষ প্রভাব আছে। "ঐ পক্ষ-ধ্বনি, শব্দময়ী অপ্সর-রমণী গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি", "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ" এবং "এই গিরিরাজি এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়"— এই চিত্ররূপ ক'টি স্মরণ করা যাইতে পারে। অপ্সর-রমণীদের দ্বারা মুনিগণের ধ্যানভঙ্গের নানা উপাখ্যান ভারতীয় পুরাতন ঐতিহ্যে যত্রতত্র মিলিবে। এখানে সূক্ষ্ম রূপকের মারফতে সেই চিত্ররূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় পর্বত গিরিরাজি উন্মুক্ত ডানায় জানা হইতে অজানায় উড়িয়া চলিয়াছে, এ রূপকল্পনাটি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত মৈনাক আখ্যানের প্রভাবে পরিকল্পিত মনে করা যায় কি?

কবিতাটির বাণীমূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অনির্দেশ্য গতি ও উদ্দেশ্যহীন যাত্রার ব্যঞ্জনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধ্বনি বা শব্দের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। চিত্র অনেকটা স্থির নিশ্চল, ধ্বনি ধাবমান। সেই

গতিময়তা পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে শব্দের উপর বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। কবিতার প্রথম স্তবকে "অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি" —এইখানে ধ্বনির প্রথম ব্যঞ্জনা। এই স্তবকের প্রথম সাতটি পংক্তিতে চিত্ররূপ, শেষ তিন পংক্তিতে ("মনে হল সৃষ্টি যেন" হইতে "উঠিছে গুমরি" পর্যন্ত) অব্যক্ত ধ্বনিপুঞ্জ ব্যক্ত হইতে চাহিতেছে। ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত, কালো-জলে তারাফুলের প্রতিফলন, অন্ধকার গিরিতটতল, সারে সারে দেওদার তরু—এ সমস্তই চিত্ররূপ। কিন্তু স্থির চিত্র ধ্বনিপুঞ্জের মধ্য দিয়া গতিময় হইতে চাহিতেছে, কবির তাহাই মনে হইল। সহসা হংসবলাকার পক্ষবিধূনন বিদ্যুৎ-ছটার মতো ছুটিয়া গেল। ইহাও মূলতঃ দৃশ্যময় ও চাক্ষুষ ব্যাপার। কিন্তু এই শব্দানুষঙ্গ পরক্ষণেই ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত পাখা হইতে আনন্দের অট্টহাসে পরিণত হইল, স্থাবর গিরিশ্রেণী ও মৃত্তিকাবন্দী দেওদার বনের শিহরণ কল্পনাও যুগপৎ চিত্র ও ধ্বনির ইঙ্গিত বহন করিতেছে। বলাকার পক্ষধ্বনি কবির অন্তরে কতকগুলি বোধ জাগাইয়া তুলিল। "নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ", পর্বতের বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইবার বাসনা, তরুশ্রেণীর মাটির বন্ধন ফেলিয়া শব্দরেখা ধরিয়া আকাশের সীমা খুঁজিতে উধাও হইবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি চিত্র ও ধ্বনিপ্রকরণের মারফতে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিলেন, বিশ্ববস্তু ও তাহার অস্তিত্ব জড়ের শিকলে বন্দী হইয়া নাই, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ স্থাবরত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া অন্য কোথাও ছুটিয়া চলিয়াছে। উদ্দাম চঞ্চল পাখার শব্দে ক্ষুদ্র তৃণদল হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিরাজ ও দেওদার বন 'দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে' উড়িয়া চলিয়াছে। লক্ষণীয় 'দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে' বলিতে বোধহয় তিনি বস্তুবিশ্বকে কাল-প্রবাহের মধ্যে এক-একটি দ্বীপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন এবং আলোর ক্রন্দনও ধ্বনিময়তার ব্যঞ্জনা বহন করিতেছে।

সর্বশেষ স্তবকে কবি বহির্বিশ্বের ধাবমান অস্তিত্বপ্রবাহ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। বস্তুবিশ্বের পাখিরা তো শব্দময় অনন্তের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, চলার সেই বেগ কবিও উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার বাসাছাড়া পাখি এক পার হইতে অন্য পারে যাত্রা করিল। অবশ্য শুধু কি 'অকারণ অবারণ চলা'ই তাঁহার উপলব্ধির মূল উদ্দেশ্য? "অন্য কোথা অন্য কোন্ খানে"— এই অর্ধছত্রেই বুঝা যাইতেছে, তিনি পরিণামহীন ও কার্যকারণসম্বন্ধব্যতিরিক্ত ধাবমানতাকে তাঁহার জীবনের শেষ পরিণাম বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কাব্যের আর

এক স্থানে বলিয়াছেন :

"ফিরবে না রে, ফিরবে না রে, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না।"

তবু কবিচেতনা যে একটি স্থিরবিন্দুসন্ধানী তাহাতে কোনো দ্বিমত নাই। এই প্রসঙ্গে ১৯ সংখ্যক কবিতাটি ( "আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে" ) স্মরণ করা যাইতে পারে। পাওয়া ও ত্যাগ করা— "এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল"— এই সিদ্ধান্ত তাঁহাকে অস্তি-নাস্তির মাঝখানে আশ্বস্ত করিয়াছে। অবশ্য ইহা তো ভাব ও তত্ত্বের কথা, আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিমার লাবণ্য নহে, তদন্তরালবর্তী কাঠবাঁশ খড় লইয়াই আমরা আলোচনা করিতে চাহি। কিন্তু কাঠখড় রশারশির কড়াক্রান্তি হিসাব লইলেই কি প্রতিমার লাবণ্য উপলব্ধি করা যাইবে? শুধু মাপজোখের দ্বারা কবিতার প্রকৃত স্বরূপ ধরা যায় না— "আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে, প্রাণ তাহা পায় শুধু প্রাণে"। তবে ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে হয়তো কবিচেতনার অন্তরগুহাশায়ী প্যাটার্নের রহস্য বুঝা যাইতেও পারে।

এবার স্তবকগুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাক। কবিতাটির পাঁচটি স্তবক। প্রতি স্তবকে পংক্তিবিন্যাস এইরূপ :

প্রথম স্তবকে ১০টি পংক্তি, সর্বাপেক্ষা বড়ো মাপের পর্বে ১৮ মাত্রা। এইরূপ পর্বের সংখ্যা— ৪ ; সর্বাপেক্ষা ছোট মাপের পর্বে মাত্রা— ৬। ১০ মাত্রার পর্ব ৩টি।

দ্বিতীয় স্তবকে ১৪ পংক্তি। এখানেও পর্বগুলির মাত্রা ১৮, ১৪, ১০। একটি পর্বে একটি যুগ্ম স্বর দুই মাত্রা ধরা হইয়াছে— "ঐ পক্ষধ্বনি"— এখানে 'ঐ'-কে দুই মাত্রা ( ওই ) না ধরিলে ছন্দে ঘা লাগে। যুগ্ম ও দীর্ঘ স্বরকে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের খাতিরে কোথাও কোথাও দু'মাত্রা ধরিয়াছেন। যেমন— "বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে" ( 'বৈশাখ' ) এবং "রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে" ( 'রূঢ়' )।

তৃতীয় স্তবকে ১৫ ছত্র। এখানেও পর্বসংখ্যা ও মাত্রা পূর্বের মতো। একটি ৪ মাত্রার পর্বও আছে— "দিল আজি।" পরের দুই স্তবকে ৪ মাত্রার আরো দুটি ছোট পর্ব আছে— "তৃণদল," "দিনেরাতে"।

চতুর্থ স্তবকে ১৬ ছত্র এবং পঞ্চম স্তবকে ১০ ছত্র। ভাবের উপস্থাপনা বিচার করিলে প্রথম স্তবকে সূচনা, দ্বিতীয় স্তবকে শব্দতরঙ্গের আঘাতে জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য, তৃতীয় স্তবকে বলাকার পক্ষধ্বনি হইতে কবির অন্তরে কতকগুলি রূপময় গতিবেগের জন্ম— সমস্ত বস্তুচেতনা প্রবাহমান ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া, জড়ত্বের পাষাণভার ত্যাগ করিয়া এবং নিকটকে পিছনে ফেলিয়া সুদূরের পানে উধাও হইল। কিন্তু সে দূরও অনন্তের অভিসার নহে। তৃতীয় স্তবকেই দেখা যাইতেছে, ধাবমান যাত্রা 'অন্য কোনোখানে' নিবৃত্তি লাভ করিবে এমন একটা ইঙ্গিত আছে। "শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও"— এই নিরন্তর গতিই নহে, "হেথা নয় হেথা নয়"— এই দুটি নেতিবাচক নিষেধের দ্বারা স্থানের দিক হইতে অসীমতার ব্যঞ্জনা, কিন্তু পরক্ষণেই 'অন্য কোন খানের' স্থানিক ব্যঞ্জনার প্রশ্নবোধক নির্দেশ। তৃতীয় স্তবকে কবি কূল ছাড়িলেও তিনি যে তীরাভিসারী এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। চতুর্থ স্তবকে কবির দার্শনিক সিদ্ধান্ত। জলেস্থলে সর্বত্র তিনি গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করিলেন, যে গতিপ্রবাহ ধ্বনিপ্রবাহেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। দ্বিতীয় স্তবকে কবির মনে হইয়াছিল নিশ্চলের অন্তরে বেগের আবেগ জন্মলাভ করিতেছে। কিন্তু চতুর্থ স্তবকে কবির আর কোনো সংশয় রহিল না। স্থূল সূক্ষ্ম, মাটির আকাশ ও মাটির আঁধার নীচে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা অর্থাৎ অশেষ গতিবেগে জন্মলাভ করিতেছে। গিরি অরণ্য সবই যেন ডানা মেলিয়া অজানা হইতে অজানায়, শূন্য হইতে শূন্যে উড়িয়া চলিয়াছে।

পঞ্চম স্তবকের প্রথম কয় ছত্রে দেখা যাইতেছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা সবার অলক্ষ্যে অস্পষ্ট অতীত হইতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। অস্পষ্ট অতীত অর্থাৎ স্মৃতিলোক, সুদূর যুগান্তর অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। এখানে অতীত অস্পষ্ট হইলেও অস্তিত্বহীন নহে, এই অতীতবোধ হইতেছে অতিক্রান্ত কালচেতনা। কিন্তু 'যুগান্তর' শব্দে কালচেতনার সঙ্গে দেশচেতনাও ইঙ্গিতে রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বোধ হয় কবির বক্তব্য, মানবচেতনা ও ভাবনা জড়বস্তুর মতো স্থাণুত্বের শিকলে বন্দী হইয়া নাই, তাহা দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া তীব্র গতির মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে। কবি সেই স্থানকালবন্ধনহীন গতিবেগ নিজ চেতনায় উপলব্ধি করিলেন। বাহিরের অভিজ্ঞতা কবির চেতনলোকে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত বোধকেও পরিবর্তিত করিল। আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার

সঙ্গে তাঁহার অন্তর-বিহঙ্গও আলো-অন্ধকার, অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির মধ্য দিয়া এক বোধের জগৎ হইতে অন্য বোধের জগতে চলিয়াছে। 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতায় যাত্রা, উড়িয়া যাওয়া, খেয়া পারাপার, নদীস্রোত প্রভৃতি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়া অবিরাম গতির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নির্বিকল্প গতিতেই গতির নির্বাণ, এমন একটা অপরিণামী নেতিত্ব বোধ হয় তাঁহার অস্তিবাদী ভারতীয় মন মানিতে চাহে নাই। একটি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

"অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।"

এ সমুদ্রতীর ও দেশ অজানা হইলেও অস্তিত্বহীন নহে।

এই কবিতার প্রত্যেক শব্দ, অলঙ্কার ও নির্মিতি-কৌশল লইয়াও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলিতে পারে। চলিতে পারে তাহার ভাবানুষঙ্গ, ধ্বনি ও চিত্ররূপ, শব্দপ্রয়োগের বিশ্লেষণ। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, হিসাব করিয়া, গণিয়া গাঁথিয়া, ছক আঁকিয়া cross word puzzle-এর সমস্যা সমাধান করা যায়, কিন্তু কবিতা হয় না। কবিচেতনায় বিশেষ রসাবেশের অব্যক্ত আবেগ সঞ্চারিত হইলে প্রকাশের সময় সে আবেগ আপনা আপনি ভাষা, ছন্দ, বাণীরূপ নির্মাণ করিয়া লয়। সেই স্বয়ং-ক্রিয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পিছনেও যে একটি সক্রিয় পরিমাণ-সামঞ্জস্য থাকে, এবং যে সামঞ্জস্যীভূত প্রকরণকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মতো পৃথগ্‌ভাবে দেখানো যাইতে পারে, একালের নূতন সাহিত্যবিশ্লেষণ পদ্ধতি সেইটি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সেই রীতি সবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বহু অনুশীলন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর এই রীতির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। একালের কোন কোন অত্যুৎসাহী সাহিত্যপাঠক বলিতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বস্তুগত, নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক ও বৈয়াকরণ রীতিই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। অবশ্য এ-সম্পর্কে হলফনামা পাঠ করিয়া কোন মন্তব্য করিতে সম্মত নহি। কারণ আমাদের এমন কোন অলৌকিক সামুদ্রিক বিদ্যা আয়ত্ত হয় নাই যাহাতে নির্ভুলভাবে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-করকোষ্ঠী গণনা করিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলিবেন, পিণ্ড খর্জ্জুর খাইয়া জিহ্বা অসাড় হইয়া গেলে তিন্তিড়ীর

অম্লস্বাদ মন্দ লাগিবে না। উর্বশীর অধরস্পৃষ্ট অমৃতপাত্রে অনীহা দেখা দিলে সারস্বত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্যের জন্য কোন্ জড়িবুটির প্রয়োজন হইবে তাহাও নির্দেশ করা দুরূহ। কঙ্কালতত্ত্বের বিশ্লেষণ অতি প্রয়োজন, কিন্তু সে বিদ্যা কি লাবণ্যসৃষ্টিতে কাজে লাগে? আঙ্কিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক হিসাবনিকাশে কবিতাকে আর একটা দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাহার লাভ?

## শরৎ-প্রসঙ্গ : কয়েকটি প্রশ্ন*

১. সমাজের অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানুষের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু সমাজের ঐ অত্যাচারের সমাধান সম্বন্ধে তিনি নীরবই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যে সমস্যার কথা আছে, সমাধানের নির্দেশ নেই।—এই অভিযোগ সত্য হলে শরৎ-সাহিত্যের মূল্য কমে যায় কি ?

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ ও নীতিঘটিত কতকগুলি সমস্যা আছে, যে-কোন সচেতন পাঠকের তা চোখে পড়বে, শরৎচন্দ্র নিজেও তা কবুল করেছেন। ইতিহাস, রোমান্স, ছদ্ম-ইতিহাস ও কল্পনাপ্রধান বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হলেও তার একটি প্রতীতিগম্য আবেদন চাই। বাস্তবের পটভূমিকায় ও বাস্তব নরনারীকে নিয়ে যে-সমস্ত আখ্যান লেখা হয় তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাস্তব সমস্যার ছায়াপাত ঘটে। প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এমনকি যুবক রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছিলেন, তারও মধ্যে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসা, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে ঠাঁই করে নিয়েছিল। গ্রন্থের মধ্যে তাঁরা তার একটা সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শেষ পংক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম! ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" বোধ হয় এর তাৎপর্য— বিষবৃক্ষ উপন্যাস পাঠে মানুষের চিত্তের অসংযম দূর হয়ে গিয়ে মানবসংসার আনন্দময় হয়ে উঠবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাই-ই তাঁর পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথও কি এই ধরনের উচ্চতর চারিত্রমহাত্ম্যের হাত থেকে তাঁর চরিত্রগুলিকে উদ্ধার করে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে ছেড়ে দিতে পেরেছেন ? বিহারীর বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী বলেছে, "আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা। সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। …পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি

*শরৎ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শহরতলীর এক বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ লেখককে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখিতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে সেই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি প্রকাশিত হল।

তপস্যা করিব— এ-জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই।...ভুল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখি হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে— আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।" এ মানসিকতার পিছনেও সূক্ষ্মভাবে নীতিপ্রচার কাজ করেছে। সমাজের রক্তচক্ষু বিনোদিনীকে শাসন করেছে, তার সঙ্গে আছে প্রিয়জনের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা। সে যাই হোক, বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজ, পরিবার-জীবন এবং সামাজিক নীতিবোধের কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। তখন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়েছে, ফলে পারিবারিক রক্ষণ-শক্তিও পর্যুদস্ত হয়েছে, এবং বলাই বাহুল্য সমাজ নামক ইন্‌স্টিটিউশনও তখন হতবল হয়ে পড়েছে। হতবলের শেষ অস্ত্র দুর্বলের প্রতি অত্যাচার ও পীড়ন। সে পীড়ন লক্ষ্য করা যাবে একালের পল্লীসমাজের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে ছিলেন এবং নিশ্চয় কৌতূহলের সঙ্গে সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থা, নারীসমাজের স্বাতন্ত্র্য, সচলতা ও সজীবতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন পল্লী-বাংলার সমাজে ও জীবনে সেই সজীব প্রাণের বিশেষ কোন লক্ষণ ছিল না। বিশেষতঃ অসহায় নারীজাতির উপর রুগ্‌ণ সমাজের পীড়নটাই চলত নিরুদ্বেগে। অতিশয় সহৃদয় শরৎচন্দ্র এই দুই দেশের নারীর প্রতি সমাজের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয় অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর আখ্যানে সেইসমস্ত বেদনাময় ও মর্মস্পর্শী কাহিনী নারীচরিত্রের ব্যর্থ পরিণামের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাঁর উপন্যাস ও গল্পে সামাজিক, পারিবারিক ও নীতিঘটিত উৎকট সমস্যার অনেক নিদারুণ চিত্র আছে। হিন্দুসমাজের অর্থহীন আচার-বিচার, স্মৃতিসংহিতার অকারণ প্রভাব, বহুবর্ষ পূর্বে সঙ্কলিত নীতিতত্ত্ব এবং আরও নানা ধরনের বাধানিষেধ মানুষকে অকারণে কত দুঃখ দেয় একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর রচনায় সে সমস্ত রক্তাক্ত কাহিনীকে এমন জীবন্তভাবে এঁকেছেন যে তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রচনার আন্তরিকতায় কতটুকু impossible probability (*adunate eikota* ), আর কতটুকু improbable possibility ( *dunate apithana* ) তার পার্থক্যবিচার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। উৎকট সমস্যার ভারে পীড়িত জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি নিশ্চয় কতকগুলি মৌলিক সামাজিক সমস্যার তীব্রতা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু দুটি-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি রচনার কোথাও

বড়ো মাপের সমাধানের ব্যবস্থা করেননি। বোধ হয় 'শ্রীকান্তে'র অভয়া একটি ব্যতিক্রম। লম্পট কদাচারী অমানুষ স্বামীকে পরিত্যাগ করে সে সদাশয় রোহিণীবাবুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমস্যাবহুল অন্য উপন্যাসে এইরকম-প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সমাধান লক্ষ্য করা যায় না। এই সম্পর্কে তাঁকেও জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসে বাঙালীর সমাজ ও পরিবারের অধঃপতনের কারণ হিসাবে কয়েকটি ত্রুটিকে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে যে-সব ব্যাধির নিরাকরণ হয়, তিনি তার বিশেষ কোন ইঙ্গিত ও নির্দেশ দেননি। শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর মতোই জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভক্ত ও অনুরাগী বান্ধবদের বলেছিলেন যে, সমাজ ও নীতির শূন্যগর্ভ আদর্শ যখন পীড়নের আকারে মানুষকে অকারণে দুঃখ দেয়, সেই পরম বেদনাময় আবেগ-টুকুকেই তিনি তাঁর গল্প-আখ্যানে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কিসে সমাজের কল্যাণ হয়, দেশে, সমাজে ও পরিবারে শান্তি ফিরে আসে, এ-সব হচ্ছে সমাজ-সংস্কারকের কাজ, শিল্পীর প্রত্যক্ষ ব্যাপার নয়। এ কথা আমার কাছে খুবই যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হয়েছে। বিশেষ কোন সমাজঘটিত নীতিকথা, প্রচারতত্ত্ব— অর্থাৎ লেখকের মনোগত কোন theory বা message বড়ো হয়ে উঠলে তাতে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অবশ্য শরৎচন্দ্রের দু'একটি উপন্যাসে এ ব্যাপার ঘটেছে।

সমাজের নেতারা সাহিত্য ও শিল্পকে সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতে পারেন। তবে সেটা হচ্ছে সাহিত্যের by-product ; যেমন ধরা যাক— একালে রাজনীতি ও দেশশাসন-সংক্রান্ত কর্মসূচী নিয়ে গান বাঁধা হচ্ছে, নাটক অভিনীত হচ্ছে, গল্প-আখ্যানও লেখা হচ্ছে। বলা বাহুল্য এর দ্বারা শিল্প ও সাহিত্যের কোন লাভ নেই ; সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল-উপদলের হয়তো কিছু লাভ হতে পারে। তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কারণ পাটোয়ারি বুদ্ধির রাজনৈতিক গ্রহ-উপগ্রহেরা ইচ্ছামতো প্রয়োজন সাধনের জন্য শিল্পী ও সাহিত্যিকের গলায় স্বর্ণরজ্জু পরিয়ে দিয়ে পরিচালিত করতে পারে, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রতন্ত্রে এ ব্যাপার নিয়তই হচ্ছে। শিল্পী শুধু নিয়তিকৃত নিয়মকেই অস্বীকার করেন না, তিনি শিল্প-বহির্ভূত যে-কোন নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী, হোক তা দেশের দশের কল্যাণমূলক। যাই হোক,

নিজের দিক থেকে বলতে পারি, কেবলমাত্র সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে কলম ধরলে বা ধরতে বাধ্য হলে লেখক স্বধর্মভ্রষ্ট হবেন। যে সাহিত্যিক জনকল্যাণের জন্যই কলম ধরেন তাতে তাঁর সহানুভূতি ও সহৃদয়তা প্রমাণিত হয়, শিল্পবুদ্ধি নয়। অবশ্য তিনিও সামাজিক জীব, এবং তাঁরও সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে। সমাজের ভালোমন্দ তাঁর রচনাতেও প্রতিফলিত হতে পারে, কিন্তু সমস্ত কিছুই একটা শিল্পমূর্তি লাভ না করলে প্রচারের ধাক্কায় কোন শিল্প-সাহিত্যকেই বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। শরৎচন্দ্র মূলত শিল্পী ছিলেন, তাই সমাজসংস্কারের জন্য এবং পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যই নিজস্ব শিল্পসৃষ্টিকে পরিচালিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় আছে, এই দুই সত্তাকে মেলাতে গেলেই সাহিত্যের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষত কোন সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেননি, তাতে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি।

২. শরৎচন্দ্র ক'জন বিদেশী মনীষী সাহিত্যিকের, বিশেষ করে টলস্টয় ও গোর্কির ভক্ত ছিলেন। শরৎ-সাহিত্যে এঁদের চিন্তা বা সাহিত্যের কি রকম প্রভাব পড়েছে বলে আপনার মনে হয়?

শরৎচন্দ্র বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমাজতত্ত্বঘটিত বৈজ্ঞানিক আলোচনার খুব ভক্ত ছিলেন। রাসেলের ***Marriage and Morals*** গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রকে নরনারীর তথাকথিত বৈধ বিবাহবন্ধন সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়েছিল। টলস্টয়ের মানবিক আদর্শের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। শিল্পীর কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে টলস্টয়ের সেই বিখ্যাত উক্তির দ্বারা ( "The aim of an artist is not to resolve a question irrefutably but to compel one to love life in all its manifestations.") শরৎচন্দ্র নিশ্চয় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। টলস্টয়ের *Anna Karenina*-য় নীতি ও সমাজের চাপে নরনারীর যে ব্যর্থ জীবনের চিত্র আঁকা হয়েছে, শরৎচন্দ্রের মতো সহৃদয় ও আবেগপ্রবণ সাহিত্যিক তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুত তিনি একই পথের পথিক। গোর্কি মূলত সমাজতান্ত্রিক গণ-সংগ্রামের পক্ষ থেকেই লিখেছিলেন। তাঁর

রচনায় ও আত্মজীবনীতে—তৎকালীন রুশদেশের শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক চিত্র আছে। বোধ হয় 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে দ্বিজদাসের উক্তি এবং 'দেনা-পাওনা'র শেষাংশে কৃষকদের সঙ্গে জমিদার জীবানন্দের মাঠে নেমে একসঙ্গে কাজ করার দৃষ্টান্ত (De-class-এর প্রতীক ?) কিয়ৎপরিমাণে ভূমির সঙ্গে এবং ভূমিজীবীর জীবনসমস্যার সঙ্গে জড়িত। অন্যত্র তিনি বহু দুঃখদুর্গতির চিত্র এঁকেছেন। 'পল্লীসমাজে' বিশ্বেশ্বরী ও রমেশের আলোচনা এবং গ্রামের সাধরণস্তরের সঙ্গে রমেশের অন্তরঙ্গতার চিত্রেও শরৎচন্দ্র পূর্ণ আবেগ এবং যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু গোর্কির মতো ইতিহাসনিষ্ঠ কৃষিজীবন ও কলকারখানার বিষনিঃশ্বাসকে তিনি তাঁর সাহিত্যের মূলধন বলে গ্রহণ করেননি। 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গে' শ্রেণীপরিচয়ের চেয়ে মানুষের দুঃখবেদনার কথাই বেশী বলা হয়েছে। গোর্কির রচনান্তরালবর্তী বিশেষ ধরনের সামাজিক আদর্শ ও দার্শনিক প্রত্যয় নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে যে অকুণ্ঠ মানবপ্রেম রয়েছে শরৎচন্দ্র নিশ্চয় তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে রুশ সাহিত্যিক ডস্টয়ভস্কির দ্বারা বোধ হয় তিনি অধিকতর প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কারণ উক্ত রুশ ঔপন্যাসিক প্রবৃত্তিতাড়িত ও দুখ হত মানুষের সুদুঃসহ বেদনার চিত্র এঁকেছেন, যার প্রতি মানবপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক।

৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war : আত্মকলহ আর গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।" ......এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে 'পথের দাবি' উপন্যাস রচনা করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত বলে মনে হয় কি ?

শরৎচন্দ্র একসময়ে রাজনৈতিক আলোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিছুকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। সেকালের অহিংস গান্ধীবাদী ও সহিংস সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী— সকলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিপ্লবীদের তিনি গোপনে গোপনে নানাভাবে সাহায্যও করতেন। তিনি যে-রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন তা অহিংস নিষ্ক্রিয়তা নয়। এ সম্পর্কে তাঁর নানা উক্তি, চিঠিপত্র, 'পথের দাবি' এবং 'স্বদেশ ও সাহিত্যে' পাওয়া যাবে।

বিপ্লবাত্মক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সব সময়েই একমুখী ছিল না, কখনও কখনও তাঁর এক উক্তির সঙ্গে অন্য উক্তির বিরোধও ছিল। ভূপেন্দ্রকিশোরকে তিনি যা বলেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছে, পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে হেগেল ও মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক শ্রেণীসংগ্রাম উপযুক্ত হাতিয়ার নয়, এ ধরনের একটা অস্বচ্ছ বিশ্বাস তাঁর ছিল। রুশদেশে জারতন্ত্র, বুর্জোয়া ও কুলাকদের হাত থেকে দরিদ্র রুশবাসীকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল লেনিন-পরিচালিত class war বা শ্রেণীসংগ্রাম, যা শেষ পর্যন্ত বিরাট গৃহযুদ্ধে ( civil war ) পর্যবসিত হয়। সেখানে শত্রু ছিল ঘরের মধ্যে এবং তারা স্বদেশী। সুতরাং তাদের নিপাত করার জন্য গৃহযুদ্ধ অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম নিতান্তই প্রয়োজন। এটাই মার্কসীয় পন্থার ফলিত রূপ। কিন্তু পরাধীন ভারতের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। পরাধীন ভারতকে বিদেশী শাসকের বন্ধনরজ্জু থেকে উদ্ধার করাই হবে বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য। সে বিপ্লবকে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করতে গেলে পুঁজিপতি, সামন্তশ্রেণীর ধনী, শিল্পপতি, শিক্ষক, কেরানী, মজুর, কৃষক এবং অন্যান্য খেটে-খাওয়া দরিদ্র জনসাধারণ সকলের মিলিত চেষ্টা দরকার। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই ধরনের আন্দোলনের পরিচালনা করা হয়েছিল এবং মোটামুটি সেই দিকেই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ইংরেজ বিতাড়নের জন্য জাতি, শ্রেণী ধর্মসম্প্রদায়, অর্থনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের মিলিত সংগ্রামই ছিল পরাধীন ভারতের একমাত্র হাতিয়ার। 'পথের দাবি'-তে সব্যসাচী সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। গোড়াতেই যদি মার্কসীয় দর্শনের টীকা-ভাষ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রামের পরিকল্পনা করা হত, তা হলে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটত, অনৈক্য অনিবার্যভাবে হানা দিত, পরশাসনের নিগড় এই সুযোগে আরও কঠিন হয়ে গলায় বসত। শরৎচন্দ্র "বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী" বলেছেন। কিন্তু সব্যসাচী ভারতের বাইরে থেকে শুধু সন্ত্রাসবাদী পন্থায় ভারতবর্ষে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। মনে হতে পারে, এ যেন দু'রকমের কথা। কিন্তু এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শরৎচন্দ্র খুব সম্ভব বিশ্বাস করতেন, তাঁর কালে মার্ক্সীয় পন্থায় প্রোলেটারিয়েট বিপ্লব ভারতবর্ষে অসম্ভব। তাই সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা।— এ আমার ভাল, এই আমার মন্দ,— এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই।" সেই স্বাধীনতা কীভাবে আসবে সেই প্রসঙ্গে সব্যসাচী মুক্তকণ্ঠে

বলেছেন, "বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,— এই তার বর, এই তার অভিশাপ।" শরৎচন্দ্র নিজেও বিপ্লবের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করতেন এবং তথাকথিত মডারেটপন্থী সংস্কারকে অবহেলাই করেছেন। এক পত্রে তিনি বলেছেন, "আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরান জিনিষটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবি'-তে বুঝিয়েছি— সংস্কার জিনিষটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস, অনেক দিন চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে— সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করান। যেমন গভর্ণমেণ্টের শাসন সংস্কার, Reforms— আর একদল যারা Revolution চাইছে— Revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান Reforms, অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়, মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না।" সুতরাং শরৎচন্দ্র চিন্তার দিক থেকে বিপ্লবীই ছিলেন, তাঁর মতের প্রতিভূ হচ্ছেন সব্যসাচী। তবে সে বিপ্লব প্রধানতঃ ইংরেজ বিতাড়নেই নিযুক্ত করতে হবে, সর্বাগ্রে দেশকে পরশাসনের নিগড় থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তার পর সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি কেমন হবে, তা পরবর্তীকালেই বিবেচ্য। সেই দিক থেকে 'পথের দাবি' উপন্যাস রচনা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে।

**৪. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা ও ঘটনাবিন্যাসে নাট্যিক উপাদান ও কাব্যিক মাধুর্য কতখানি? এই উপাদান ও মাধুর্য তাঁর উপন্যাসকে কি সর্বক্ষেত্রেই শৈল্পিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে?**

শরৎচন্দ্র অতিশয় জনপ্রিয় লেখক হলেও, কেউ কেউ বলেন, তাঁর রচনায় কিছু কিছু শিথিলতা আছে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন, তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাবিন্যাস ও ঘটনাগ্রন্থন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাঁর বাক্‌রীতিতে কোথাও আছে নাটকের অনিবার্যতা, কোথাও-বা গীতিরসের মূর্ছনা। এজন্য সর্বশ্রেণীর পাঠকই তাঁর লেখা পড়তে ভালোবাসে। অনুবাদের মারফতেও তাঁর এই রীতির অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে যেজন্য তিনি অন্য প্রদেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। কিন্তু সমালোচক বলবেন, কোন গ্রন্থ সমসাময়িক

কালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার রচনায় অনেক গলদ থাকতে পারে, আঙ্গিকের দিক থেকে তাতে নানা দোষ-ত্রুটি ফুটে উঠতে পারে। শরৎ-চন্দ্রের অধিকাংশ লেখাই বুদ্ধির মারপ্যাঁচবর্জিত, সহজ সরল ঘটনাবিন্যাস মাত্র। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় তাঁর প্রায় কোনও চরিত্রই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীটি যেন পূর্বনির্ধারিত পথ ধরেই চলে। চরিত্রগুলিও খুব একটা অদ্ভুত, নতুন ও মৌলিক নয়। মাঝে মাঝে করুণ রস ও সুলভ আবেগের বাড়াবাড়িও আছে। তাই আঙ্গিক ধরে বিচার করলে তাঁর লেখার কিছু কিছু ত্রুটি বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কেবল নিখুঁত আঙ্গিকের জোরে কোন রচনা মহৎ শিল্প হতে পারে না। রামায়ণ ও মহাভারতে রচনাগত বহু শিথিলতা ও অসঙ্গতি আছে। বরং আমাদের একালের কোন কৃতবিদ্য ঔপন্যাসিকের চটি আকারের উপন্যাস অনেক বেশী 'সুলিখিত'। তবু রামায়ণ-মহাভারত সমস্ত সমবাদী ও বিষমবাদী সুরকে একটি 'সমে' মিশিয়ে দিয়ে মানব-জীবনের সুচিরকালস্থায়ী মহাকাব্য হয়েছে এবং একালের নিখুঁত স্টাইলের উপন্যাস প্রথম সংস্করণের পরই লীলা সংবরণ করছে! আঙ্গিকগত দু-একটি অসঙ্গতি থাকলেও শরৎসাহিত্য উপভোগে কোন বাধা জন্মায় না। কারণ তিনি যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তারা পাঠকের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যায়, তাদের যেন আত্মীয় বলে মনে হয়। এ ব্যাপার আমি সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই লক্ষ্য করেছি। যাকে আমরা ভালোবাসি তার শরীরের কোথায় অল্পস্বল্প খুঁত আছে তা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। ভালোবাসাই দৃষ্টিকে উদার করে তোলে। অবশ্য বুদ্ধিজীবী সমালোচক তাতে খুশি হবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন, শরৎচন্দ্র ভাবাবেগের ফানুস তৈরি করেছেন যা বুদ্ধি ও মননের সামান্য খোঁচায় চুপ্‌সে যায়। এ-সব কথা এখানে আলোচনার সময় নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা যতই মননের বড়াই করি, অন্তরে অন্তরে আমরা সকলেই আবেগের ভক্ত। শরৎচন্দ্রের আঁকা নর-নারীগুলিকে আমরা আমাদের ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার প্রতিফলন বলেই মনে করি। সুতরাং পাঠকের দিক থেকে তাঁর রচনার দোষসন্ধান বাহুল্য মনে হয়। যাকে readability বলে, যা হচ্ছে কাহিনীগ্রন্থের প্রধান সম্পদ, শরৎচন্দ্রের লেখায় তার অজস্র ঐশ্বর্য লক্ষ্য করা যাবে। সর্বকালীন জনবল্লভতাই সাহিত্যের শেষ আদালত।

**রাধারাণী দেবীকে 'শেষপ্রশ্ন' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; ......এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকুমাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ।" —'শেষপ্রশ্ন' সত্যই কি আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ হতে পেরেছিল?**

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' একখানি আধুনিক বিতর্কসঙ্কুল উপন্যাস। শরৎচন্দ্র নিজে যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন এবং যে ভাবকে অবলম্বন করেছেন, এ গ্রন্থ যেন তার একটি প্রতিবাদ। একেই তিনি বলেছেন আধুনিকতা। যুক্তি দিয়ে জীবনকে দেখা, সর্ববিধ tradition, যা যুক্তিবিরোধী তাকে নস্যাৎ করা, চিরত্বের প্রতি সংশয়, ক্ষণিকের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা, নির্মোহ জীবনপ্রত্যয় — শরৎচন্দ্র অতি-আধুনিকতা বলতে বোধ হয় এটাই ইঙ্গিত করেছেন। এই সময়ে নবীন কবি-সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু উনাথক ও সংশয়পূর্ণ উক্তিকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং কয়েকজন তরুণ কবি ও সাহিত্যিক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা'য় "সাহিত্যধর্ম" এবং ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে "সাহিত্যে নবত্ব" নামে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে রীতিমতো বাদপ্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। তারো আগে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'বাস্তব' প্রবন্ধটিও যথেষ্ট কলগুঞ্জন সৃষ্টি করেছিল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে এই মর্মে প্রতিবাদের স্বর তুলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য "জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।" কিন্তু প্রবলতর মতকলহ সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধকে কেন্দ্র ক'রে। ডা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে মতামত নিয়ে বিচার-বিতর্ক শুরু করেন। শরৎচন্দ্র এ সময়ে সে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'শেষ প্রশ্ন' রচনার পটভূমিকায় সেই মানসিকতা কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। কমল যেন নবীন ভারতের প্রতিনিধি, সে দর্শনের দিক থেকে ক্ষণভঙ্গবাদী ও ক্ষণিকের পূজারী। ভারতের পুরাতন আদর্শ, মূল্যবোধ ভেঙে-চুরে, নীতি, সংযম, ব্রহ্মচর্য, বিবাহের ধর্মীয় পবিত্রতা, বৈধব্যসংস্কার— এ সব তার কাছে কানাকড়ির দামেও

বিকোয় না। বৈধব্য তার কাছে নিন্দনীয় কুসংস্কার, বিবাহ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের বন্ধন তার কাছে হাস্যকর। সে কোনো নিত্য আদর্শে বিশ্বাসী নয়। সবই স্বল্পস্থায়ী, ক্ষণকালের প্রয়োজন মিটিয়ে সব কিছু বদলে যায়। বদলে যাওয়াটাই জীবনের একমাত্র ধর্ম। "The truth is that we are constantly changing"—বার্গসঁ-এর এই মন্ত্রে সে দীক্ষিত। সুলভ রোমান্টিকতার সে ঘোর শত্রু, স্থায়ী কিছুকে সে স্থবির বলে মনে করে। সমস্ত জীবনপ্রতীতিকে সে সংশয়, সন্দেহ ও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে। এককথায় হৃদয় দিয়ে নয়, সংস্কারের সাহায্যে নয়, চিরাচরিত মূল্যবোধের মানদণ্ড দিয়েও নয়— নিছক নির্মোহ বুদ্ধির সাহায্যে জগৎকে মেনে নেওয়াই তার একমাত্র স্বভাববৈশিষ্ট্য। অবশ্য কমল চরিত্রের শেষরক্ষা হয়নি, তার উক্তি ও আচরণে নানা অসামঞ্জস্য আছে। সে যে সদাসর্বদা সংস্কারমুক্ত তা মনে হয় না। এই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কিছু বিরোধের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ শাশ্বত ভারতবর্ষে বিশ্বাসী। প্রেম, সৌন্দর্য, অনন্ত—এই হচ্ছে তাঁর শিল্প, সাধনা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রী শক্তি। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ লেখকেরা বিভ্রান্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অবিকল নকল করতে উৎসুক দেখে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়ে তাঁদের কিছু সমালোচনা করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে তরুণ লেখকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তরুণদের দলে ভিড়ে গেলেন। 'পথের দাবি' সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁর প্রতি শরৎচন্দ্র কিছু রুষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধে 'পথের দাবি'-র বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে সম্মত হননি। তাঁর বক্তব্যটা ছিল এইরকম— ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কিছু লিখে পাঠকমনে উত্তেজনা সঞ্চার করলে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য লেখককে প্রস্তুত থাকতে হবে, সরকারী নির্যাতন মাথা পেতে নিতে হবে। সেইটি হবে লেখকের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদ। শরৎচন্দ্র লেখার মধ্য দিয়ে উত্তেজক ইংরেজ-বিরোধিতা ছড়াবেন, অথচ তার ফলভোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে অনুযোগ করবেন, রবীন্দ্রনাথের মতে লেখকের পক্ষে এ মনোভাব যুক্তিযুক্ত নয়, শোভনও নয়। রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট কথায় শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এবং রবীন্দ্রনাথ-প্রচারিত সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শের প্রতি তাঁর মনে কিছু বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। 'শেষপ্রশ্নে' তারই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। সে যাই হোক, জাতির যাবতীয় সংস্কার বর্জনই আধুনিকতা নয়। যে-কোন জাতির কতকগুলি

মৌলিক সংস্কার ও প্রবণতা আছে, তা ত্যাগ করলে জাতি দাঁড়াবে কোথায়? তাই 'শেষ প্রশ্নের' কমলের বক্রোক্তি, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ইঞ্জিনের বাঁশী'র ("একটা ইঞ্জিনের বাঁশী, হৃদয়স্পন্দন নহে।") মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, কর্কশ ও কর্ণবিদারী হলেও মনের গভীরে বড়ো একটা আঁচড় কাটতে পারেনি। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে বহু তর্কবিতর্ক আছে। সেখানে মতামতের ধূলিঝড় বয়ে গেলেও সমস্ত উপন্যাসটি মানবজীবনের, বিশেষত তৎকালীন ভারত-চেতনার এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে স্থাপিত, যার ফলে গোটা উপন্যাস একটা জাতির ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। 'শেষপ্রশ্ন' চমক দেয়, কিন্তু সমগ্র চেতনায় প্রবল আলোড়ন তুলতে পারেনি। উপরন্তু পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসে মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা য়ুরোপীয় ভাবাদর্শ থেকে এসেছে। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' তার আদর্শ নয়।

**৬ শরৎচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীর লেখক—একথা কি তাঁর প্রতি প্রশংসামূলক উক্তি? তিনি কি বিশ্বমানুষের লেখক নন?**

শরৎচন্দ্র বাংলাভাষায় লিখেছেন, বাঙালীর ঘরের কথা লিখেছেন এবং নিজেও বাঙালী। সুতরাং তিনি বাঙালী লেখক তো বটেই, যেমন টমাস হার্ডি ইংরেজ লেখক। এতে নিন্দা বা প্রশংসার কিছু নেই। গীতিকবিতা ভাবের আকাশে উধাও হতে পারে। কিন্তু কথাসাহিত্যিকের বিচরণের জন্য চাই কঠিন মাটি, বাস্তব পরিবেশ, চেনা-জানা মানুষ। বলতে গেলে পৃথিবীর যে-কোনো যুগের সাহিত্য দেশ-কালের অধীন। শরৎচন্দ্রের ভূগোলের চৌহদ্দি বিশেষভাবে বাংলাদেশ, কখনও কখনও বাংলার বাইরের অঞ্চল, কখনও বা বর্মা মুলুক। মূলত তিনি বাংলাদেশের লেখক, কিন্তু পূর্ব-বাংলার নন। সেদিক থেকে তিনি সমসাময়িকতার সীমার মধ্যেই আছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উৎসভূমি বিশিষ্ট দেশ-কাল হলেও দেশ-কালকে অতিক্রম করাও এর মূল লক্ষ্য। হোমার, ব্যাস বাল্মীকি— এঁরা বিশেষ যুগ ও দেশের কবি হয়েও সর্বদেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছেন, সর্বকালের পাঠকের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, ভবিষ্যতেও পাবেন। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়া সাহিত্যের লক্ষণ। শরৎচন্দ্র বাঙালীর লেখক,

আবার ভারতেরও লেখক। প্রমাণ— বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত তাঁর গ্রন্থাবলী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকদের প্রীতি। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার একজন অবাঙালী— শ্রীযুক্ত বিষ্ণু প্রভাকর। হিন্দিতে তিনি শরৎচন্দ্রের চমৎকার জীবনী রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও শরৎচন্দ্রের পাঠক আছে। অনুবাদের মারফতে য়ুরোপ-আমেরিকার বিদেশী পাঠকও তাঁর গ্রন্থ থেকে আনন্দ পান। বাঙালী জীবনের ও পরিবারের কথা লিখলেও শরৎচন্দ্র তারই মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষের কথা বলেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তাই উদ্দেশ্য। য়ুরোপীয় ভাষায় তাঁর উপন্যাস যত অনুবাদ হবে, ও-দেশের পাঠকসমাজ ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। হার্ডি, গল্‌সওয়ার্দি, টলস্টয় যে অর্থে বিশ্বের লেখক, শরৎচন্দ্রও সেই অর্থে বিশ্বমানুষের লেখক।

## গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন

১৮৪৭-১৯১৪

১.

কোন-এক ইংরেজ সমালোচক একবার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলেছিলেন যে, প্রতি এক শ বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। কারণ সাহিত্য-বিচারের অন্যতম নিয়ামক শক্তি কাল; সাধারণতঃ স্ব-কালের সঙ্গে সহব্যাপী বলে আমরা অস্মিতার বাইরে যেতে কিছু ক্লেশ বোধ করি। কালক্রমে অনেক লেখক বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যান; গুণপনা সত্ত্বেও বহু শিল্পী-সাহিত্যিককে অল্পকালের মধ্যে লোকস্মৃতির বাইরে চলে যেতে হয়। আবার অনেক পরে স্মৃতির যাদুঘর থেকে যখন কোন লেখককে বাইরে আনা হয়, তখন আবার তাঁর মধ্যে নতুন প্রতিভার জ্যোতি ফুটে ওঠে। রবার্ট ব্রিজেস চেষ্টা না করলে হপকিন্‌সকে আরও কতকাল অজ্ঞাতবাস করতে হত কে জানে?

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালীর জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও গূঢ় চেতনার যে উৎসব শুরু হয়েছিল— সমাজ, রাষ্ট্রচেতনা, নীতিবোধ, ধর্মৈষণা, শিক্ষাদর্শ— জীবনের স্থূল ও সূক্ষ্ম, সর্বপ্রকার অধিমানসের যে অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার একটা বড় স্বরূপ সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল। যথার্থ বিশুদ্ধ শিল্প বলতে বোধ হয় সাহিত্যকে নির্দেশ করা যায়। কারণ সাহিত্যের উপাদান-কারণ মনঃপ্রকর্ষের আলোছায়াকে অবলম্বন করে বাঙময় সত্তার মধ্যে চেতনাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু আবেগের বাঁধভাঙা বন্যায় এমন সমস্ত সাহিত্যবস্তু ভেসে আসে যে, পরবর্তীকালে তার আর কোনো চিহ্ন থাকে না; ক্বচিৎ পুরা-তত্ত্বের ভূগর্ভ থেকে কিছু কিছু জীবাশ্ম উঠে আসে; তখন তার কঙ্কালতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বেধে যায়।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত এমনি একটি বিস্মৃত প্রত্ননিদর্শন। অবশ্য তিনি এমন কোন দূরস্থিত ধূসর ইতিহাসের নিষ্প্রভ ব্যক্তি নন যে, তাঁকে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ী-ভূত করতে হবে। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৫৪ বঙ্গাব্দ) তাঁর জন্ম এবং ১৯১৪ সালে (২, জৈষ্ঠ, ১৩২১) তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁকে খুব একটা পুরাতন কালের ব্যক্তি বলা যায় না। সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম সাধনা এবং

শিক্ষা বিতরণে অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিলেও উনিশ শতকের এই বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, অথচ কয়েক বছর পূর্বে তাঁর একখানি সুবৃহৎ জীবনী প্রকাশিত হয়েছে।[১] নানা অনুসন্ধান থেকে দেখা যাচ্ছে, গুরুনাথ একটি বিশেষ ধর্মচর্যা ও সাধনমার্গের আচার্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য ও অনুরাগী ব্যক্তি তাঁকে দেবতাবৎ ভক্তি করতেন। এখনও তাঁর মতাবলম্বী ভক্তসম্প্রদায় তাঁর স্মৃতি পবিত্র চিত্তে রক্ষা করছেন।[২] অধ্যাত্ম মার্গে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তার নানা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তাঁর জীবনীতে সবিস্তারে পাওয়া যাবে। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণ অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করেন। সে ধরনের বোধাতীত ব্যাপারের সঙ্গে যাঁদের সংযোগ নেই এবং বিশ্বাসও নেই, তাঁরাও গুরুনাথের এই অলোকসামান্য ক্রিয়াকলাপ থেকে এইটুকু বুঝতে পারবেন যে, এই গৃহী, কবি, পণ্ডিত ও সজ্জন ব্যক্তিটিকে তাঁর অনুরাগীর দল কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সেকথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কেই দু' চার কথা বলব।

২.

গুরুনাথ সেনগুপ্ত (১৮৪৭-১৯১৪) যশোহরের বেন্দা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামনাথ সেনগুপ্ত সচ্চরিত্র ও পবিত্র জীবনাদর্শের জন্য 'সাধু রামনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে যেতে হলে আগে প্রতীক কল্পনা করতে হবে—রামমোহনের বেদান্তাশ্রয়ী একেশ্বরবাদকে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পত্নী গৌরী দেবীও সতীসাধ্বী রমণীর আদর্শ বলে গ্রাম্য নারীসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছিলেন। শোনা যায় তাঁর প্রথম তিন পুত্রের শৈশবে মৃত্যু হলে চতুর্থ পুত্রটির জন্মের পর কোন এক অপরিচিতা মহিলা নবজাতকের সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে বলেন, "ওগো, ওই শিশুটির নাম তোমরা কিন্তু গুরুনাথ রাখিও"। একথা বলেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন, সেই জন্যই বোধ হয় এই শিশুর নামকরণ করা হল গুরুনাথ। সাধকবংশেই গুরুনাথের জন্ম। তাঁর পিতামহ রাজচন্দ্রও সাধক

ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কেউ সংসারে বাস করেও নিঃস্পৃহবৎ অবস্থান করতেন।

বাল্যে বিদ্যাভ্যাসকালে গুরুনাথ অসাধারণ মেধাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা বর্ণমালা, ফলা ও বানান শিখতে শিশু গুরুনাথের মাত্র দেড়ঘণ্টা লেগে-ছিল, পরবর্তী জীবনেও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী গুরুনাথ ন'খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং স্মৃতিসংহিতা থেকে অনর্গল প্রমাণ উদ্ধৃত করতে পারতেন। পাঠশালাতেই তাঁর প্রাণে জ্ঞানলাভের অদম্য ইচ্ছা অঙ্কুরিত হল। আট বছর বয়সেই তিনি পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছ থেকে যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। সেযুগের রেওয়াজ মতো তিনি ন' বছর বয়সে জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্মও (যাকে সেযুগে 'কেতাবতি কর্ম' বলত) বেশ শিখেছিলেন। তারপর অল্প কিছুকাল স্থানীয় সার্কেল স্কুলে পড়াশুনো শেষ করে টোলে ভর্তি হয়ে উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। এখান থেকে তাঁর মাতুলালয় বরিশালের কীর্তিপাশা গ্রামে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত টোলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এই সময়ে পড়াশুনোয় তিনি এমন তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, মাতুলেরা ডাকাডাকি করেও তাঁর সাড়া পেতেন না। পরবর্তী কালে সাধক গুরুনাথ যে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন, তার প্রথম নিদর্শন মেলে তাঁর বাল্যকালে। একাধিক টোলে গুরুনাথ অত্যন্ত গভীরভাবে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে একদিনেই দশদিনের পাঠ প্রস্তুত করে রাখতেন এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বয়সের ছাত্র-দের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতেন। কিন্তু তাঁরা লজ্জা ও বেদনা বোধ করলে তিনি পরে কারও সঙ্গে আর তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। এর পর পারিবারিক সঙ্কটের জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে দু'বছরের জন্য পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়। এর কিছু পরে সাংসারিক অবস্থা মোটামুটি ভালো হলে তিনি আবার স্বগ্রামের সার্কেল স্কুলে পড়তে আরম্ভ করলেন এবং মাত্র চার মাস পড়ে বড়ো বড়ো ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন। চার মাসের মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছিল সম্পূর্ণ পাটীগণিত, ইউক্লিড জ্যামিতির দুই খণ্ড, ইতিহাস, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, রঘুবংশম্, বাংলা সাহিত্য এবং আরও অনেক গ্রন্থ। গণিতে তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালেও কলকাতায় তিনি একজন সুদক্ষ গণিতজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার প্রথম পরিচয় এই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাওয়া গেল।

চার-পাঁচ বছরের পুরাতন ছাত্রদের পরাজিত করে তিনি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। অতঃপর কলকাতায় এসে নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন এবং পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তিও পেলেন। তাঁর লেখাপড়ার জন্য পিতাকে বিশেষ কিছু ব্যয় করতে হয়নি— কারণ বৃত্তির টাকাতেই তাঁর কলকাতার বাসা-খরচ চলে যেত। নর্ম্যাল স্কুলে পড়বার সময় যেমন তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্যে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন, তেমনি গণিতের নানা মৌলিক পন্থা উদ্ভাবন করে শিক্ষকদের বিস্ময় আকর্ষণ করলেন। স্কুল-লাইব্রেরীতে যতগুলি গণিতের বই ছিল তিনি তার সমস্ত অঙ্কই সহজ রীতিতে কষে ফেলেছিলেন। নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ( ১৮৬৭ ) তিনি বিশেষ বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। সেযুগের নর্ম্যাল স্কুলের পাঠ্য তালিকাকে বিদ্যার ছোটখাট গন্ধমাদন বললেই চলে। কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট, মাঘ, ভারবি, ভর্তৃহরি, শ্রীহর্ষ ও জয়দেবের প্রায় যাবতীয় রচনা তাদের পাঠ্য ছিল। তা ছাড়াও ছিল হিতোপদেশ, নীতিশতক, শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক এবং দু' চারখানি খণ্ডকাব্য। ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ, পাণিনি, মুগ্ধবোধ, ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি। অলঙ্কারের মধ্যে সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ, গণিতের মধ্যে লীলাবতী, কোষগ্রন্থের মধ্যে অমরকোষ, মেদিনী, নানার্থধ্বনিমঞ্জরী-একাক্ষরকোষ, ন্যায়-শাস্ত্রের মধ্যে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, ইতিহাস-মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী, আর তার সঙ্গে ছিল কঠ, কেন, বাজসনেয় প্রভৃতি উপনিষদ। এই তালিকা এখন শুধু পড়ে গেলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গুরুনাথ এই সমস্ত বিচিত্র বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করে অধ্যাপকদের কাছ থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। অবশ্য ইংরেজী ভাষায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না। তিনি যদি যথাবিধি ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করতেন তা হলে তাঁর মধ্যে এক বিরল-প্রতিভার কবিমনীষীকে পাওয়া যেত। বিদ্যার্জনের পর ১২৭০ বঙ্গাব্দে বরিশালের গৈলা গ্রামের রামচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা আদরমণি দেবীর সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, গুরুনাথ সহধর্মিণীকে রীতিমতো শিক্ষা দান করে তাঁকে যথার্থ-ই সহধর্মিণী করে নিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ দাম্পত্যজীবন সেযুগের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। গুরুনাথের পত্নীপ্রেম তাঁর রচিত সংস্কৃত শতককাব্য 'পত্নীশতকম্' থেকে বোঝা যাবে।

এরপর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে যুবক গুরুনাথ জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন হলেন, তাঁর প্রতিভা ও মনীষাকে বিদ্যাসাগর, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গণিতজ্ঞ গৌরীশঙ্কর দে, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র— এঁরা বিশেষ মান্য করতেন। সদাসন্তুষ্ট গুরুনাথ বিত্ত ও সম্মানের জন্য কখনও উৎসুক ছিলেন না। বহু লেখকের গ্রন্থ তিনি শুধু সংশোধন করেই দিতেন না, কারও কারও সমগ্র রচনা বাতিল করে নিজেই আগা-গোড়া লিখে দিতেন। সেযুগে অনেক গ্রন্থের তিনিই ছিলেন প্রকৃত গ্রন্থকার। কিন্তু অন্তরঙ্গেরা ছাড়া সে সংবাদ বড়ো কেউ জানত না। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে বিশ বৎসর বয়সে গুরুনাথ আহিরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে গণিত-শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করেন ; ক্রমে ক্রমে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। সে যুগের কলকাতার সারস্বত সমাজে আদর্শ শিক্ষকরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। গুরুনাথ রীতিমতো ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসাধারণ সংস্কৃত জ্ঞানের জন্য কিছুদিন ডাফ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ চালিয়ে দিয়েছিলেন এবং ছাত্রসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর স্কুলের ছাত্ররা কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ও তাঁর কাছে নিয়মিত পাঠ বুঝে নিতে আসত। তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নানা বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষা না জানার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু অনুবাদ ও আলাপাদির মারফতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানও তাঁর অনেকটা আয়ত্ত হয়েছিল। একবার তাঁর স্কুলে একজন রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য নতুন কোন শিক্ষক নিযুক্ত করাও সম্ভব হচ্ছিল না। স্কুলের সম্পাদক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন প্রধানশিক্ষক গুরুনাথ সম্পাদককে বললেন, "আচ্ছা আমাকে পনের দিন সময় দিন ; আমি তৎপরে আপনাকে এবিষয়ে যথোচিত উত্তর প্রদান করিব।" পনের দিনের মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে বাংলা বই অবলম্বনে স্কুলের উপযোগী যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের সামনে ( তার মধ্যে একজন ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান ডিমনস্ট্রেটর ) রসায়ন সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেন। তখন পরীক্ষকগণ বলেন যে, কলেজের উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্ররা, যারা হাতে কলমে রসায়নাগারে পরীক্ষা করে, তারাও এত

ভালো উত্তর দিতে পারত না। গুরুনাথের নেতৃত্বে আহিরিটোলা বঙ্গবিদ্যালয় উত্তরোত্তর বিশেষ উন্নতিলাভ করে এবং কলকাতার এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার অবকাশে তিনি সংস্কৃত ও বাংলায় বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার অধিকাংশই মুদ্রিত হয়নি— হয় পাণ্ডুলিপির আকারে রয়ে গেছে, আর না হয় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মাত্র দুটি-চারটি ব্যতীত তাঁর চিন্তামূলক গ্রন্থ ও কাব্যাদি মুদ্রিত হয়নি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, ইংরেজী না জানলেও স্ব-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধ' পত্রিকায় তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্পর্কে এমন একটি তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যে, স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেটি পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে গুরুনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর গুরুনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতবর্ষে মৌলিক প্রবন্ধ লিখনক্ষম কোনও পণ্ডিত আছেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধলেখক আমার সে ধারণা পাল্টাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মতের কি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে!"

শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধেও গুরুনাথ বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করে ১৮৯৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদককে একখানি চিঠি লিখে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। স্কুল কলেজে বিশেষভাবে বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন।

৩.

সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র এবং বাংলা কাব্যে ও দার্শনিক চিন্তায় গুরুনাথের অসাধারণ অধিকার ছিল। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষা তাঁর মাতৃভাষাবৎ আয়ত্ত হয়েছিল। ইদানীং যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদি রচনা করে সারা ভারতেই যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের তুলনায় গুরুনাথের সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক প্রতিভা কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়, বরং কোনো কোনো দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতসমাজ এখনও মৌলিক সংস্কৃত রচনায় নিরত আছেন। ঐ অঞ্চলে সংস্কৃত গদ্যে রচিত আধুনিক বিষয়ের (যেমন টেলিগ্রাফ) ওপরেও

অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে থাকে। ইদানীন্তন কালে বাংলাদেশের কবি প্রতিভাশালী কোন কোন সংস্কৃত মনীষী রসসাহিত্য সৃষ্টিতে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিলেও সংস্কৃত গদ্যে রচিত মননধর্মী নিবন্ধ-সাহিত্যের ঐতিহ্য-ধারাটি মরা খাতে কায়ক্লেশে বহমান। এদিক থেকে গুরুনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, যা সেযুগের বিদ্বৎসমাজ ততটা লক্ষ্য করেননি, এযুগেও সে সম্বন্ধে সংস্কৃত সমাজে বিস্ময়কর তূষ্ণীম্ভাব দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তিকা ভিন্ন গুরুনাথের অধিকাংশ মৌলিক সংস্কৃত রচনা মুদ্রিত হয়নি। অনুরাগী ও ভক্তসমাজে ঐ সমস্ত সংস্কৃত রস-সাহিত্য জীর্ণ পাণ্ডুলিপির আকারে একযুগে প্রচলিত ছিল। তাঁর কোন-এক বিচক্ষণ ভক্তশিষ্য গুরুর একখানি উপাদেয় জীবনী লিখেছিলেন। তাতেই গুরুনাথের মৌলিক সংস্কৃত রচনাশক্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে। সে নিদর্শন রীতিমতো বিস্ময়কর। সেগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হলে বিদ্বৎসমাজ বুঝতে পারতেন যে, এখনও সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা সম্ভব। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ও সংহিতায় গুরুনাথের ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। ষড়দর্শনে তিনি স্নাতকত্ব লাভ করেছিলেন অবলীলাক্রমে। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে-ধরনের জীব-ব্রহ্মতত্ত্বে একনিষ্ঠ ছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'সত্য-ধর্ম'। জাতি-পাঁতি নির্বিশেষে সকল পিপাসু ব্যক্তিকেই তিনি এই Perennial Philosophy থেকে আত্মার খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করতে আহ্বান করেছিলেন। সাধনমার্গে তিনি এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানী তা শুনলে উচ্চহাস্য করবেন। তবে "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your Philosophy," এই মহাবাক্য স্মরণ করে বস্তুবিজ্ঞানী উপহাস ও উচ্চহাস্য কিছু প্রশমিত করতে পারেন।

গুরুনাথের জীবনীতে তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে তালিকা রীতিমতো বিস্ময়কর। যিনি বাংলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, অর্থাভাবে বহু গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যবস্থা করতে পারেননি, বাইরে থেকে উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও শুধু অন্তরস্থিত সারস্বত আবেগের বশেই তিনি প্রায় একশত সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, কোষকাব্য, গদ্যনিবন্ধ, ধর্মজিজ্ঞাসা, দার্শনিক আলোচনা, ব্যাকরণ, টীকাভাষ্য— এমনকি আধুনিক ইতিহাস লিখে-

ছিলেন। এই সমস্ত রচনার কণিকামাত্র প্রকাশিত হয়েছে, কিছু-বা তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধ' পত্রিকাতেই রয়ে গেছে। এখানে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. 'সত্যামৃত'— এর মধ্যে মোট দশখানি সংস্কৃত নিবন্ধ ও স্তোত্র জাতীয় রচনা স্থান পেয়েছে। যথা— সত্যধর্মঃ, গুণরত্নম্, ধ্যানম্, পাশাষ্টকম্, মুক্তি-জিজ্ঞাসা, অবতারবাদঃ, অদৃষ্টবাদঃ, গুণত্রয়ম্, অভেদজ্ঞানম্। এর মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থে সরল সংস্কৃতে ধর্মকথা ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

২. কয়েকটি দার্শনিক নিবন্ধ— ধর্মঃ, ধর্মজিজ্ঞাসা, প্রণবপ্রশংসা।

৩. দশখানি ব্যাকরণ-আলোচনা-সংক্রান্ত পুস্তিকা— মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্, কৌমার ব্যাকরণম্, ছন্দোরত্নম্, গণরত্নম্, পাণিনিসারঃ, চতুষ্টয়বৃত্তিঃ, আখ্যাত-বৃত্তিঃ, কৌমার সঞ্জীবনী, বৈদিক ব্যাকরণম্।

৪. টীকা ও ভাষ্য— সর্বানন্দতরঙ্গিণীটীকা, ঋগ্বেদটীকা, কাদম্বরীটীকা, মুগ্ধবোধটীকা, আর্যবেদভাষ্যম, কালী-উর্ধ্বাম্নায়, তন্ত্রভাষ্যম্।

৫. 'নিত্যকর্ম'— এর মধ্যে গুরুগীতা (সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ), হেম-পঞ্চকম্, চন্দ্রকান্তপঞ্চকম্, জাতিভেদঃ, শ্বশুরবংশপরিচয়ঃ, একাগ্রতা, প্রচার্যবিষয়াঃ, কালীস্তোত্রম, অষ্টোতরশতস্তোত্রম্, ঈশাষ্টকম্, ব্রহ্মস্তোত্রম্, ব্রহ্মাষ্টকং প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছিল।

৬. ভারতেতিহাসঃ,— এতে সংস্কৃতে ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটি অতি বিচিত্র। এর মুদ্রণ ও প্রচার হওয়া উচিত। এতে ইংরেজ রাজত্বের বর্ণনাই প্রধান। এতে "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ভব এবং পশ্চাৎ ইংরাজ জাতির ভারতে আগমন কাল হইতে পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সরস ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে"।[8] এই ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকে 'ক্লীবচরিত্রম্' (অর্থাৎ ক্লাইভ চরিত্র)-এর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে :

অদ্য দৃশ্যতে যদ্রাজ্যং বিশালং ভারতাহ্বয়ম্।
অস্য মূলং ক্লীবো নূনং ত্রিবর্ণস্যাদিবর্ণবৎ॥
শাস্তারো বহবঃ সন্তঃ শক্তিমন্তঃ সমাগতাঃ।
ভারতে শাসনার্থায় তে পূজ্যা দেববদ ধ্রুবম্॥
মূলং ভারতরাজস্য মহামহীরুহাত্মনঃ।

ইঙ্গলণ্ডোহধীনস্থ ক্লীবো সমরবিশারদঃ ॥

হেষ্টিংসাখ্যো মহাজেতা স্কন্ধঃ স্থূলোহস্য বিস্তৃতঃ।

কর্নবালিস বেলেশ্লি সংজ্ঞৌ তদ্বিটপৌ মতৌ ॥

বিশাল ভারতরাজ্যের মূল 'ক্লীবের' জয়গান এবং হেষ্টিংস কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি শাসকদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় আধুনিক পাঠক কিছু অপ্রসন্ন হতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ইংরেজ আমলের ভারত-ইতিহাসকে যে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা যায়, শুধু এর জন্য লেখক নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন।

৭. মহাকাব্য—শ্রীরামচরিতম্ ও শ্রীগৌরবৃত্তম্।

৮. কাব্য ও খণ্ডকাব্য— বারিদূতম্, বাতদূতম্, মনোদূতম্, পত্নীশতকম্, শিক্ষাশতকম্, ভ্রম-ভ্রমণম্।

এর কোনখানিই মুদ্রিত হয়নি— আমাদের দুর্ভাগ্য। 'শ্রীরামচরিতম্' ছাব্বিশ সর্গে বিরচিত একখানি বৃহৎকলেবর মহাকাব্য। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে লীলাবসান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাহিনী সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। গুরুনাথ এতে বহু বিচিত্র ছন্দের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং বহুস্থলে নিজেই নিজের রচনার টীকা করেছেন। নানা ছন্দ ও বিচিত্র অলংকারের দৃষ্টান্তে আধুনিক কালের বঙ্গভাষী কবি যে কতটা পারদর্শিতা দেখাতে পারেন এই মহাকাব্যই তার প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সর্গ থেকে ক'টি শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে :

চন্দ্রিকাচন্দ্রমহাভিন্নৌ গঙ্গাম্বুযমুনাসুতৌ।
শ্রীগৌরীরামনাথৌ মে পিতরৌ প্রণমাম্যহম্ ॥১
নির্গুণঃ সগুণঃ বক্তুং শ্রীরামচরিতং রতঃ।
বিবক্ষুরিব মূকোহয়ং প্রাপ্স্যতীজ্যজুগুপ্সতাম্ ॥২
আদিবং দীপ্যমানোহস্মিন্ প্রবেশো মেহল্পদর্শিনঃ।
তিমিঙ্গিলানাং সঞ্চারে সফরেস্থব সাগরে ॥৩

* * * *

ক রামচরিতং পুণ্যং ক চ মে তামসী মতিঃ।
উপহাস্য প্রকাশোহয়ং দীপকেনোষ্ণরশ্মিবৎ ॥৬

নয়সর্গে বিভক্তি 'শ্রীগৌরবৃত্তম্' শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী। এটিও মুদ্রিত হয়নি। কবি সংস্কৃত পদের সঙ্গে বঙ্গানুবাদও করে দিয়েছিলেন। একটু নমুনা :

অয়ং নবদ্বীপপুরোদয়াদৌ পূর্ণঃ কলাভিশ্চ স-ষোড়শাভিঃ।

গৌরাঙ্গ-সোমঃ সমুদৈদনঙ্কঃ সন্নাশয়ন্ পাপতমাংসি ভূমম্ ॥

অনুবাদ :

ষোড়শ কলায় পূর্ণ কলঙ্করহিত
শ্রীগৌরচৈতন্যচন্দ্র হইল উদিত।
নদীয়া উদয়াচলে যখন ধরায়
কলুষ তামস নাশ করিয়া ত্বরায়।

গুরুনাথের 'পত্নীশতকম্' (অপ্রকাশিত) কাব্যটি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬) রচিত হয়। তখন তাঁর বয়স উনষাট বৎসর। আদিরসকে ভিত্তি করে নিজ পত্নী আদরমণিকে অবলম্বন করে যে শতককাব্য লিখেছিলেন সেটি একটি দুঃসাহসিক রচনা, কারণ সহধর্মিণীকে রতিরসাত্মক মর্মসঙ্গিনীরূপে বর্ণনা এযুগেও বিস্ময়কর। এ কাব্য রচনাকালে কবি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আদিরসের মারফতে নিজ কান্তার রূপগুণের প্রশস্তি খুবই অভিনব।[৫] কাব্যের শেষে কবি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন :

কান্তে প্রিয়া গুরুচিত্তং গুরুনাথসংজ্ঞং
প্রাপ্য পতিং স্বাভিমতং প্রণয়োজ্জ্বলাঙ্গম্।
যো বর্ত্ততে চিররত স্বয়ি সত্যবদ্ধং
নানাগুণতুলনিধি প্রথিতাত্মপত্ন্যাম্ ॥

কাব্যটি মুদ্রিত হলে সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি মৌলিক শতককাব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হত।

গুরুনাথ তিনখানি দূতকাব্য লিখেছিলেন—'মনোদূতম্' (১৮৯৯ সালে রচিত) 'বাতদূতম্' (১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত), এবং 'বারিদূতম্' (রচনাকাল জানা যায় না)। কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে প্রাচীনভারতে (এমনকি মধ্যযুগেও) দূতকাব্য রচনার ফ্যাশন সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশেও তার অন্যথা হয়নি। আধুনিক কালে গুরুনাথ তিনখানি দূতকাব্য লিখে পূর্বতন ধারারই অনুবর্তন করেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় দুটি তত্ত্বমূলক নীতিমার্গীয় কাব্য, দূতকাব্যের আধারে পরিবেশিত। "অচলপবনকর্ত্রী যোগক্রিয়া" এবং "গুণনিচয়বিধাত্রী-সাধনা"—উভয়ের সম্পর্ক দেখানোই ছিল 'বাতদূতে'র প্রধান উদ্দেশ্য। যোগ-সাধনা, প্রেম, ভক্তি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সাধনপ্রক্রিয়ার কথা বলবার জন্যই কবি ছন্দের সাহায্যে 'বাতদূতম্' লিখেছিলেন। 'মনোদূতম্'-ও মানসিক পরিবর্তনের

ওপর উপস্থাপিত এবং আদ্যন্ত নীতিকথায় পূর্ণ। গোটা কাব্যখানি চিত্তকে সম্বোধন করে লেখা। এ দু'খানি কাব্যে কোন কাহিনী-উপাখ্যান নেই, কিন্তু 'বারিদূতম্' প্রকৃতপক্ষে দূতকাব্যের আদর্শেই রচিত। কালিদাসের 'মেঘদূত'-ই কবির পথপ্রদর্শক। মেঘদূতের মতো এটিও পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ— এই দুই ভাগে বিভক্ত। সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি আদিরসাত্মক করুণবিপ্রলম্ভের নয়। বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসই এ কাব্যের ফলশ্রুতি। উজ্জয়িনীনিবাসী এক ব্যক্তি সন্তানশোকে কাতর হয়ে সাগর-সঙ্গমে একবৎসর কাল বাস করেছিলেন। সমুদ্রের জল গঙ্গাদি নদীপথে দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখে তিনি সেই সমুদ্রবারিকে সম্বোধন করে শোকসন্তপ্ত হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এ কাব্যের বাহ্য অর্থ এরকম হলেও কবি এটিকে দ্ব্যর্থ-বোধক কাব্যরূপেই লিখতে চেয়েছিলেন। অনেক শব্দের রূপকার্থ ও ব্যঞ্জনা এত গূঢ় যে, কবি স্বয়ং কাব্য মধ্যে তার সরলার্থ করে দিয়েছেন। সমুদ্রের জল ভাগীরথী-পথে প্রবেশ করে যে যে শহর বন্দর স্পর্শ করেছে কবি তারও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কলকাতা, চন্দননগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, পলাশি, মুর্শিদাবাদ, গৌড় প্রভৃতি আধুনিক নগরীর বর্ণনায় তিনি খুব বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। কাব্যের পূর্বার্ধে ষোলটি শ্লোকে কলকাতার বর্ণনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, তাতে কলকাতার ঐশ্বর্য যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার কলিতীর্থের তামসী রূপের চিত্রাঙ্কনেও কুণ্ঠিত হননি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে কলকাতার আলো-আঁধারি অভিবন্দনাটি উল্লেখযোগ্য :

কৃত্বা রম্যাং করুণকলিকাতাভিধাং রাজধানীম্
দুর্গৈর্দুর্গাং গহনশরণাং ভীষণাগ্নেয়শাস্ত্রম্।
নানা-শস্ত্রেক্ষণ-ভয়গতেন্দ্রারি যক্ষাদিবর্গাম্
সৈন্যৈঃ পূর্ণাং সমতলগতাং পর্বতাদ্ দুষ্প্রবেশাম্॥
বিদ্যাবদ্ভির্বহুবিধগুণৈর্ভূষিতামদ্বিতীয়াম্
নানাধর্মকুলমতিনরৈর্ভক্তিবিশ্বাসহীনৈঃ।
প্রায়ঃ পূর্ণাং সুমতিবিরলাং মোক্ষবিঘ্নপ্রধানাম্
নানা মর্ত্যাম্ বহুলকুলটাং সৎকুলাটাং সুশোভাম্॥
বাহ্যে কার্যে বিগতবয়সাং যৌবনাস্তেরতানাম
ধর্মে চার্যে চপলমানসাং তৎপুনস্ত্যানিনাঞ্চ।
সর্ৈব্যাপ্তা মণিসমমুখারাবরুদ্ ভিক্ষুপূর্ণাম্

ভৈক্ষ্যাঽভাবাদ্ রুদিতবহুলাং বাহুভাব প্রদীপ্তাম্ ॥

* * * *

নারীরূপৈঃ সুষমবপুষং বালরূপৈ র্জ্বলন্তীম্

বীরাকারৈঃ প্রজলিতভয়াং বৃদ্ধভাবৈঃ প্রশান্তাম্ ।

তুষ্ণীভূতাং খলু জড়তয়া যন্ত্রজালৈঃ সশব্দাম্

একাং নানাবিধাবিধিময়ীং চিত্রসৃষ্টিং বিধাতুঃ ।

কবির বহু রচনার মতো এই কৌতুহলোদ্দীপক রচনাটিও প্রকাশিত হয় নি।

'ভ্রমভ্রমণম' কাব্যখানি কতকটা *Comedy of Errors*-এর মতো। বোধহয় গুরুনাথ বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' ( ১৮৬৯ ) পাঠে ঐ ধরনের একখানি কাব্য লিখতে উৎসাহিত হন। ছয় সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে আকার সাদৃশ্য হেতু বিভ্রমের কৌতুককর বর্ণনার অনুরূপ হাস্যময় রচনা বোধহয় পুরাতন কালের সংস্কৃত সাহিত্যেও বেশী নেই। সংস্কৃত কাব্যকবিতা ও গদ্য রচনায় তিনি বহু সময় ব্যয় করেছিলেন, লিখেও ছিলেন প্রচুর। কিন্তু তার অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা এখন মন্থর হয়ে এসেছে। সংস্কৃত গদ্যে মৌখিক রচনা এখন বড়ো একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। জনবল্লভতা সুদূর পরাহত জেনেও গুরুনাথ সংস্কৃত রচনায় নৈষ্ঠিকতা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় এই বিপুলকলেবর রচনার যৎসামান্য মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু যে গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তাঁর সংস্কৃত বিদ্যার খ্যাতি ভারতব্যাপী হতে পারত, সে সমস্ত গ্রন্থ পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ উদ্যোগী হলে বাঙালী-প্রতিভার একটি বিরল দৃষ্টান্ত সর্বভারতীয় ভারতীসত্রে উপস্থাপিত করা সম্ভব হবে।

৪.

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গুরুনাথের নিবিড় যোগ ছিল। সংস্কৃতের তুলনায় তাঁর কিছু বেশী বাংলা গদ্য নিবন্ধ, কাব্য ও স্তোত্র মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রচারলাভ করেনি। অনেকগুলি গ্রন্থ আবার তাঁর তিরোধানের অনেক পরে প্রকাশিত হয়। জীবিকার জন্য তাঁকে পাঠ্যপুস্তক ধরনের বহু পুস্তিকা লিখতে হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলি অপরের নামে প্রচারিত। ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, গণিত, শিশুপাঠ্য কবিতা, জ্যামিতি— এমন কি

বর্ণপরিচয় পর্যন্ত জীবিকার তাড়নায় তাঁকে লিখতে হয়েছে। অবশ্য তত্ত্বদর্শন ও গবেষণামূলক রচনায় তিনি অধিকতর তৃপ্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। 'তত্ত্বজ্ঞান', ন্যায়দর্শনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাস, টীকাকার মল্লিনাথ, বাল্মীকি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি মৌলিক বাংলা প্রবন্ধ হয় পাণ্ডুলিপির আকারে রয়ে গেছে, আর না হয় দু-একখানি পত্রিকায় ( 'রত্নাকর,' 'জ্ঞানদায়িনী,' 'তত্ত্ববোধ,'[৬] 'উপাসনা' )[৭] আত্মগোপন করে আছে। বাংলা কাব্য রচনায়ও তাঁর কিছু অধিকার ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ বাংলা কাব্য-কবিতা পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়ে গেছে, যৎসামান্য সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য সেগুলি মূলতঃ অধ্যাত্মজীবন ও নীতি-উপদেশ সম্পর্কিত। বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য হিসেবে মাত্র একখানি কাব্য ছাড়া ( 'বীরোত্তর কাব্য'— ১৮৮৩ ) তাঁর আর কোন কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

'বীরোত্তর কাব্য' ( ১৮৮৩ ), 'সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য' ( ১৮৯২ ), 'কমলিনী মহাকাব্য' ( ১৮৭৭ ) ( 'নলিনী' শীর্ষক উপন্যাস ) এবং 'তত্ত্বজ্ঞানসঙ্গীত', 'তত্ত্বনীতিসংগ্রহ'— এগুলি তাঁর কাব্য-কবিতা। মধুসূদনের বীরাঙ্গনাদের পত্রের ( 'বীরাঙ্গনাকাব্য' ১৮৬২ ) উত্তর হিসেবে তিনি 'বীরোত্তরকাব্য' প্রকাশ করেন ১২৯০ বঙ্গাব্দে ( ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে ) আহিরিটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবার ঠিক একবছর পরে এ কাব্য প্রকাশিত হয়। এর আর কোনো সংস্করণ হয়নি। 'সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য' ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ( ১৮৯২ ) রচিত হয় এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধ' পত্রিকায় প্রথম দুটি সর্গ প্রকাশিত হয়, বাকি সর্গগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 'কমলিনী মহাকাব্য' আঠার সর্গে বিরচিত হয়; ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে এর রচনা সম্পূর্ণ হলেও অনেক পরে, ১৩০৭ সালে গুরুনাথ-সম্পাদিত 'রত্নাকর' পত্রিকায় এর প্রথম দুই সর্গ মুদ্রিত হয়। অবশিষ্ট সর্গগুলি পাণ্ডুলিপির আকারে ছিল এবং পরে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। গুরুনাথ ১৩০৩ সনে সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অতি সংক্ষেপে পয়ার ছন্দে রচনা করেছিলেন বালক-বালিকাদের জন্য, ঐ সনেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর তিরোধানের অনেক পরে ( ১৩৪৬ ) 'অদ্ভুত উপাখ্যান' নামে একটি আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি সাধনসঙ্গীত 'তত্ত্বজ্ঞান-সঙ্গীত' নামে ১৩৩২ সনে প্রকাশিত হয়, ১৩৫০ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়াও তত্ত্বজ্ঞান, ন্যায়দর্শনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এবং নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র নীতি-উপদেশ, ধর্ম-দর্শন-সাধনা সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য ও গভীরতাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ একপ্রকার ধর্মসাধনার সঙ্গে জড়িত একটি অধ্যাত্মমার্গ ও জীবনচর্যার প্রচারক, বহু শিষ্যসেবিত সাধক গুরুনাথ নানা প্রসঙ্গে অজস্র ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধনপন্থা ব্যাখ্যা করে অনেক তত্ত্বনিষ্ঠ দার্শনিক প্রবন্ধও লিখেছেন। সংস্কৃতের তিনি আজীবন অনুরাগী ও প্রচারক হলেও বাংলাভাষাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বাল্যকাল থেকেই বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা প্রয়োজন তা তিনি পুনঃ পুনঃ লিখেছেন।[৮] প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের বাংলা ভাষা শেখান হবে তাই নিয়ে তখন বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। একমতে ইসলামি বাংলা, আর একমতে ঢাকাই বাংলা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা। এই প্রসঙ্গে গুরুনাথ বিশুদ্ধ সাধু রীতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক ভাষা পরিহার করে ক্লাসিক বাংলা গ্রহণের জন্য যুক্তিসহ অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর মতে তৎসম-শব্দ-প্রধান বাংলাই হবে বাঙালীর সাহিত্যের ভাষা। তিনি মনে করতেন :

"ভারতের সর্ব প্রদেশেই তত্তৎ দেশীয় ভাষায় সংস্কৃতমূলক বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহারের আধিক্য একান্ত প্রার্থনীয়। কেন না, অশিক্ষিত মূর্খগণ ব্যবহৃত অপভ্রষ্ট ভাষা যতই বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রদেশীয় ভাষার পুস্তক হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকিবে, তত্তৎ স্থানে সংস্কৃত শব্দ যতই লব্ধাধিকার হইবে, ততই আমরা সকলে পরস্পরের মনোগত ভাব অনয়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। ধর্ম ও ভাষার ঐক্য ব্যতিরেকে কোনও দেশে কোনও সময়ে একতাবন্ধন হইতে পারে না।...... এক্ষণে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমীপে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন পূর্বোক্ত কারণ সমূহ নিবন্ধন সংস্কৃত শব্দবহুল বঙ্গভাষার সমাদর করেন, তাঁহারা যেন কোনও জেলার বা শ্রেণীর ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ ভারতের অকল্যাণের নিদানস্বরূপ অপভ্রষ্ট ভাষার বাহুল্যের প্রচলনে যত্নবান না হন।"[৯]

অধুনা ভাষা নিয়ে মাথা-ভাঙাভাঙির যুগে তাঁর কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুনাথের মধ্যে যে একজন রসভাবার্দ্র কবি বাস করতেন, ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মচিন্তার নৈষ্ঠিকতা সত্ত্বেও যে তাঁর কবিত্বশক্তি চাপা পড়েনি,

কয়েকখানি বাংলা কাব্যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্য তাঁর সব রচনাগুলি সমান রসোত্তীর্ণ হয়নি, অনেক কাব্যের যৎসামান্য মাত্র তাঁর শিষ্যদের গোচরে এসেছে। সুতরাং এ বিষয়ে পুরোপুরি বিচার করতে যাওয়াও ঠিক হবে না। তবু পুরাতন রীতিতে কাব্য রচনায়, এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও যে তাঁর বেশ নিপুণতা ছিল এবং ছন্দে-অলংকারে বিশেষ অধিকার ছিল তা স্বীকার করতে হবে। এখানে বাংলা কাব্য-কবিতায় তাঁর পদচারণা সম্বন্ধে দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাচ্ছে।

৫.

গ্রন্থাকারে গুরুনাথের দু'খানি বাংলা কাব্য প্রচারিত হয়েছিল— একটি 'বীরোত্তর কাব্য', আর একটি সাধনসঙ্গীত-সংগ্রহ— যার নাম 'তত্ত্বজ্ঞানসঙ্গীত'। অন্য কাব্যকবিতার অধিকাংশই পাণ্ডুলিপির আকারে ছিল, পরে নিখোঁজ হয়েছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। মাইকেল সুভদ্রাহরণ কাব্য লিখবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন।[১০] কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। গুরুনাথ মধুসূদনের বিশ বৎসর পরে 'সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য' রচনা করেন ( ১৮৯২ ) এবং 'তত্ত্ববোধ' পত্রিকায় ( ১৮৯৪-৯৫ ) এর প্রথম দুটি সর্গ মুদ্রিত করেন। বাকি সর্গগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর যেটুকু মুদ্রিত হয়েছে, তাতে নিপুণভাবে মধুসূদনের রচনার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। কল্পনাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন :

কি আর বলিব তোমা ত্রিদিবসুন্দরি,
বেদব্যাস-পদছায়া আশ্রয়ি, এ জন
মধুর[১১] মধুর তানে গাইবার তরে
করেছে বাসনা, সুভদ্রাহরণ-গীত ;
কিন্তু, কি শকতি না পেলে দয়ায় তব
সাধিতে মানস ? মানসসরসে তুমি
ফুল্ল কমলিনী, মধুদান চিরব্রত
তব, এ দীনে সে মধুদানে পাল ব্রত
নিজ, যথা সমীরণ শৈত্য-সুধা দানে
নিদাঘপীড়িত সরে পালেন সতত,

কিম্বা, কৃপাময়ী রমা বিতরি রতন
করেন সধন যথা দীনহীন জনে।

'সুভদ্রাহরণ' ও 'কমলিনী' কাব্য দু'খানি প্রকাশিত হলে তাঁর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে জীবনীকারের বিমুগ্ধ বচনের[১২] যাথার্থ্য বিচার করা সম্ভব হত। 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত' ১৩০৩ সালে মুদ্রিত হয়। এটি একটি বালপাঠ্য ক্ষুদ্র কাব্য, সরল পয়ারে রচিত। ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন। উভয় মহাকাব্যের কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ভক্তমহলে 'তত্ত্বজ্ঞানসঙ্গীত' শীর্ষক (১৩৩২ সনে প্রকাশিত) ভজনগীতিকাসংগ্রহ সুপ্রচলিত। এতে সাধনতত্ত্ব, আচার, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে সূক্তির ধরনে ছোট ছোট কবিতা আছে, যার অনেকগুলি কাব্য-রসের চেয়ে তত্ত্বের দিকে বেশী ঢলে পড়েছে। উত্তরকালে লোকগুরু ও শিষ্যবৎসল গুরুনাথ এ গানগুলি লিখেছিলেন শিষ্যদের মোহ দূর করবার জন্য। সুতরাং এগুলি শুধু কাব্য হিসেবে বিচার্য নয়। তাঁর একখানি কাব্য 'বীরোত্তর কাব্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথার্থ স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে আগস্ট রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে, 'মেঘনাদবধ' রচনার পর তিনি 'সিংহল-বিজয়' কাব্য লিখবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন— রাজনারায়ণের উপদেশে। তার কিছু পূর্বে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'উষাহরণ' কাব্য লিখবার জন্য কবিকে অনুরোধ করে-ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন রাজনারায়ণের উপদেশে 'সিংহল-বিজয়' লিখতে প্রস্তুত হন এবং বন্ধুর কাছে উক্ত আখ্যানটি জানতে চান। এরপর তিনি 'সিংহল-বিজয়' আরম্ভ করলেও ২০-৩০ পংক্তি লেখার পর সে কাব্য স্থগিত রেখে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন। প্রথমে তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এগারখানি পত্রিকা লিখেছিলেন। আরও দশখানি পত্রিকা যোগ করে একুশ পত্র বা একুশ সর্গে এ কাব্যটি সমাপ্ত করবেন এই রকম মনে করেছিলেন।[১৩] কিন্তু 'বীরাঙ্গনা-কাব্যে' সেই এগারখানি পত্রিকাই মুদ্রিত হয়েছিল (১৮৬২), বাকি দশখানি পত্রিকা লিখবার অবকাশ পাননি। মাত্র পাঁচখানি পত্রিকার[১৪] (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী) যৎসামান্য রচনা করেছিলেন। রোমক কবি 'পাবলিয়াস্ ওভিদিয়াস ন্যাসোর (খ্রীঃ পূঃ ৪৩-খ্রীষ্টীয় ১৭ অব্দ) *Heroides*-'এর আদর্শেই যে তিনি বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিকল্পনা করেন তাতে কোন

সন্দেহ নেই, অবশ্য চিঠিপত্রে বা অন্য কোথাও এই প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলেন-নি। ওভিদিয়াস ন্যাসের কাব্য থেকে কাব্যপরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ভাবাদর্শের অনেকটাই তাঁর নিজস্ব। মধুসূদনের এই কাব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু পরিকল্পনা ও রচনারীতির জন্যই নয়, অন্তঃপ্রেরণার জন্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশের পর কাব্যটির মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যের জন্য একাধিক কবি এই ধরনের পত্রকাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন।[১৫] তাঁদের মধ্যে গুরুনাথ সেনগুপ্তের 'বীরোত্তর কাব্য'ই (১২৯০) সার্থক অনুসরণ বলে গণ্য হতে পারে।[১৬]

গুরুনাথের ছত্রিশ বৎসর বয়সে 'বীরোত্তর কাব্য' প্রাকশিত হয়। তখন তিনি আহিরিটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এর পূর্বে তাঁর আর কোনো রস-সাহিত্য শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যাচ্ছে না। এর ন বছর পরে (১২৯৯) অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সুভদ্রাহরণ' নামে যে মহাকাব্যের সূচনা করেছিলেন তাতে পূর্বসূরী মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন :

অম্লান বঙ্গীয় জন-মনঃ-কোকনদে
মধুরূপে মধু, তুমি চিরবিরাজিত ;
অন্তকালে নিরন্তর জ্বলিত অন্তরে
তব যে বাসনা ( নির্বাণ-উন্মুখ দীপে
দীপিতে বাসনা যথা ), হে মধু, যেমতি
অস্তাচল গুহাগত তিমিরহারক
মন্দিরের অন্ধকার-নাশ অভিলাষ
সাধিতে, দানেন তেজঃ সূত্রসার দীপে,
তেমতি এ ক্ষুদ্র জনে রৌদ্র-তেজ দানে
পুরাও সে আশা তব, পুরাও আমার,
আনন্দিত কর কবি, বঙ্গ জনগণে,
আনন্দিত করে যথা মনের আনন্দে
সুরভঙ্গে সুগায়ক সুললিত গান
বাজায়ে বীণার তান-মান-লয় যোগে।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এগারখানি পত্রে নায়িকাদের অভিযোগ, অভিমান, প্রেমের আবেগ প্রভৃতি বিবিধ মনোভাব নায়কসমীপে যে-ভাবে ও

ভঙ্গীতে প্রেরিত হয়েছে, গুরুনাথ 'বীরোত্তর কাব্যে' নায়কদের জবানিতে তারই সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর লিখেছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে পরম প্রাজ্ঞ কবি প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র ও ভাবভঙ্গী সবই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে মধুসূদনের এ কাব্যের পরিপূরক হিসেবে জবাব লেখা অন্যের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছিল। মধুসূদন সংস্কৃত পুরাণ, নাটক ও মহাকাব্য থেকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে-সমুজ্জ্বল নায়িকাচরিত্রকে অবলম্বন করে তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসে আধুনিকতার সৌরভ ভরে দিয়েছিলেন। ওভিদিয়াসের পত্রকাব্য তাঁর আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু শুধু রীতিটি তিনি রোমান কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন। চরিত্র বর্ণনায় তিনি প্রায়ই পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেছেন। একমাত্র 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় পৌরাণিক ঘটনার ব্যতিক্রম করে তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রেমকে কামনারাগে রঙিন করে এঁকেছেন। অন্যান্য পত্রিকার কোনো কোনটিতে কিছু কাল্পনিক প্রসঙ্গ থাকলেও পুরাণের ঐতিহ্যকে প্রতিকূল মনোভাবের দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণীর পত্রিকাখানি ঘনিষ্ঠভাবে পুরাণের অনুসরণে লেখা। শুচিতায় ও স্নিগ্ধতায় এ পত্রিকাটি পৌরাণিক ঐতিহ্যের পাশে সগৌরবে স্থান পেতে পারে। কবি গুরুনাথ মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র এগারখানি পত্রিকার এগারখানি উত্তর লিখেছিলেন।[১৭] নাম দিয়েছিলেন 'বীরোত্তর কাব্য'। বলাই বাহুল্য তাঁরও অবলম্বন অমিত্রাক্ষর ছন্দ— মাইকেলের ছন্দের যথাসাধ্য অনুকরণ।[১৮]

গুরুনাথ পুরোপুরি মধুসূদনের রীতি, ছন্দ ও আদর্শ অনুসরণ করেছেন। 'বীরাঙ্গনার' মতো 'বীরোত্তর'ও একাদশ সর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক পত্রের গোড়াতেই মাইকেলের মতো গদ্যে প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। মোটামুটি এই উত্তরগুলিতে মধুসূদনের পত্রের প্রাসঙ্গিকতা আছে। মধুসূদনের নায়িকারা নায়কদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, গুরুনাথের নায়কেরা যেন সেই চিঠির উত্তর দিচ্ছেন— এইভাবে সমগ্র কাব্যটি রচিত হয়েছে। কবির কোনো কোনো নায়ক মধুসূদনের নায়িকার পত্রের পংক্তি উদ্ধৃত করে তার যথাবিহিত উত্তর দিয়েছেন। গুরুনাথ পুরাতন 'স্কুলের' কবি, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না। উপরন্তু তিনি প্রাচীন আদর্শের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন ; নিজেও বিশেষ অধ্যাত্ম মার্গের উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু 'বীরোত্তর

কাব্যে' যে ধরনের আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে প্রশংসাই করতে হবে। মধুসূদন "সোমের প্রতি তারা" পত্রিকা 'বীরাঙ্গনা'র অন্তর্ভুক্ত করাতে সমালোচকদের অনেকের কাছেই তর্জিত হয়েছিলেন। কারণ এতে একদিকে যেমন নিষিদ্ধ প্রেমের কথা আছে, তেমনি আছে অকারণে পুরাণ-বিচ্যুতি। গুরুনাথের 'তারার প্রতি সোম'-এর পত্রিকায় কিন্তু কোনোরূপ রক্ষণশীলতা বা চারিত্র-শুচিতার উল্লেখ নেই। বরং তিনি মধুসূদনের আদর্শই অনুসরণ করে সোমকে যথার্থ প্রেমিক করে তুলেছেন— হোক সে দূষিত প্রেম। গুরুপত্নীর প্রতি আসক্ত সোম তারাকে নিজের দুদশা সম্বন্ধে লিখেছেন :

কমলনয়নে, অয়ি সুচারু-হাসিনি,
ও মুখপঙ্কজে যবে স্মরি মনোমাঝে
তখনি হৃদয়কারী অরির বন্ধন
ভাবে লজ্জারজ্জুচয়ে, করে বিসর্জন
গভীর কলঙ্ক-পঙ্ক-মগন-শঙ্কায়
হায় রে অমনি, কৃতজ্ঞতা-মুকুতায়
ফেলে আস্ফালিয়া— অতুল জগতে যাহা।
ধায় যে কমল-বনে যথা তাবারূপে
বিরাজে নয়নতারা কমলিনী ধনী,
হায় রে, যথায় রহে দেহান্তর মাঝে
এ দেহ পিঞ্জরপাখী ; প্রেয়সি, হা ধিক,
গুরুপত্নী তুমি, কেমনে এ পাপমুখে
বলিনু এ বাণী এ পাপ রসনাবশে
লিখিনু কেমনে হায়, লিপির মাঝারে ?

গুরুনাথ অসঙ্কোচে সোমের নিষিদ্ধ প্রেমকে কাব্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শাস্ত্রজ্ঞ গুরুনাথের শাস্ত্রজ্ঞান প্রবল হয়ে সহজ কবিত্বকে গ্রাস করতে পারেনি, এজন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য 'শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তে'র পত্রে তিনি মূল নাটকের আদর্শটি অনুসরণ করেছেন। দুর্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত তাঁর পূর্ব-পরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি। এই পত্রে গুরুনাথ আদর্শ বজায় রেখে দুষ্মন্ত্যের পত্রে কিছু নির্মমতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। শকুন্তলার পত্রে-বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই দুষ্মন্ত অস্বীকার করেছেন এবং কালিদাসের দুষ্মন্তের

মতো শকুন্তলাকে ব্যঙ্গই করেছেন :

হায় রে, কোকিলা জানে কত চতুরতা
না শিখে অপর কাছে, জগতে বিদিত—
পরের ঘরেতে রেখে নিজ সুত-সুতা
অবাধে বেড়ায় ভবে, তাহে এ মানবী—
চতুর কুশিক-মনোনন্দন-নন্দিনী,
কেন না শিখিবে হায়, হেন চতুরতা ?

কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গুরুনাথ এই পত্রে সেই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তাই পূর্বকাহিনী-বিস্মৃত দুষ্মন্ত মুনিকুমারের হাতে শকুন্তলার চিঠি পেয়ে বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ হয়েছেন :

কে তুমি, কে শকুন্তলা, জানি না জীবনে,
পড়ে লিপি ক্ষণকাল মুনি মুখপানে
চাহিয়া রহিনু, ভাবশূন্য— দরশনে,
অশনি-আহতসম অচল শরীরে।

অন্যান্য পত্রে গুরুনাথ মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা'র প্রাসঙ্গিকতা যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। অবশ্য দু'এক স্থলে তাঁকে মধুসূদনের আদর্শ মানতে হলেও খুব খুশি-মনে তিনি তা মানতে পারেননি। 'বীরাঙ্গনা'র দশরথের প্রতি কৈকয়ীর পত্রে রামায়ণের বিরুদ্ধকল্পনা থাকলেও গুরুনাথ মধুসূদনের ঐ আদর্শ পরিত্যাগ করতেও পারেননি, 'কৈকয়ীর প্রতি দশরথ' পত্রের পাদটীকায় গুরুনাথ এই মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন : "মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ স্থলে রামায়ণ-বিরুদ্ধ কল্পনার অনুসরণ করিয়াছেন, এইজন্য উত্তর-লেখককেও কষ্টসৃষ্টে ঐ কল্পনা স্বীকার করিয়া উত্তর লিখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, মাইকেলের রামায়ণ-বিচ্যুতি তিনি মানতে পারেন নি, কিন্তু 'বীরোত্তরে'র পত্রে 'বীরাঙ্গনা'র পত্রের সঙ্গতি রাখার জন্য মাইকেলের পন্থাই অনুসরণ করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দও তিনি বেশ আয়ত্ত করেছিলেন, অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে কিছু বেশী তা স্বীকার করতে বাধা নেই। অবশ্য 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দের নিখুঁত পারিপাটা গুরুনাথের পত্রগুলিতে ততটা পাওয়া যাবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকের কথা বলি। এ কাব্য পৌরাণিক ধারায়

অন্তর্গত হলেও গুরুনাথ দু'এক স্থানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। আহিরিটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করার সময়ে বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাবে গুরুনাথ নিজে বিজ্ঞান শিখে বিজ্ঞান পড়াতে আরম্ভ করেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। গণিতে তাঁর বরাবর বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। অনেক সময় তাঁর পুরাতন ছাত্রেরা, যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ত, তারাও উচ্চতর গণিতের সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছে এসে জটিল অঙ্ক বুঝে নিত। তারা তাঁকে উচ্চতর বীজগণিতের ইংরেজী অঙ্কপাত বাংলায় বুঝিয়ে দিত, তিনি অতি সহজেই তার উত্তর করে দিতেন। সাহিত্য চর্চা করলেও বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বরাবর ছিল— অথচ ইংরেজী ভাষা জানতেন না বললেই চলে। সে যাই হোক তাঁর নবলব্ধ বিজ্ঞানবোধের কিছু পরিচয় 'বীরোত্তর কাব্যে'ও পাওয়া যাবে। চতুর্থ সর্গে কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ বলেছেন :

কেনা জানে, গুণবান আদিত্য থাকিতে
অন্ধজনা পায় রাজ্য রবিকুলরীতি ?
আ মরি, তপন যবে গগন শোভন,
শোভে কি তখন বিধু ? অথবা, ললনে,
তাড়িত আলোকপাশে বায়ব আলোক ?

পাদটীকায় স্বয়ং কবি শেষ পংক্তিটির এইভাবে টীকা করেছেন, "তাড়িত আলোক —ইলেকট্রিক লাইট ( Electric light ) ; বায়ব আলোক— গ্যাসের আলোক ( Gas light )।" সদ্য-অর্জিত পদার্থ বিজ্ঞানের তাপ-আলোকের অধ্যায়টি উল্লেখ করতে কবি ভোলেননি। অবশ্য দশরথের পক্ষে ইলেকট্রিক লাইট ও গ্যাস লাইট সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব ছিল কিনা তা কবি ভেবে দেখেননি।[১৯]

শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের পত্রে লক্ষ্মণের উক্তিতেও আধুনিক বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে বলছেন :

কে না জানে, সমুজ্জ্বল অল্প তাপ-যুত
অঙ্গার-জ্বলন-শিখা, উদজান জাত
( অতিশয় তাপময় ঈষত উজ্জ্বল )
শিখাচয় হতে ?

পাদটীকায় এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "অঙ্গার ( কার্বন গ্যাস ) দগ্ধ করিলে যে শিখা জন্মে, তাহার জ্যোতি অধিক, কিন্তু উত্তাপ অধিক নহে,

আর উদজান ( হাইড্রোজেন গ্যাস ) জ্বালাইলে যে শিখা উৎপন্ন হয়, তাহার জ্যোতি অধিক নহে, কিন্তু উত্তাপ অতিশয় প্রখর।" আর একখানি পত্রিকায় ('দ্রৌপদীর প্রতি পার্থ') কবি **Spirit lamp** অর্থে 'সৌর দীপশিখা' শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। সুরাসার থেকে উৎপন্ন হয় বলে স্পিরিটের প্রতিশব্দ করেছেন 'সৌর'। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এ শব্দটি গ্রহণযোগ্য—লক্ষ্মণের মুখে ত্রেতাযুগে এই শব্দের ব্যবহার কিছু কালানৌচিত্য দোষদুষ্ট হতে পারে ( সেযুগে 'সৌর দীপশিখা'র প্রচলন না থাকলেও সুরার ঢালাও ব্যবস্থা ছিল ! )। উনিশ শতকে বিজ্ঞানের নানা বিস্ময় যে কীভাবে নব্য-বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল, তা এই প্রবীণ কবির পুরাণাশ্রয়ী 'বীরোত্তর কাব্য' থেকেই বোঝা যাবে। অবশ্য গুরুনাথ এই পত্রকাব্যের সর্বত্র মধুসূদনের মতো ঔদার্য ও সহানুভূতির পরিচয় দেননি। আর্য রামায়ণে শূর্পণখা রাক্ষসীকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে মধুসূদন 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'র পত্রে সে রীতি অনুসরণ করেননি। কামে-প্রেমে ব্যাকুল শূর্পণখার অন্তরে তিনি একটি তৃষ্ণার্ত নারী-হৃদয়ের সন্ধান করেছিলেন। কিন্তু গুরুনাথ রামায়ণের সংস্কার ভুলতে পারেননি। 'তাই শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণে'র নৈতিক কর্তব্যাকর্তব্যবোধ বড় বেশী উগ্র হয়ে উঠে শূর্পণখার প্রতি কবির সহানুভূতি বিনষ্ট করেছে। মধুসূদনের শূর্পণখা পত্রে লক্ষ্মণকে 'প্রাণেশ্বর' ও 'প্রাণসখে' বলে সম্বোধন করেছিল। কিন্তু গুরুনাথের কুলগর্বিত ও নীতিবাদী লক্ষ্মণ বিধবার প্রণয়[20] প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন :

কি আশ্চর্য ! 'প্রাণেশ্বর' 'প্রাণসখে' বলি
সম্বোধিতে বিম্বাধরে, বিধবে অপরে
বাধে না বারেক হায় অধরে তোমার ?
লিখেছ মালতী সনে নিজ তুলনায়,
বুঝিনু এখন বালে, কারণ তাহার,
অলিকুল প্রেমমধু করে পান তবু,
মলয় নায়করূপে কেলিপরায়ণ
তব সনে, তবে কেন বহুল-ভোগিনি,
ভানু পানে চাহ পুনঃ অসম সাহসে ?

গুরুনাথ বহু স্থলে মধুসূদনের মনোভাব ধরতে পারেননি, তার অধিকারীও ছিলেন না। সে যাই হোক, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও

বেশ সহজভাবেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখে গিয়েছেন, মধুসূদনের কলাকৌশলও মন্দ আয়ত্ত করেননি। অবশ্য মধুসূদনের রচনার মতো গাম্ভীর্য ও লালিত্য তাঁর রচনায় তত্টা নেই, সম্ভবও নয়। কোন্ মর্ত্যচারী ভ্রাম্যমান পথিক উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে গতিবেগে পাল্লা দিতে পারে? গুরুনাথের 'সুভদ্রাহরণে'র খুব সামান্য অংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল— এর সম্পর্কে পাঠকের ধারণা ভাসা-ভাসা, কিন্তু 'বীরোত্তর কাব্য' পূর্ণাঙ্গরূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পাঠ করে কবির বিচক্ষণতার প্রতি আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কাব্যটির বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

গুরুনাথের বাংলা গদ্যরচনার কথা আগেই বলা হয়েছে। নানা বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে গেলেও তাঁর এই সমস্ত মূল্যবান গদ্যনিবন্ধের অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ রচনায় তাঁর গৌরব স্মরণীয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাস-সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনাটি বাংলা নিবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়ে গেছে অথবা বিনষ্ট হয়েছে। এই গদ্যপ্রবন্ধ বিচার করলে তাঁকে একজন উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক বলেই গণ্য করতে হবে, ধর্মোপদেশ-সংক্রান্ত তাঁর কিছু কিছু রচনা পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে একযুগে ধর্মগুরু বলেই শ্রদ্ধা করা হত।[২১] বহু মুমুক্ষু ব্যক্তিকেই তিনি অধ্যাত্মমার্গ দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজেও দিব্যসাধনায় ডুবে থাকতেন। শিষ্যদের লক্ষ্য করে প্রদত্ত উপদেশ, চিঠিপত্র, নিবন্ধ প্রভৃতি থেকে তাঁকে শুধু ক্রান্তদর্শী ঋষিকল্প ব্যক্তি বলেই মনে হয় না, আধুনিক ধর্মান্দোলনে তাঁরও যে একদা একটা গুরুতর ভূমিকা ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। প্রচারের অভাবে, তাঁর যথার্থ পরিচয় আজ নিষ্প্রভপ্রায়। গুরুনাথের উদার অসাম্প্রদায়িক[২২] মানব জীবনকেন্দ্রিক ব্রহ্মবাদ উনিশ শতকের বাঙালীর বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসাকে অভিনব দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছে। বেদান্তের ওপর ভিত্তি করলেও আচার অনুষ্ঠানকে তিনি সাধ্যসাধন থেকে বাদ দেননি এবং প্রতীকোপাসনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেননি।[২৩] আমরা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করি বটে, কিন্তু এই একই পথের পথিক গুরুনাথের কথা ভুলে থাকি, এটি একটি গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বহু শিষ্যের কাছে 'দেব-মানব' বলে গৃহীত গুরুনাথের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে আকস্মিক ভাবে। ১৩২১ সনের ২ জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুরের গোয়ালগ্রামে জনৈক শিষ্যের বাড়ীতে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। রাত্রি দুটোর সময় ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে শিষ্যের বাড়ীর কিয়দংশ উড়ে যায় এবং চারপাশের ঘরদালানের প্রভূত ক্ষতি হয়। গুরুনাথ যে-ঘরে রাত্রি যাপন করছিলেন সে ঘরও ভেঙে পড়ে এবং তার ফলে তাঁর তৎক্ষণাৎ জীবনাবসান হয়।

পরবর্তীকালে অসংখ্য শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তের হৃদয়ে গুরুনাথের স্মৃতি পবিত্র হোমাগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে ধর্মোপদেষ্টা, গুরু ও সাধকরূপে তাঁর গূঢ় পরিচয়ের অনেকটা অনুদ্‌ঘাটিতই রয়ে গেছে। কবি, প্রাবন্ধিক ও মনস্বী লেখক গুরুনাথের সারস্বত প্রতিভার সবটা কি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ?

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. এই জীবনীর নাম 'সত্যধর্মপ্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ'। লেখক বোধহয় তাঁর কোন শিষ্য। গ্রন্থে লেখকের নাম বা প্রকাশের তারিখ নেই।

২. সম্প্রতি প্রকাশিত সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের 'সাধুতপস্বী'তে ( ২য় ) গুরুনাথের অধ্যাত্ম সাধনা সম্পর্কে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. কবি তাঁর 'পত্নীশতকম্' কাব্যে বলেছেন :

গ্রন্থান্ পরান্ বহুবিধান দ্বিশতার্ধ সংখ্যান্
নির্মায় নির্জন গৃহে চিরকালমাস্তে।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি সংস্কৃতে দ্বিশতার্ধ অর্থাৎ একশখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

৪. 'সত্যধর্ম প্রচারক দেব-মানব মহাত্মা গুরুনাথ,' পৃঃ ১৭৪

৫. এই সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "অন্য নারীর ( সে নারী কাল্পনিক বা বাস্তবই হউন ) রূপগুণ বর্ণনাবহুল অসংখ্য কাব্য পৃথিবীতে রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বকীয় পত্নীর বিষয় আশ্রয় করিয়া এইরূপ কাব্য রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় অভূতপূর্ব— কবি গুরুনাথই বোধ হয় এ বিষয়ে

পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক।...... যাঁহাদিগের এরূপ ধারণা আছে যে, মহোন্নত মহাপুরুষেরা রতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন বা হইতে পারেন না, এই কাব্য পাঠে তাঁহাদের সে ভ্রম ও অপনোদিত হইবে" ( 'মহাত্মা গুরুনাথ' পৃঃ ১৬০ )

৬. 'তত্ত্ববোধ' নামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে তিনি একখানি মাসিক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এতে তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'নরাধমের জীবনচরিত' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরাধম ব্যক্তির জীবনীও অধ্যয়নযোগ্য, সে কথা প্রমাণের জন্য তিনি এই প্রবন্ধের অবতারণা করেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে তাঁর মন্তব্যটি কৌতূহলোদ্দীপক : "নরোত্তমদিগের ন্যায় নরাধমদিগের চরিত্র পাঠ করাও কর্তব্য। নতুবা চরিত্রপাঠ সাঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, অতি উত্তম ও অধম চরিত্র ব্যক্তিদিগের জীবনে কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেই সাদৃশ্য জ্ঞান না থাকিলে অধমকে উত্তম বা উত্তমকে অধম বোধ করিয়া অনেকে ভ্রান্ত হইতে পারেন। সেই ভ্রান্তি সামান্য অনিষ্ট-কারিণী নহে।...... নরাধমের চরিত্র পাঠে আরও দুইটি উপকার হইতে পারে। প্রথমতঃ মানুষ চেনা যায়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লোকের প্রকৃতি এই যে, দুটি একটি আশ্চর্য ঘটনা, যাহার জীবনে দেখিতে পায়, তাহাকেই মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করে। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে।" ( জীবনচরিত থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২৫৫ )

৭. ১৩০০ সনে মাসিক আকারে প্রকাশিত 'রত্নাকর' পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'জ্ঞানদায়িনী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হলেও এটি তিনি প্রকাশ করতে পারেননি।

৮. 'মহাত্মা গুরুনাথ, পৃ ৯৬

৯. ঐ, পৃঃ ৯৯-১০০, ১০১-১০২

১০. মধুসূদন এই কাব্য সম্পর্কে মাত্র কয়েক পংক্তি রচনা করেছিলেন—

তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু সুভদ্রাসুন্দরী ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।

১১. অর্থাৎ কবি মধুসূদন।

১২. "হায়! যদি মহাত্মা গুরুনাথ বিরচিত সুভদ্রাহরণ ও কমলিনী নামক

মহাকাব্যদ্বয় যথাসময়ে লোকলোচনের গোচরীভূত হইত তাহা হইলে কবি গুরু-নাথ এতদিনে বাঙ্গালা আদি মহাকাব্য রচয়িতা না হউন অন্ততঃ অন্যতম মহা-কাব্য স্রষ্টা বলিয়া যশঃ ও গৌরব ভাজন হইতে পারিতেন।"— 'মহাত্মা গুরুনাথ, পৃঃ ১৯১-১৯২

১২. "But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i. e. Heroic Espistles from the most noted puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty one Epistles, and I have finished eleven These are being printed off, for I have no time to finish the remainder." ( মধুসূদনের পত্র ).

১৪. 'মধুস্মৃতি' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম 'ভীমের প্রতি দ্রৌপদী' নামে আর একখানি পত্রিকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ( দ্রষ্টব্য : মধুস্মৃতি ; ৩য় সংস্করণ, পৃ-২২৩ )

১৫. রামকুমার নন্দীর 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' ( ১২৭৯ ), প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাঙ্গনা কাব্য,' রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গাঙ্গনা কাব্য,' যাদবা-নন্দ রায়ের 'বীরসুন্দরী' (১৮৮৪), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পত্রাষ্টক কাব্য' (১৮৯২), প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্রষ্টব্যঃ ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতি-হাস', ২য় খণ্ড, ১৩৫০, পৃঃ ১৯৮)

১৬. আখ্যাপত্র— বীরোত্তর কাব্য / অর্থাৎ / বীরাঙ্গনা-কাব্যে লিখিত পত্রিকা সমূহের / উত্তর / আহীরীটোলা-গভর্ণমেণ্ট-সংক্রান্ত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক / শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। সন ১২৯০।

১৭. এগারখানি পত্রিকার তালিকা : শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত, তারার প্রতি সোম, রুক্মিণীর প্রতি দ্বারকানাথ, কেকয়ীর প্রতি দশরথ, শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ, দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুন, ভানুমতীর প্রতি দুর্যোধন, দুঃশলার প্রতি জয়দ্রথ, জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু, উর্বশীর প্রতি পুরুরবা, জনার প্রতি নীলধ্বজ।

১৮. কাব্যের ভূমিকায় কবি বলছেন, "মধুসূদন বঙ্গীয় কবিকুলের শিরোমণি ; বিশেষতঃ, মনোহারিণী বীরাঙ্গনা তদীয় কবিত্ব-যৌবন-সম্ভূত। এজন্য আশা করিয়াছিলাম যে কবিহৃদয়সুলভ সদ্‌গুণাবলী-ভূষিত কোন মহাত্মা বীরাঙ্গনার উত্তর স্বরূপ কোন একখানি কাব্য রচনা করিয়া উত্তরপাঠার্থী জনগণের

কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া এবং কতিপয় বন্ধুর অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, আমি মাদৃশ জনের সুদুঃসাধ্য এই দুরূহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।"

১৯ সেযুগের কোন কোন সমালোচক এ কাব্যে বিজ্ঞানের উপমা ব্যবহার প্রশংসাই করেছিলেন। 'ব্রহ্মাণ্ড বাজার' শীর্ষক সাময়িক পত্রিকায় 'বীরোত্তর কাব্যে'র প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল, "বীরোত্তর কাব্য-লেখক গুরুনাথ বাবু একজন প্রধান কবি, তিনি স্বপ্রণীত কাব্যে রসায়ন শাস্ত্র-সংক্রান্ত অলঙ্কারগুলি সুচারুরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া বঙ্গীয় ভাবী কবিদিগের এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" মাহাত্মা গুরুনাথ ( পৃ-১৮৭ ১৮৮ )

২০. গুরুনাথ বোধহয় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমর্থন করতেন না, যদিও বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বিদ্যাসাগরও তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন। কিন্তু উচিত বোধ হলে তিনি বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বর্ণপরিচয়ের অনুরূপ 'প্রথম পাঠ' নামে তিনি এক-খানি শিশুপাঠ্য পুস্তিকা লেখেন। তাতে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে'র দোষ দেখিয়ে লিখেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রণালীতে বর্ণপরিচয় রচনা করেছিলেন, তাহাতে র্, ঋ এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে যে কি আকার হইবে তাহা বলিবার অবকাশ পান নাই। শুভঙ্কর দাসও ঐবিষয়ে ঐরূপ। অথচ নিঋত নৈঋত প্রভৃতি পদ সংস্কৃতের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষায় বহু-পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের আরও অনেক দোষ আছে, উহা ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণে বাহ্য চাকচিক্য সম্পন্ন বটে, কিন্তু উহার অন্তঃসার অত্যল্প।" ('মহাত্মা গুরুনাথ,' পৃঃ ২৩৬)

২১. তাঁর সম্বন্ধে মুখে মুখে এমন সমস্ত অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে যে, সে-যুগে তাঁকে ভক্তেরা কী দৃষ্টিতে দেখতেন তা সহজেই বোঝা যাবে। তাঁর জীবনীতে এই ধরনের বাইশটি 'সিদ্ধায়িতা' বা অলৌকিক শক্তির উল্লেখ এবং একাশিটি অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা আছে ( উক্ত জীবনীর ৩৯২ থেকে ৪৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য )।

২২. তাঁর 'সত্য ধর্ম' শীর্ষক তত্ত্বগ্রন্থে (১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) বলা হয়েছে :

নাত্র শুদ্ধতমে ধর্মে সাকারাণামুপাসনা।
ন জাতিভেদনিয়মো যোগিনাং নাস্তি সাধনম্॥

লয়ো ন সম্মতশ্চাস্মিন্নাত্মনঃ পরমাত্মনি।

মোক্ষস্য কারণং জ্ঞেয়ং কেবলং জ্ঞানসাধনম্ ॥

অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ ধর্মমতে সাকার উপাসনা নেই, জাতিভেদ নেই, যোগসাধন নেই, নির্বাণ নেই। কেবল গুণসাধনকেই ( অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক স্বভাবধর্ম ) মোক্ষের কারণ বলে জানবে। 'গুণরত্নম্' ( ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ) পুস্তিকায় তিনি বলেছেন ঃ

আর্যা-ম্লেচ্ছা-দুরাচারাঃ সদাচারা মহার্ধিয়ঃ

দুর্ধিয়াশ্চাপি সর্বেহত গুণানাং সাধনে ক্ষমাঃ ॥

অর্থাৎ আর্য, ম্লেচ্ছ, দুরাচার, সদাচার, বুদ্ধিমান ও দুর্বুদ্ধি লোক—সকলেই এই গুণসাধন করতে পারে।

২৩. তাঁর 'তত্ত্বজ্ঞান' গ্রন্থে 'জ্ঞানসাধনা'র বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

# হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৮৬২-১৯৩৮

কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট বলেছেন যে, প্রতি এক শ' বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। কালাতিক্রমণের সঙ্গে সাহিত্যের রসরুচি ও জনপ্রিয়তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক শ' বছর কেন, পঁচিশ বছর আগে এদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের যে রকম ধারণা ছিল, আজ তার অনেকটাই আমূল বদলে গেছে। একদা যিনি জনপ্রিয়তার জ্যোতির্লোকে সমাসীন ছিলেন, আজ তিনি বিস্মৃতির তিমির-গর্ভে অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। বোধ করি জনবল্লভতার নগদ বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় দেবার পালাগান জড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে এই রকম একটি নাম মনে পড়ছে— তিনি গতকালের অতি পরিচিত লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। আধুনিক পাঠকের কাছে এ নাম পরিচিত নয়, অথচ এখন যাঁরা প্রবীণ, একদা তাঁরা হরিসাধনের গল্প উপন্যাস নিয়ে কি রকম মেতে উঠতেন, তার কথা হয়তো কারো কারো মনে পড়বে। বিশ-ত্রিশ বছর আগে হরিসাধনের গল্প, উপন্যাস, রোমাঞ্চ আর ঐতিহাসিক রমন্যাস ( অর্থাৎ কিনা রোমান্স ) পড়েনি, সে যুগে এমন পাঠক দুর্লভ ছিল। সেই সমস্ত কৈশোরের ছায়াঘেরা রমণীয় দিনগুলি কার না মনে পড়ে। বিচিত্রদর্শন গাঢ় সবুজ মলাটের ব্যাকরণ কৌমুদীর নলচে আড়াল দিয়ে রোমান্সের ধূম্রজালবিস্তারী হরিসাধনের মুঘল হারেমের রহস্যরোমাঞ্চঘেরা কাহিনীর কল্পলোকে বিচরণ করার কথা সহজে ভোলা যায় না। খোজা-নর্তকী-বাদশা-বেগম-শাহজাদা-শাহজাদীদের সহস্র-এক-রজনীর বিচিত্র কাহিনী, বিরহমিলনের ঠাসবুনানি আর প্রত্যাশিত ও পরিতৃপ্ত আনন্দানুভূতি হঠাৎ যেন একযুগের বিখ্যাত লেখককে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে এ যুগের ভ্রূকুঞ্চিত পাঠকের দরবারে হাজির করে দেয়।

পল্লী-বাংলা ও শহর-কলকাতার গার্হস্থ্যজীবনের সুখ-দুঃখের গল্পগুলি সে যুগের তরুণবয়স্ক পাঠকপাঠিকাকে যে কিভাবে সম্মোহিত করেছিল, এ যুগের নবীনের দল তা বুঝতে পারবেন না। শুধু গল্প পড়ার প্রতি সরস আকর্ষণ এ যুগের পাঠক হারিয়ে ফেলেছেন। বার্নার্ড শয়ের প্রগলভ উক্তির অনুসরণ করে

হয়তো কেনো পাঠক বলবেন যে, আমরা কি এখনও খোকাখুকুর খেলাঘরে আছি যে, আখ্যানে আখ্যায়িকা চাইব? এখন কত জীবনযন্ত্রণা। সমাজ, ব্যক্তি রাষ্ট্র, চেতন ও অবচেতন মনের পাকানো জটিল জট খুলতেই আমাদের প্রাণান্ত। এখন কি গল্পশোনার মানবশৈশবে আছি? ঠিক কথা। কালধর্মে যুগধর্মের পরিবর্তন হয়। সে যুগে গল্প চাইতাম, এ যুগে মনোবিকলনের তত্ত্বকথা চাইছি। অতি-সম্প্রতি চাইছি 'চেতনা প্রবাহ', যা নাকি "যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই"। সে যুগে আখ্যানের নানা জটিলতা চাইতাম, এ যুগে কথা-সাহিত্যে জীবনসমস্যার প্রতিফলন চাইছি। এ রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। তবু কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে পরম প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ মনটাও কেমন যেন শৈশব-সন্ধ্যায় ফিরে যায়। সেখানে পৌঁছে হরিসাধনের পাত্র-পাত্রীদের ঘটনাজটিল আখ্যানের রোমাঞ্চকর প্রাঙ্গণে আমরা নিজেও একটি চরিত্রে পরিণত হই।

জলভরা যুঁইফুলের বোঁটায় সামান্য বাদলা হাওয়া লাগলেই যেমন টুপটাপ করে জলবিন্দু ঝরে পড়ে, তেমনি স্মৃতির বৃন্তে একটু নাড়া লাগলেই অর্ধশতাব্দীর আগেকার কথা মনে পড়ে যায়— সেই গোলাপী রেশমী কাপড়ের মলাট, মলাটের ভিতরে তুলতুলে প্যাড, সোনালী অক্ষরে ছাপা "নূরমহল", "রঙমহল", "শীশমহল"। লেখক— হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। তলায় সোনার জলের মনোগ্রামে প্রকাশকের নাম লেখা। তোরঙ্গ প্যাঁটরা গোছাতে গিয়ে, অধুনা যিনি প্রবীণা গৃহিণী হয়েছেন, বাক্সের তলা থেকে তাঁর হাতে আসে হরিসাধনের "সতীলক্ষ্মী" উপন্যাস। সেই ১৯১৬ সনের কোন এক ফাল্গুন মাসে শুভ পরিণয় উপলক্ষে কার যেন দেওয়া উপহার— 'প্রাণাধিকা শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবীর করকমলে সাদর প্রেমোপহার!' সেদিনের সেই নবীনা সলজ্জ বধূটি আজ পঞ্চাশোর্দ্ধা প্রবীণা— সংসার, কর্তা আর ব্লাডপ্রেসারের চাপে জেরবার এবং সদাই বিরস। বাক্স গোছাতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য তিনি কি আত্মবিস্মৃত হয়ে ১৩১৬ সনের কোনো-এক বাসন্তীসন্ধ্যার জাতিস্মর মুহূর্তে ফিরে যান! কৈশোর-যৌবনের কত স্মৃতি-বিস্মৃতিই না জড়িয়ে আছে হরিসাধনের এই উপন্যাসখানার সঙ্গে।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ( বাংলা ১২৬৯, ভাদ্র ) হরিসাধনের জন্ম হয় বাংলাদেশে এক নৈয়ায়িক বংশে। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস শান্তিপুর হলেও লেখকের পিতা গিরীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্মব্যপদেশে খিদিরপুরের ভূকৈলাসে ও পরে বেহালায় স্থায়ী-

ভাবে বসবাস করেন। এই খিদিরপুরেই হরিসাধনের জন্ম হয়। তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনের চিন্তায়, চাকরীর গলরজ্জু গলায় ধারণ করে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেন। ১৯০৮ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বৈশাখ মাসে পরিণত বার্ধক্যে এক যুগের অতিশয় জনপ্রিয় লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের শ্যামবাজারের বাসভবনে দেহান্ত হয়।

দীর্ঘজীবী হরিসাধন উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের তিন দশক— প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে নানা ধরনের উপন্যাস ও 'রমন্যাস' লিখে সে যুগের পাঠকের চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তী যুগের মধ্যে সংযোগসেতু। বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র— এঁরা সারস্বত তীর্থের তীর্থপতি ; কিন্তু হরিসাধনও যে অনেক দিন ধরে পাঠকমনে বেঁচে ছিলেন তা স্বীকার করতে হবে। সাহিত্যে বেঁচে থাকার অর্থ পাঠকমনে বেঁচে থাকা— হোক না সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে ক'জন সাহিত্যিকই-বা চিরস্থায়িত্বের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

হরিসাধনকে আজকের পাঠক ভুলে গেছে। নবযুগের অভিনবত্বের চাবুক খেয়ে অধুনাতন পাঠক আজ আর পিছন ফিরে তাকায় না। 'শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও'— এই তো তার একমাত্র জপমন্ত্র। এখন 'রঙ্গমহল', 'শীশমহল' আর 'নূরমহলের' ঐতিহাসিক রোমান্স ও ইতিহাস-আশ্রিত রূপকথাগুলিকে কেই-বা মনে রাখে! হরিসাধনের বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ "কলিকাতা— এ কালের ও সেকালের ইতিহাস" সত্যই বিরাট— ডিমাই সাইজের হাজার পাতার ওপর। আজকের দিনের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ রম্যরচনার যুগে এই অতিকায় টিটানের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা কারই-বা অভিপ্রেত? দুর্লভ বইয়ের শেষ আশ্রয়-এ কালের কলকাতার বেড়ার গায়ে মলাটছেঁড়া সে-কালের কলকাতা মলিনমুখে কোনো-এক অধ্যাপক বা গবেষক-ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করে। যুগ-ধর্মের বশে রুচির খোলনলচে পালটে গেলেও, একদা হরিসাধন যে রোমাঞ্চকর গল্প পরিবেশন করে পাঠকসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, প্রচুর আনন্দ-কৌতূহল সঞ্চার করেছিলেন, সে কথা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি পাঠকসমাজের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।

## হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

তেইশ বছর বয়সে হরিসাধনের প্রথম লেখা 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'নবজীবনে,' ১২৯১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায়। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থের এই হল সূত্রপাত। প্রবীণ বয়সে যিনি রোমান্টিক প্রেমের গল্প উপন্যাস লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছিলেন, তরুণ বয়সে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল ঐতিহাসিক তথ্য ও কাহিনীর দিকে। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে: "ধ্বংসতরু বা নন্দকুমারের ফাঁসী ও কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট" নামক তথ্যপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয়। ঠগী দমন আর এক মূল্যবান রচনা। ইতিহাসের প্রতি তাঁর চিরকাল আকর্ষণ ছিল। তারই ফলে কলকাতার বৃহত্তম ইতিহাস রচিত হল। লেখক-জীবনের প্রথম দিকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর উপদেশ, নির্দেশ ও স্নেহ লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'প্রচার' পত্রের সম্পাদক। ইনি হরিসাধনের ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখে তাঁর কী ধারণা হয়েছিল, তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক:

> "আমি সেই সৌম্যমূর্তি, প্রতিভার জীবন্ত আদর্শ, সাহিত্যসম্রাটের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বঙ্কিমবাবুর পরিধানে একখানি পট্টবস্ত্র, গায়ে একখানি গরদের নামাবলী— বোধ হইল যেন 'ভবানী পাঠক' কিংবা 'সত্যানন্দ' আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।"

একবার হরিসাধন 'প্রচার' পত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্কিম তরুণ লেখকের প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে বলেছিলেন, "আগাগোড়া পড়েছি। লেখায় বেশ research আছে। কিন্তু ফুটনোটে অত reference দিয়েছ কেন?"

লেখক একটু সাহস করে বললেন, "আমরা নূতন লেখক। যদি কেউ বিশ্বাস না করে, এই জন্যে—"

বঙ্কিমচন্দ্র এর কি জবাব দিলেন? তিনি সজোরে বললেন, "কি! নিজের personality-তে তোমার বিশ্বাস নাই? যে পারে, সে তোমার লেখা contradict করুক। তখন তুমি তোমার নজীর দেখাও।" লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি সত্য শিক্ষা করেছিলেন,— আত্মবিশ্বাস, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র personality বলেছেন। হরিসাধন কলকাতার সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন, সে তো শুধু নীরস ইতিহাস নয়, যেন কোন্ অচিনপুরীর রূপকথা। তাঁকে এর জন্য প্রচুর

তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। অনেক সময় তথ্যের স্বল্পতা কল্পনার দ্বারা পুরিয়ে নিতেও হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্র তিনি তথ্যের উৎস অর্থাৎ reference দিয়ে গেছেন, পাঠকের contradict করবার কোন অবকাশ রাখেননি। তাঁর লেখা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ওঁর লেখা আমি 'নবজীবন' পড়েছি, বেশ হচ্ছে।" বঙ্কিমের উৎসাহে ও নির্দেশে হরিসাধন পরবর্তী জীবনে কলকাতার বিপুলায়তন ইতিহাস লিখলেও এবং সেই গ্রন্থটি আজো আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি কথাসাহিত্যিক রূপেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

ভারতী, সাহিত্য, ভ্রমর, প্রচার, দাসী, প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হরিসাধন সরকারী কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর লিখতে শুরু করলেন। ঠিক যাকে জনপ্রিয় লেখক বলে, হরিসাধন সেই শ্রেণীর লেখকের অগ্রগণ্য ছিলেন। অজস্র লিখেছেন তিনি, অপরিমিত লিখেছেন। যা স্বল্পতর পরিসরে সোনা ফলাতে পারতো, তাই বিশাল ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজনের রবিশস্যের জন্ম দিয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ১৮৮৫ সালে তিনি নিতান্ত তরুণ বয়সে প্রথম লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী ধরে অর্ধশতেরও অধিক গ্রন্থ লেখেন।

তাঁর সমস্ত রচনাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়,— গল্প-উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস ও কলকাতার ইতিহাস। তাঁর পুরোমাপের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় তিরিশ, গল্পের সংখ্যাও কম নয়। সামাজিক, গার্হস্থ্য, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক, রূপকথা— উপন্যাসের যত রকম বিভাগ-উপবিভাগ থাকতে পারে, তার প্রত্যেকটিতে তিনি হাত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ, 'পঞ্চপুষ্প' পাঠে বিভারিজ সাহেব বলেছিলেন্ যে এই গল্প স্কটের সমতুল্য। তাঁর গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'স্বর্ণপ্রতিমা', 'অপরাধিনী', 'কমলার অদৃষ্ট', 'সতীর সিন্দুর' এক সময়ে পাঠক-পাঠিকা-মহলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আখ্যানগুলি প্রতিদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তারই মধ্যে বিচিত্র রোমান্সের স্বাদ এবং পাঠকের অপার কৌতুহল একই সঙ্গে তৃপ্তি লাভ করত। আখ্যানের প্রাথমিক বিবরণী এমন চমকপ্রদ হ'তো যে, কৌহতুল প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই সচকিত হয়ে উঠত।

কলকাতার ইতিহাসের আরম্ভটি কৌতুহলের রসে ভরপুর :

'আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিনের আকাশ প্রথমটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৃষ্টি হইয়া মেঘের বক্ষ শূন্য হওয়ায়, মেঘ সরিয়া পড়িল। আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত পরিষ্কার, অস্তগামী রবির স্বর্ণকিরণ রঞ্জিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিশানওয়ালা চারপাঁচখানি বাণিজ্য জাহাজ গঙ্গার প্রচণ্ড শক্তিশালী ঊর্মিমালার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পাইল ভরে অতি ধীরে ধীরে সুতানুটির দিকে অগ্রসর হইতেছিল…।' এ বর্ণনা শুধু নীরস ঘটনাবিবৃতি নয়, এর প্রতিচ্ছত্রে পাঠকের জন্য অপার বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের রঙ্গনটী কলকাতার শুরু কীভাবে হয়েছে, তারপর কত ঘটনা দুর্ঘটনার সোপান বেয়ে বেয়ে কলিতীর্থ কলকাতা রূপের পসরা সাজিয়ে পথচারীকে আহ্বান করল, তার নিলাজ চটুল লীলাখেলার ছবি আঁকলেন প্রবীণ ঔপন্যাসিক। কৌতূহলকে যদি আমরা নিতান্ত শিশুসুলভ বৃত্তি বলে ত্যাগ করে প্রবীণ পরিপক্ক বনে না যাই, তা হলে আমাদের মনও কোম্পানীর নিশানওয়ালা মনপবনের নাও বেয়ে কোন্ পরীস্থানের দিকে যাত্রা করে।

মুঘল-পাঠানের পটভূমিকায় লেখা তাঁর রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসগুলিই তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান অবলম্বন। 'রঙ্গমহল', 'শীশমহল', 'নূরমহল' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত মুঘলপাঠানের রহস্য-রোমাঞ্চপূর্ণ দীর্ঘ কাহিনীর মাদকরস এখনও সকলের মনে পড়ে। মনে পড়ে 'শীশমহলের' সেই দীর্ঘ গল্পটি— 'তস্‌বীরের মূল্য'। আকবরের একজন তরুণ সেনাধ্যক্ষ— নাম তার ইস্‌কান্দার। একদিন সন্ধ্যাবেলা ইস্‌কান্দার দিল্লীর রাজপথে একজন বৃদ্ধ তস্‌বিরওয়ালীর কাছে একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীর ছবি দেখে মুগ্ধ হ'ল, অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে তস্‌বিরওয়ালীকে ঐ ছবিটির দাম জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধা বলল, "জনাব, এ তস্‌বিরের মূল্য পাঁচ জুতি।"

বিস্মিত ইস্‌কান্দার প্রশ্ন করল, "জুতি মারিবে কে ?"

বুড়ীর উত্তর, "যার তসবির সে।"

বুড়ী তার নামধাম জানে না, সুতরাং ইস্‌কান্দার তার কাছ থেকে ছবির মালেকের কোন সন্ধান বার করতে পারল না। কিন্তু সেই ভুবনমোহিনীর তসবির-খানি ইস্‌কান্দারের সমস্ত আশাভরসা সুখ আনন্দ কেড়ে নিল। তার পর কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, হানাহানি— তবু ইস্‌কান্দার সে ছবিখানিকে ত্যাগ করতে পারল না, আংরাখার অন্তরালে লুকিয়ে রেখে, যার ছবি তার সন্ধান

করতে লাগল। সেই মোহিনীর নাম গুল্‌সানা, বিদ্রোহী পাঠান কেল্লাপতি আবদুল সোহানীর সাধ্বী পত্নী, বীরাঙ্গনা গুলসানা। ইস্‌কান্দারের তীব্র বাসনার উত্তাপে সোহানী মারা গেল, গুল্‌সানা দিওয়ানা হল, ইস্‌কান্দারেরও সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চিরসমাধি রচিত হল। রূপের মোহে ইস্‌কান্দার কর্তব্যে বিচলিত হওয়ার অপরাধে বন্দী হল। পরে গোপনে মুক্তিলাভ করলেও গুল্‌সানাকে সে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলল। দ্রুতগামী একখানি নৌকার ওপরে ব্যর্থ, হতাশ্বাস, ব্যাকুল ইস্‌কান্দার ভাসতে ভাসতে কোন্ দিগন্তের দিকে যাত্রা করল! উপন্যাসের সমাপ্তির শেষপঙক্তিতে সিকান্দার জানিয়ে দিল— "তারপর আমার ভাগ্যে কি ঘটিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে পাঠক দেখিতে পাইবেন।" কৌতূহলী পাঠক তখন এর দ্বিতীয় পর্যায় 'ঋণ পরিশোধ' পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

এই বিচিত্র রোমান্টিক গল্পের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যেন ইস্‌কান্দারের সঙ্গে গভীর রাত্রিতে পা টিপে টিপে মালবের বন্ধুর পার্বত্য পথে রাহি হয়। সোহানীর দুর্গপ্রাকার বেয়ে সকলের অলক্ষিতে রংমহালের ঝারোখার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আধখানা চাঁদের বিবর্ণ আলোকে দুর্গপ্রাঙ্গণ রহস্যময়, চারিদিকে ইরাণী গুল আর নার্গিসের গন্ধ, সিরাজির স্বপ্নাতুর মাদকতা। সহসা ঝারোখার প্রান্তে একটি মুখ ভেসে ওঠে, মতিপান্নায় ঝকমকে একটি অপূর্ব নারীমূর্তি, বিদ্রোহী সোহানীর স্ত্রী ভুবনমোহিনী গুলসানা। ইস্‌কান্দারের বুকের রক্ত তোলপাড় করে, শিরায় শিরায় বেহস্ত্-দোজখের মাতামাতি শুরু হয়ে যায়— সেই তসবিরের মালেক বেগম গুলসানা! লেখক এই রহস্যঘন রোমান্টিকতার স্বপ্নপুরীতে এনে পাঠককে ছেড়ে দিলেন। তাঁর মুঘল-পাঠান যুগের মুসলমান নর-নারীর জীবনকেন্দ্রিক 'ঐতিহাসিক রমন্যাস' গুলিতে পটভূমিকা হিসেবে কোথাও স্বল্পতর, কোথাও-বা গাঢ়তর ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবেশ স্বীকৃত হয়েছে। কখনও কখনও হরিসাধন কেবল দু'চারটি ঐতিহাসিক নাম মাত্র ব্যবহার করেছেন, প্রধান চরিত্র ও মূল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সংস্রব নেই। ইংরেজী 'Romance of History'র মতো এই ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস প্রধান নয়, ইতিহাসের পটে অঙ্কিত সাধারণ নর-নারীর জীবনই অধিকতর কৌতূহলের বস্তু হয়েছে।

তাঁর পারিবারিক উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো জনপ্রিয়তা

লাভ করতে না পারার কারণ— তাঁর সমকালে, তাঁরই আবিষ্কৃত লেখক, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের অধিকতর সূক্ষ্মরীতিতে গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা এবং ঈষৎ পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। উপরন্তু তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সে যে কল্পনার উৎসার ও কাল্পনিক সৌন্দর্যসৃষ্টি গুণ হিসেবে গণ্য হয়েছে, বাস্তব পরিবেশের গার্হস্থ্য উপন্যাসের তাই ত্রুটি বলে প্রতিভাত হয়েছে। বাস্তব জীবনের নর-নারীর মধ্যে আমরা সত্য ও স্বাভাবিক ঘটনার পরিচিত মূর্তি পেতে চাই। তাঁর গার্হস্থ্য উপন্যাসে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের চিত্র আছে। কিন্তু তার উজ্জ্বল বর্ণবিলাসের ফলে প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছ দিনগুলো রোমান্টিক মহিমা লাভ করলেও তার প্রতীতি খণ্ডন হয় বলে পরবর্তীকালের পাঠকসমাজের কাছে তার মূল্য হ্রাস হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসও বিশুদ্ধ 'রিয়েল' নয়, তা পুরোপুরি রোমান্টিক, তবে তাকে 'রিয়েলের রোমান্স' বলা যেতে পারে। আধুনিক পাঠকও রোমান্স চায়, তবে তা আইডিয়ালের রোমান্স নয়, রিয়েলের রোমান্স— যে তুরুপ দিয়ে শরৎচন্দ্র জিতে গেছেন।

হরিসাধন যেমন ইতিহাসের পটভূমিকায় কাল্পনিক আখ্যান লিখেছিলেন, তেমনি কয়েকখানি অর্ধ-ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে "ঔরঙ্গজেব', 'রঙ্গবিক্রম' ও 'আকবরের স্বপ্ন' উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলি সে যুগের ন্যাশনাল থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার প্রভৃতি পেশাদার নাট্যমঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছিল। মগধের রাণী মুরলার কঙ্কনচুরির কাহিনী অবলম্বনে রচিত "কঙ্কনচোর" উপন্যাসটি রাখালদাসের মতে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে তিনি অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ইতিহাসের ক্ষীণ-সূত্রটি বজায় রেখে অবাধ কল্পনাকে যথেচ্ছা ছেড়ে দিয়েছেন, তেমনি এই নাটক-গুলি নামে ঐতিহাসিক হলেও এর প্রধান চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

সবশেষে তাঁর 'কলিকাতা— একালের ও সেকালের ইতিহাসে'র কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। হরিসাধনের পূর্বে অনেক বিদেশী বণিক, পর্যটক ও কর্মচারী প্রাচ্য দেশের শ্রেষ্ঠ নগরী কলকাতার ওপর ছোট বড়ো অনেক গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। হরিসাধন নানা তথ্য ঘেঁটে একহাজার কুড়ি পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কলকাতার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এই বিপুলায়তন গ্রন্থে ইতিহাসের তথ্য আর রূপকথার রূপ, দুই-ই মিশে গেছে।

লেখক আরম্ভ করেছেন ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দের ভাদ্রমাসের ঘোর বর্ষায়

এক রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে। একদল বিদেশী বণিক হুগলী নদী ধরে জাহাজ যোগে সুতানুটি গ্রামের পাড়ে এসে পড়েছে, সামনে আসন্ন রাত্রি, মাথার উপর প্রবল বর্ষণ আর পাড়ের ঝোপঝাড়ে সাপ, বাঘ, বুনো শূয়োর— আরও কত কি! এই দলের নেতা জোব চারনক নামে এক বণিক গঙ্গার অস্বাস্থ্যকর তটে উঠে রাত কাটাতে শঙ্কিত হলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে বললেন, "ভাই সব, বর্ষার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে বাস করা বড়ই কষ্টকর হইবে। চল— আমরা আজকে রাত্রির মত জাহাজে ফিরিয়া যাই, কাল প্রাতে আবার মালমসলা জোগাড় করিয়া নূতন আশ্রয়স্থান সন্ধান করিতে হইবে।" তার পর দিন সুতোনুটীর পূর্বপারে সূর্য উঠলো— ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট। ঝড়জল মাথায় করে শুধু জাহাজের পালে ভর ক'রে আর অটুট মনোবল মাত্র সঙ্গে নিয়ে যে-কটি ইংরেজ বণিক সেদিন হাজির হয়েছিল, তারাই সেই দুর্যোগের মধ্যে ঠিক হাল ধরে রইল, নানা সংঘাত-সংঘর্ষ, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পর সত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যদেবের অস্তগমন নিষিদ্ধ হল। এইখান থেকে আধুনিক কলকাতা শুরু হল, অবশ্য প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-যুগকেও আলোচনা করে নিয়ে লেখক এ গ্রন্থের প্রস্তাবনা করেছেন। অসংখ্য তালিকা, নক্শা, মানচিত্র আর ফটোগ্রাফে শোভিত এ গ্রন্থে কলকাতার বিচিত্র জীবনলীলা বর্ণনায় যে বিপুল পরিশ্রম লক্ষ্য করা যায়, তা ইদানীং রম্যরচনার যুগে ভীতিকর বলেই মনে হবে।

পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একাল ও সেকালের কলকাতার শেষ অধ্যায়টিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে 'পুঁথিতে ডোর' দিয়েছেন। এই সেই কলকাতা— সুতানুটি গোবিন্দপুর চৌরঙ্গীর ঘন জঙ্গল আর কর্দমাক্ত গঙ্গার তীরে অবস্থিত অস্বাস্থ্যকর গ্রাম। রাতে ঠ্যাঙাড়ের হুংকার আর দিনে হুগলীর ফৌজদারের পাইক বরকন্দাজের হাঁকডাক। এ সেই কলকাতা, দিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম পশমের সরগরম কুঠি-কুঠিয়াল, বিকেলে চারঘোড়ার গাড়ীটানা ল্যাণ্ডোয় করে গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ডে সাহেববিবিদের হাওয়া খাওয়া অথবা চৌরঙ্গীর মাঠে গাছতলায় পিস্তল হাতে সাহেবে সাহেবে ডুয়েল লড়া। এ সেই কলকাতা— সকালে ছোট হাজ্রি, দুপুরে আকণ্ঠ লাঞ্চ, আর বিকেলে শবযাত্রা— যার জন্য সায়েবরা একে বলতো 'গলগাথা'— মড়ার খুলির রাজ্য। এ সেই কলকাতা, কিপলিঙ যাকে বিদ্রূপ করেছেন। আবার সেই একই কলকাতায় ভারত জাগরণের সূচনা, মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম, পরিণত

বয়সে তাঁর বিশ্ববিজয়— নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি— "রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে ধ্রুবতারার অধিবাসী"। জলজঙ্গলে অস্বাস্থ্যে ভরা ক্ষুদ্র তিনখানি গ্রাম কেমন ক'রে বিশ্বাকাশে উদিত হলো, হরিসাধন তার কাহিনী রূপকথার রসে ভিজিয়ে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ইতিহাসে হয়েছে কিনা তা ঐতিহাসিকেরা বিচার করবেন, কিন্তু সুদীর্ঘ গ্রন্থটি যে অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই বিচিত্র প্রতিভাধর লেখককে আমরা ভুলে গেছি। আজ তাঁর গল্প কাহিনী হতগৌরব হলেও একদা তিনি বহু মনের আনন্দভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। অনেক পাঠকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন; অনেক রসিকা গৃহিণীকে মোহময়ী দিবানিদ্রার দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এইজন্য সেই যুগের জনপ্রিয় লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় আজও স্মরণীয়।

মু.ধর অধ

র তাঁহাদি

# জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও সুনীতিকুমার

১.

সেটা বোধ হয় ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। তখন আমরা স্কুলের নিম্নের সোপান আঁকড়াইয়া আছি, বয়স বারো-তেরোর বেশী নহে। আমাদের অগ্রজেরা আই. এ. পাশ করিয়া বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন। তাঁহাদের কথাবার্তা হইতে আমরা কলেজ-জীবনের বিচিত্র মুক্তির স্বাদ পাইতাম। ভাবিতাম, কবে সেই বাঞ্ছিত ধামে প্রবেশাধিকার পাইব।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। বৈঠকখানায় আমাদের অগ্রজেরা ঘনীভূত হইয়া বসিয়া কী যেন একটা ব্যাপার লইয়া চাপা উত্তেজিত স্বরে আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা বি. এ. ক্লাসে ক্লাসিকাল বেঙ্গলি (এখনকার ইলেকটিভ বাংলা) লইয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যেন তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, এইরূপ একটা ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী, কবিকঙ্কণ, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ লইয়া বিজ্ঞের মতো আলোচনা করিতেন। একদিন নাকি কী একটা বিষয় লইয়া বাংলার অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত তাঁহাদের একহাত কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছিল। সেদিন আমাদের বৈঠকখানায় তাহারই জের চলিতেছিল। ক্লাসে বাংলা ভাষার ইতিহাস পড়াইতে— স্বতান্ত্র্যভূষণ মহাশয় বেশ জোরের সঙ্গে রায় দিয়াছিলেন— প্রয়াগের পূর্বপ্রান্তে কাহারও শরীরে আর্য রক্তের ছিটেফোঁটাও নাই, বাঙালীর তো নাই-ই। এই ব্যাপারে আমাদের দাদাদের ব্রাহ্মণত্বে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহাদের একজন ক্লাসের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধ্যাপকের মন্তব্যের মৃদু প্রতিবাদ করেন এবং আদিস্থরের দোহাই পাড়িয়া ভক্তিভাজন অধ্যাপক মহাশয়কে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী ব্রাহ্মণদের শিরাধমনীতে আর্য-শোণিত বহিতেছে না, নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ, যাঁহারা এতদিন শাণ্ডিল্য-কশ্যপ-ভরদ্বাজের খুঁট ধরিয়া সযত্নে আর্যত্বের উত্তরীয় বহন করিতেছিলেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে এ-সমস্ত অশাস্ত্রীয় কথা হজম করিবেন?

যাহা হউক, তাঁহারা একগুঁয়ে অধ্যাপককে টলাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের "তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত" বা খেতুরী উৎসবে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র যাহা বলিয়া ("হৃদে যার পৈতা আছে সেই তো ব্রাহ্মণ") কায়স্থসন্তান নরোত্তমকে ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত ঐতিহাসিক উক্তিতে তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা ঘুচিল না। সে দিন তাই তাঁহারা বৈঠকখানায় বসিয়া পূজনীয় অধ্যাপকের মতামতের কঠোর সমালোচনা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন যে, কায়স্থ বিদ্যাভূষণের স্বাভাবিক ব্রাহ্মণবিদ্বেষই ঐরূপ সাংঘাতিক মন্তব্য প্রকাশের দুঃসাহস জোগাইয়াছে। কারণ পঞ্চকায়স্থ পঞ্চব্রাহ্মণের তল্পি বহন করিয়া কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ভূমিতে হাজির হন, সে হীনমন্যতা বিদ্যাভূষণ বোধহয় আজও ভূলিতে পারেন নাই। দাদারা সিদ্ধান্ত করিলেন, কোথা হইতে এমন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে বাঙালী, বিশেষতঃ বাঙালী ব্রাহ্মণেরা যে অরাণ্যক ঋষিদের সাক্ষাৎ বংশাবতংস তাহা সহজেই স্বিরীকৃত হইবে, এবং তাহা হইলেই বিদ্যাভূষণের 'ঘোষযাত্রা' (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'ঘোষ' উপাধিক কায়স্থ) হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে— সেই সঙ্গে তিনিও। তখন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL ছাপাইয়া বিদ্বৎমহলে খুবই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানা সাময়িকপত্রে ইংরাজী ও বাংলায় ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ব্রাহ্মণ-বটু দাদারা তাঁহার বিশাল গ্রন্থের দুইখণ্ড আনাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন কোথাও বাঙালী ব্রাহ্মণের খাঁটি আর্যত্ব সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত আছে কিনা। তাঁহাদের মুখের অবস্থা দেখিয়া আমরা, বালকেরা বুঝিলাম এ সঙ্কট হইতে সুনীতিকুমার তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কথাটা সেই বালকবয়সেই মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। হা হতোহস্মি, আমরা তাহা হইলে আর্যসন্তান নহি? এই যে কুস্তির আখড়ায় গিয়া ডন বৈঠক দিয়া গুড়-আদা সহযোগে ভিজানো ছোলা চিবাইয়া আয়নার সামনে খাড়া হইয়া বক্ষের মাংশপেশীর স্ফীতি মাপি, আর আর্যগর্বে ফুলিয়া উঠি, এ-সব বৃথা হইল! এ-দেহের শিরায় শিরায় মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্যের রক্তের জোয়ার বহিতেছে না? অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নাকি ব্রাহ্মণত্ব-অভিমানী ছাত্রদের সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, বাঙালীর শিরা-ধমনীতে বহিতেছে দাস-দস্যু, নিষাদ-কিরাতের রক্ত। এ জাতি বর্ণসংকর, ব্রাত্য, বৃষল, বন্য। এই জন্য সংস্কৃত নাটকে চোর-ছ্যাঁচোড়, চুয়াড়, গ্রন্থি-

.চ্ছেদক-নীবিচ্ছেদকদের মুখে মাগধী প্রাকৃত দেওয়া হইয়াছে। বড়ো হইয়া সুনীতি-কুমারের অধিকাংশ ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিয়াছি, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছি। সত্যই কি বাঙালী প্রাগ্‌বৈদিক কৃষ্ণকায় দাস-দস্যুর বংশধর, উত্তর-বৈদিক পাথুরেকালো কোলগোষ্ঠিভুক্ত নিষাদ ও পীতাভ মঙ্গল-জাতির ( কিরাত ) সংমিশ্রণে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো একটি মিশ্র জাতি ?

কলেজে প্রবেশ করিয়া দেশ-বিদেশী লেখকদের নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকখানি কেতাব পড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের টানাটানির ফলে ব্যাপার ক্রমেই ঘোলা হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমারেরই শরণ লইলাম। তাঁহার রচনা পড়িয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম, কারণ তাঁহার বক্তব্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সুনীতিকুমার বাঙালীর ব্রাত্য সংস্কার, কোল ( নিষাদ ) ও মঙ্গোলগোষ্টীর ( কিরাত ) সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের মতো অব্যাপারীর পক্ষে যথেষ্ট। অমাদের এই সম্পর্কিত স্বল্প জ্ঞান তাঁহারই ভাণ্ডার হইতে আহরিত হইয়াছে। এই সুযোগে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারিয়া লই।

কিরাত সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহার যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে ( 'Kirata-Jana-Krti', The Asiatic Society, 1974 ), তাহার কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেই বুঝা যাইবে, একটি প্রায়-অনালোচিত বিষয়ের জটিলতা মোচন করিতে গিয়া তিনি কী বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রন্থটি পড়িতে পড়িতে বহু পূর্বে তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত ভারতীয় জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্পকিত নানা কথা মনে পড়িয়া গেল। এখানে তাহারই দুই একটি তথ্য আলোচনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি

২.

ভক্তিভাজন ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে, আলোচনা ও গ্রন্থে বাঙালীর জাতিগত পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার অধিক জানা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার রচনা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাঙালীর জাতিতত্ত্বটি আর একবার ঝালাইয়া লওয়া যাক। বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়-একখানি চটি-

আকারের পুস্তিকায় (*Racial Elements in the Population*, No. 22 Oxford Pamphlets on Indian Affairs) ভারতের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে যাহা বুঝাইয়াছেন, গিলর্ভা লেভি, রমাপ্রসাদ চন্দ, নির্মলকুমার বসু, মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু মতান্তর থাকিলেও তাহা হইতে স্বল্প কথায় বাঙালীর জাতিতত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া যায়।

শুনা যায়, বহু শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষে নিগ্রোদের মতো একটি জাতি বাস করিত। হয়তো আদিনিবাস আফ্রিকা হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা ইরান ও আরবের মধ্যদিয়া ভারতে আসিয়া পৌঁছায় এবং প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়ে। আসামের পূর্বভাগের নাগা জাতি এবং দক্ষিণভারতের অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। তাহারা হয়তো আকারে-অকৃতিতে বানরদের মতো ছিল, মাথার কেশরাজি মেষরোম সদৃশ, উচ্চ হনু, কোটরাগত চক্ষু, গাত্রত্বক ঘন কৃষ্ণবর্ণ— এই দিব্য তনুকান্তি লইয়া তাহারা সমাজ ও সভ্যতার নিম্নতম সোপানে অবস্থান করিত। ভাষা তাহাদের নিশ্চয় কিছু একটা ছিল, কিন্তু তাহার স্পষ্ট কোন নমুনা পাওয়া যায় না। ভারতের অল্পস্বল্প এবং আন্দামান, মালয় উপদ্বীপ, আরও পূর্বে পপুয়া ও নিউ গিনিতে ইহাদের যৎসামান্য চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এদেশে কখনও কখনও এমন দু'একজন চোখে পড়িয়া যায়, যাহাদের আকৃতি কতকটা নিগ্রোদের মতোই। ইহারাই কি পূর্বেকার নিগ্রোবটুদের উত্তর-পুরুষ? এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অতি অল্প তথ্যই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অন্ধকার কক্ষে অনুপস্থিত কালো বিড়াল খুঁজিয়া কী হইবে? তবে সুনীতিকুমার দেখাইয়াছেন, আমাদের এই বামন পিতামহেরা খাবার উৎপাদন করিতে জানিত না, খুঁটিয়া খাইত। আমমাংস ও অনায়াসলভ্য ফলমূলেই উদর পূর্তি করিত, ডুমুর জাতীয় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ইহাদের বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড উপাসনাই পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতায় টটেম আকারে প্রবেশ করিয়াছে। ঈশ্বরের অনুরূপ কোন প্রবল ব্যক্তিকে ইহারা মান্য করিত। বোধহয়, আত্মা অবিনাশী এইরূপ একটা ধোঁয়াটে ধারণাও তাহাদের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছিল। অবশ্য একথাও প্রণিধানযোগ্য, সভ্যতার আদিম প্রত্যুষে, যখন তাহাদের ভাষাই ভালো করিয়া ভাবপ্রকাশক্ষম হইতে পারে নাই, তখন কি নিগ্রোবটুর-দল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ত্ব মগজজাত করিতে

পারিয়াছিল ? বহুকাল পরে আত্মার অবিনাশিতা লইয়া বহু য়ুনানী ও ভারতীয় পণ্ডিত অনেক কাজিয়া করিয়াছেন। কিন্তু বেশ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে কৃষ্ণকায় নিগ্রোবটুরা আত্মার স্বরূপ এত সহজেই হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, ইহাতেই আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে।

ইহার পরে উল্লেখ করিতে হয় আদি-অস্ট্রেলয়েড জাতির, যাহারা এখনও ধ্বংস হয় নাই, ভারত ও ভারতের বাহিরে বিচিত্র ভাষা ও অশনবসন লইয়া দিবা বাঁচিয়া আছে। ইহাদের এক শাখা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া ভারতের দিকে আসিতে আরম্ভ করে। জলপাই-বনে ভরা এই অঞ্চল বহু সভ্যতা ও ভাষার নীড় স্বরূপ। সুতরাং এখান হইতে মধ্যম মাপের লম্বামুণ্ড একজাতি যদি ভারতের দিকে আসিতেই শুরু করে তবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ইহাদের সভ্যতা বোধ হয় প্রত্নপ্রস্তর যুগ পার হইতে পারিয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহারা নিগ্রোবটুদের মতো ভূমি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত, পশু মারিত— শস্য উৎপাদন করিতে জানিত না। কিন্তু ভারতে পশিয়া তাহারা আর্দ্র মাটিতে শস্য ফলাইতে আরম্ভ করিল, হাতী পাকড়াও করিয়া বশ মানাইল। গাছ-পাথরে ঈশ্বরত্ব আরোপ পুরাদমে চলিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের মোদ্দা কথাটা জানিত। আর্যেরা পরবর্তীকালে হয়তো ইহা-দের নিকট ঐ সমস্ত আইডিয়া ধার লইয়া থাকিবে। অতঃপর অনেক পরে ( কত পরে, মাতা বসুন্ধরাই জানেন ) তাহাদের নানা শাখাপ্রশাখা ভারত ছাড়িয়া দক্ষিণে ও পূর্বে মেলানেসিয়া ( কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ )[১] পলিনেসিয়া ( বহু দ্বীপপুঞ্জ )[২] ও ও মাইক্রোনেসিয়ার ( অণুদ্বীপপুঞ্জ )[৩] নানা দ্বীপে কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই দ্বৈপায়ন জাতি বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের বিচিত্র ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। মূল ভাষা প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড বা প্রাচীন অস্ট্রেলয়েড। তাহার দুই শাখা— অস্ট্রো-এসীয় ও অস্ট্রোনেসীয়।

ভারতে, ব্রহ্মে ও ইন্দোচীনে প্রচলিত অস্ট্রো-এসীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাষাগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে— কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর, গড়ব, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 'মন' ও 'মের' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নিকোবরী ভাষা, আসামের খাসি ভাষা, ব্রহ্মের পালোং এবং ওয়া ভাষা, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও দক্ষিণ শ্যামের 'মন' বা তালাইং ভাষা, কামবোডিয়ার মের, কোচিন-চীনের চাম, ইন্দোচীনের স্তেইং, রাহ্নার এবং মালয়ের আকাই

ও সেমাং ভাষসমূহ।

অস্ট্রোনেসীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি উপগোষ্ঠী পরিকল্পিত হইয়াছে :—

(ক) ইন্দোনেসীয়, মালয়ী, যবদ্বীপীয়, সুদানীয়, মাদুরেজীয়, বলীদ্বীপীয়, সাসানীয়, সেলিবিস দ্বীপের ভাষাসমূহ, ফিলিপাইনের তাগালোগা, ইলোকোনা-বিসরন, ম্যাডাগাস্কারের মালাগাজি ভাষা।

(খ) মেলানেসিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ হেব্রাইডিস, ভিটি ও ফিজি দ্বীপের ভাষা।

(গ) পলিনেসিয়ার সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, টংগান, টাহিটি, তুয়ামতুয়া, মার্কুইসার ভাষা, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি ভাষা ও হাওয়াই দ্বীপের ভাষা।

আদি-অস্ট্রিক ভাষার আকার-আকৃতি বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতেই সংগঠিত হয়, পরে দুই হাজার বৎসরের মধ্যেই ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহে এই ভাষার নানা প্রকারভেদ সম্প্রসারিত হয়।

প্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক শাখার কোল-মুণ্ডা জনকে 'নিষাদ' বলা হইত। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, ভিল্ল, কোল্ল। নিরুক্তে নিষাদকে পাপের আধার বলা হইয়াছে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার সংযোগে ইহাদের উৎপত্তি। মাছ ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। রামায়ণে ইহাদিগকে ব্যাধ বলা হইয়াছে। অত্রিসংহিতায় বলা হইয়াছে, ইহারা একশ্রেণীর অধঃপতিত ব্রাহ্মণ— চৌর্য, দস্যুতা ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা কটুভাষী ও মৎস্যমাংসলোভী। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, ইহারা এমন সমস্ত আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিল যাহার জন্য আর্য পিতামহগণ ইহাদিগকে কষিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রাদি হইতে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, সেকালের কোন কোন ব্রাহ্মণসন্তান নিষাদগোষ্ঠীর কৃষ্ণা নারীর প্রবল আকর্ষণে অথবা দড়ি-ছেঁড়া বোহেমিয়ান ব্রাত্যজীবনের প্রলোভনে ভিল্ল-কোল্লের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল। এই নিষাদ বা অস্ট্রিক জাতির বংশধরগণ পরবর্তীকালে দ্রাবিড়-আর্য-মঙ্গোলভাষী জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। অবশ্য কোল-মুণ্ডাগোষ্ঠীর অধিবাসীরা তাহাদের আদিম জীবন-যাত্রা ও ভাষা লইয়া ঝোপজঙ্গল ও পাহাড়ে এখনও কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে। ইদানীং ইহাদের নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করিতেছেন, টাটকা খবর আদায় করিবার

জন্য দেশী ও বিলাতী পণ্ডিতের দল পর্বত কান্তার চষিয়া ফেলিতেছেন। নিষাদগোষ্ঠীর অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, তাহাদের, ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত অনেক তথ্য আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়াছে।

অষ্ট্রিক বা নিষাদের পরেই বোধ হয় দ্রাবিড়ভাষী ('দ্রবিড়', 'দ্রমিড়') ভূমধ্যসাগরীয় জন ভারতে প্রবেশ করে। ভূমধ্যসাগর হইতে ইরান (তখন ইরানের কী নাম ছিল জানি না), এবং ইরান হইতে ভারতে সরিয়া আসে। তাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল নাগরিক সভ্যতা ও ভূমধ্যসাগরীয় কোন অনগ্রসর ভাষা। তাহাদের প্রাচীন ভাষা কি ফিন্নো-উগ্রীয় ধরনের ছিল? সে ভাষা ভারতের প্রাচীনতম তামিল ভাষারও ('চেন-তামিজ') অনেক পূর্ববর্তী। পরবর্তীকালে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় জন নাগরিক সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিল, তাহা ভারতে নানা অঞ্চলের খননকার্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ময়দানব ও রাবণ যদি দ্রাবিড়গোষ্ঠীসম্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহারা যে পাকা দালানকোঠা নির্মাণে এবং নাগরিক সভ্যতার উচ্চ মান নির্ধারণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই? মহাভারতে পাণ্ডবদের সভানির্মাণে ময়দানবের ডাক পড়িয়াছিল। তিনি এমন দক্ষতার সহিত পাণ্ডবদের রাজসভা বানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতারা উজবক বনিয়া গিয়াছিলেন। রাবণ তো সোনারূপা মণিমাণিক্য-খচিত সাতমহলা অট্টালিকায় মহানন্দে বাস করিতেন। এ কালে ভারতের নানা স্থানে খননকার্য চালাইয়া যে সমস্ত লুপ্ত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্রাবিড় সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাগার্য দ্রাবিড় সভ্যতা যথেষ্ট ঐশ্বর্যশালী ও সুগঠিত ছিল। ইহাদের গাত্রবর্ণ মসীকৃষ্ণ, সুতরাং গৌরাঙ্গ আর্যেরা ইহাদিগকে ঘৃণাই করিতেন। ইহাদের নাগরিক সভ্যতা কৃষিজীবী ও অরণ্যচর আর্যদের উপরে টেক্কা দিয়াছিল। যুদ্ধে ইহারা সংহতশক্তি আর্যদের নিকট পরাভূত হইলেও তাঁহারা ইহাদিগকে লইয়া সদাই বিব্রত হইয়া থাকতেন, তাই তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে ইহাদিগকে দাস ও দস্যু বলিয়া গালি দিয়াছেন। প্রাচীন ইরানে পুরাতন পহ্লবী ভাষায় তাহা যথাক্রমে হইয়াছে দাহ্ ও দহ্যু। ভারতে প্রাপ্ত দ্রাবিড়দের প্রাচীন লিপির

এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণমালাতেই লিপিচিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, অক্ষর ও সিলেব্‌ল্ এই আদিম ভাষায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহাও অনুমিত হয়। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লক্ষ্মীর উপাসনা ইহাদের মধ্যেই শুরু হয়, যোগদর্শনও নাকি তাহাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে আর্যদের সংহত শক্তির কাছে ইহারা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, পাঞ্জাব ও উত্তরাপথের সমভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া এই দ্রাবিড়-ভাষী জন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সরিয়া গেল। হয়তো আর্যদের অন্যতম নেতা অগস্ত্য ঋষি কেরলের তাম্রপর্ণী নদীর তীরে কুটির বানাইয়া দ্রাবিড় সমাজে আর্য আচার-বিচার ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। হয়তো রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের সংঘর্ষ আর্য ও দ্রাবিড়দের শ্রেণী ও জাতিগত সংঘাতের রূপক। সে যাহা হউক, পাঁচ-সাত শত বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়ভাষী জন এবং গৌরবর্ণ আর্যভাষীদের 'জান পহ্‌চান' হইয়া গেল। ইহাদের উপর আর্যগণ যতই চটিয়া যান না কেন, দ্রাবিড়দের ভালো ভালো জিনিষগুলিকে ফেলিয়া দিবেন, তাঁহারা এমন মূঢ় ছিলেন না। দ্রাবিড়রাও আর্যদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছে, ক্রমে পুরাতন বিরোধিতাও লোপ পাইয়া গিয়াছে। অবশ্য একালে রাজনৈতিক অবতারদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পুরাতন আর্য-দ্রাবিড় কলহ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-গর্বান্ধ ছাত্রদের ওপর চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙালী আবার আর্য কিসের? তাহারা তো দাস-দস্যু, নিষাদ-কিরাতের বংশধর। কথাটা বেখাপ্পা লাগিলেও নিতান্ত মিথ্যা নহে। তবে আমরা গালির ভৌগোলিক সীমা আর একটু বাড়াইয়া কিঞ্চিৎ নম্র স্বরে বলিতে চাহি যে, ভারতের উত্তরাখণ্ডের 'আর্য বাবাগণ' বিশুদ্ধ রক্তের যতই জাঁক করুন না কেন, আসলে আমরা সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ্ডা খানেক ব্রাত্য-স্তোম যজ্ঞ করিলেও সে কালি ধুইবে না। রবীন্দ্রনাথের 'শক-হুনদল পাঠান-মোগল'-এর সঙ্গে রাঢ়-চুয়াড়-নিষাদ কিরাতদেরও জুড়িয়া দিতে হয়। সুতরাং ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের যজ্ঞসূত্রে আমরা নিষাদ-কিরাতদেরও চৌকি আগাইয়া দিতে বাধ্য। বিরাট 'জাতীয়' কটাহে যে মিশ্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আর্য-দ্রাবিড়-কোল-ভিল-সাঁওতাল-কিরাত— সকলেই সুসিদ্ধ হইয়াছে, এবং

সেই ব্যঞ্জনের নামই 'মহা-ভারত'। আমাদের শিক্ষাগুরু আচার্য সুনীতিকুমার সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।

৪.

দ্রাবিড়ভাষীদের পরে পশ্চিম হইতে গোলমুণ্ডযুক্ত যাহাদের আবির্ভাব হয় তাহাদিগকে আলপীনীয়, দিনারীয় ও আর্মানীয়, এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হয়। ইহারা কবে এদেশে হাজির হয়, বা ইহাদের ভাষাই বা কী ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে এইটুকু মনে হয় যে, ইহারাও ভূমধ্যসাগরীয় জন। বোধহয় দ্রাবিড়ভাষীদের কিছু পরেই ইহারা এদেশে আবির্ভূত হয়। কল্পনাকে আর একটু আগাইয়া লইয়া বলা যাইতে পারে, ইহারা আর্যদের সঙ্গেই আসিয়াছিল, বা সামান্য পরে। ভারতে প্রবেশের পূর্বেই তাহারা আর্যদের সংস্পর্শে আসে এবং আর্যভাষা গ্রহণ করে। নৃতত্ত্বের বিচারে আর্য না হইলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে তাহারা আর্য বনিয়া গিয়াছিল— কালা আদমির সাহেব সাজিবার মতো বোধহয়। একালে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলা-দেশের জনসমূহের মাথার খুলি মাপজোখ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরাই বোধহয় সেই গোলমুণ্ড আর্য-বনিয়া যাওয়া জাতির বংশধর। যাক, আপাতত বাঁচা গেল, বাঙালী নিতান্ত কোল্ল-ভিল্ল-কিরাতের বংশধর নহে। ইহারা কি গ্রীয়ার্সন কথিত 'অন্তেবাসী' (Outer Aryan) আর্য? ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্রের ছিটেফোঁটা, স্থূল-সূক্ষ্ম কায়াসাধনা— এ-সব কি ইহাদের 'অবদান'? ভৈষজ বিদ্যায় পারঙ্গম অথর্ব এবং মন্ত্রেতন্ত্রে পারদর্শী অঙ্গিরা— যাঁহারা অথর্ব বেদের সংকলক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন[৪], তাঁহাদের সঙ্গে এই গোলমুণ্ডওয়ালাদের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা বলা যায় না। বাংলাদেশে তো মন্ত্রতন্ত্র, বিশেষত তন্ত্র ও শাক্ত মতের প্রবল প্রভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

৫.

এবার আর্যদের কথা। এই অংশের আলোচনায় বড়োই গোলে পড়িয়াছি। আমরা বাঙালীরা প্রাচীন মহর্ষিদের প্র-পরা-অপ্-সম্ বংশধর বলিয়া ফুলিয়া বসিয়া আছি। আমাদের গাত্রবর্ণ বেশ ফর্সা-ফর্সা, এমন অপবাদ পরম শত্রুও দিতে পারিবে না। আকারটি কিঞ্চিৎ খর্ব, মাথাটিও ক্ষুদ্র এবং গোলাকার, দেহে

তথাকথিত 'নর্ডিক'ত্বের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালী সন্তানগণ' নিজেদের আর্য বংশধর বলিয়া ধরিয়া লইয়া বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই ছিলাম। হঠাৎ নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব নামক দুইটি ভীমাকার মূষল আমাদের আর্যামির শিরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাসের ঘর যে ভাঙিয়া যায় যায়। যাহা হউক, য়ুরোপীয় আর্যজাতি, যাহারা য়ুরাল পর্বতে তুষারাবৃত বন্ধুর পথ ও তৃণময় শুষ্ক প্রান্তর পার হইয়া, নানা স্থানে ডেরা বাঁধিয়া ও তাম্বু তুলিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের রক্তের ছিটেফোঁটাও কি বঙ্গবাসীর শরীরে নাই ?

প্রায় শ' খানেক বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে 'নর্ডিক' শ্রেষ্ঠত্বের অনেক গাল-গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে য়ুরোপের কোন কোন সমাজ-তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক আর্যদের মূল যে 'নর্ডিক' জাতি, তাহাদের সম্বন্ধে ছোটবড়ো মিলিয়া অনেক কেতাব লিখিয়াছেন। নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্বর প্রচারের দলপতি হইতেছেন ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ দ্য গোবিনো (১৮১৬-৮২)। তিনিই প্রথম নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব নামক কল্পবৃক্ষজাত অমৃত ফলটি য়ুরোপের পণ্ডিতসমাজে গড়াইয়া দেন। ১৮৫৩-৫৫ সালের মধ্যে গোবিনো তিন ভল্যুমে এক বিশাল গ্রন্থ লিখিয়া ফেলেন— ***Essai sur l' inégalité des races humaines***, অর্থাৎ 'The Inequality of Human Races'. এই গ্রন্থে তিনি নানা ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব হইতে নজির তুলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন, প্রধানত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, গৌণত জার্মানি, ডেনমার্ক অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই একদল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, স্বর্ণকেশ, নীলনয়ন, দীর্ঘশির জাতি বাস করিত। তাহারাই 'নর্ডিক' জাতি, সর্বশ্রেষ্ঠ আর্য। ফরাসি nord ( উত্তর ) হইতেই য়ুরোপের উত্তরখণ্ড-বাসী শ্রেষ্ঠ আর্যদের বলা হইয়াছে 'নর্ডিক'। গোবিনো বহি লিখিয়া এই-মতে বিশ্বাসী আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দলে টানিয়া লইলেন। তাঁহারা 'নর্ডিক' শ্রেষ্ঠত্বকে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আরকে ভিজাইয়া পণ্ডিতদের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বজাতিদ্বেষী হোসটন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন নামক এক ইংরাজ জার্মান জাতির দিকে হেলিয়া পড়িলেন, বলিলেন জার্মানরাই সেই খাঁটি নর্ডিকদের উত্তরপুরুষ ; য়ুরোপের আর সব খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভঙ্গ বা বংশজ।[৫] ভন র‍্যাঙ্কো লাপুজ নামে আর এক জার্মান পণ্ডিত বিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মান নর্ডিকত্ব প্রমাণের জন্য বেজায় সোরগোল তুলিয়াছিলেন।

অবশ্য তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে কার্লাইলের *Hero and Hero Worship* এবং নীৎশের 'Superman' তত্ত্বে ঐ ধরনের ব্যক্তিপূজা বা জাতিপূজার ইঙ্গিত আছে। গোবিনো-চেম্বারলেন-লাপুজ অ্যাণ্ড কোম্পানীর মতে য়ুরোপের উত্তরে যে শ্রেষ্ঠ আর্যদের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারাই নর্ডিক, বিশুদ্ধ আর্য। দীর্ঘশির নর্ডিক ও গোলমুণ্ড অ-নর্ডিকদের ঐতিহ্যগত লড়াই, সেই লড়াইয়ে গোলমুণ্ড (সেমিটিক-হেমিটিক ?) জনের পরাজয়— এইভাবে নাকি য়ুরোপে সংস্কৃতির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর্য সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে। এই গাঁজাখুরি তত্ত্বকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য হিটলার ইহুদিদিগকে কোতল করিয়াছিলেন। জাতিগত অহমিকা ও অপর জাতিকে দাবাইয়া রাখিবার রোখ চাপিয়া গেলে পণ্ডিতরাও রাজনৈতিক নন্দীভৃঙ্গীর গাড়ু গামছা বহিতে সঙ্কুচিত হন না, হিটলারের নর্ডিক হুংকারই তাহার প্রমাণ। নর্ডিক তত্ত্বকে বীজমন্ত্র করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিতে শুরু করিলেন, জাতির দিক হইতে ইহুদিরা অতি-নিকৃষ্ট 'মুলাটো'[৬] শ্রেণীর ঘৃণ্য বর্ণ-সংকর। কিন্তু একালে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্বে তিনটি পরিষ্কার শাখা আছে— নর্ডিক, আলপাইন ও ভূমধ্যসাগরীয়, কিন্তু কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে নর্ডিক-শ্রেষ্ঠত্বের বেলুন চুপসাইয়া যাইতেছে। আর্যেরা খ্রীস্টজন্মের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বে যখন য়ুরাল পর্বতের দক্ষিণ দিকে বাস করিত তখন তাহারা নিজেদের কী নামে অভিহিত করিত জানা যায় না। ইরানে আসিয়া তাহারা বেশ কয়েক শত বৎসর জাঁকাইয়া বসিল। 'ইরান' শব্দে আর্যত্বের গন্ধ বাহির হইতেছে। প্রাচীন ইরানী ভাষায় 'আরিয়া', মধ্য ইরানীয় ভাষায় 'আইরিয়া' বলিতে এই আর্যদের বুঝাইত। এখন য়ুরোপ-ভারত ব্যাপিয়া যে সভ্যজাতি বাস করে তাহাদিগকে ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতি বলা হয়। ইরানে অবস্থান করিবার সময়ে তাহারা ঘোড়া ধরিয়া পোষ মানাইল, মেষ ও শূকর চরানোও তাহাদের 'পবিত্র' জীবিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। বোধ হয় মেসোপটেমিয়ায় আসিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ) এখান হইতে গোরু এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে ছাগবৎস সংগ্রহ করিল ; ইহাদের দুগ্ধ পান, মাংস ভোজন, কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিল না। মনে হয়, ইহাদের একশাখা খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার অব্দের মধ্যে ককাশাস পর্বত পার হইয়া পূর্ব মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। তারপর কয়েক শতাব্দী এখানে অতিবাহিত

হইল, পরিশেষে তাহাদের কয়েকটি শাখা ইরান, ইরাক, ভারতের উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া খোদ জম্বুদ্বীপে ঢুকিয়া পড়ে, বোধহয় খ্রীস্টের জন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্বে। এই পশুচারণে দক্ষ যাযাবর গৌরাঙ্গ জাতি নিজেদের শীল-সাধনা, পূজা-উপাসনা ও দেবদেবীর স্তোত্র বিষয়ক কিছু শ্লোক লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি ও শ্লোকাবলী বেদে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের পূর্ব হইতেই তো এদেশে দ্রাবিড় ও নিষাদ জাতি আসর জাঁকাইয়া বাস করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে আগন্তুক আর্যদের বহু দিন ধরিয়া খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দস্যু ও নিষাদ জাতি সুগঠিত আর্যদের সংহত শক্তির নিকট হটিয়া গেল, কেহ বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া বাঁচিল, কেহ মারা পড়িল, কেহ কেহ আর্যদের নিকট পরাভূত হইয়া শূদ্র দাসে পরিণত হইল। দ্রাবিড়গণ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সরিয়া গেলে দুই দলে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য ভাগাভাগি করিয়া লইল। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই আর্যজাতি পূর্বভারতে বিদেহ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অনুমান হয় খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ভোট-চীনাভাষী মঙ্গোল জাতির নানা শাখা-প্রশাখা হিমাচল অঞ্চল ও লৌহিত্য নদের তীরে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন-কালে ভারতীয় গ্রন্থে তাহাদিগকেই 'কিরাত' বলা হইয়াছে।

৬.

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে নিষাদ ও কিরাত জাতির নামধাম ও স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যসমাজ ইহাদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা পোষণ করিলেও কিরাত জাতির পীতবর্ণের জন্যই বোধ হয় ইহাদের প্রতি গৌরাঙ্গ আর্যগণের ততটা অনীহা ছিল না, থাকিলে মহাভারতে মহাদেবকে কিরাতবেশ দেওয়া সম্ভব হইত না, ভারবিও অতবড়ো একখানা মহাকাব্য (কিরাতার্জুনীয়ম্) ফাঁদিতে পারিতেন না। একালে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে বাল্‌তিস্তান অর্থাৎ কাশ্মীরের পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়-সন্নিহিত অঞ্চলে একটি জাতি নানা নামে, বেশবাসে ও বিবিধ ভাষাসহ বাস করিতেছে। তাহাদিগকে মঙ্গোল এবং তাহাদের ভাষাকে ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan)[৭] গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। নৃতত্ত্বের দিক হইতে তাহারা

স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীভুক্ত, তাহাদের ভাষাও অন্য ভাষা হইতে পৃথক। এই পীতাভ জাতি বৈদিক সাহিত্যেও উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, এই পর্বতকান্তার-বাসী মঙ্গোল-শ্রেণীভুক্ত ভোট-চীনীয়ভাষী জনসমূহ আর্য আগমনের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে তিব্বতের দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করে এবং হিমালয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় সাহিত্যে ইহাদিগকে 'কিরাত' বলা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা ও কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় কিরাত-জাতির উল্লেখ আছে। 'পুরুষমেধ' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, গুহাবাসী কিরাত, পর্বতসানুবাসী জম্ভক এবং পাহাড়িয়া কিম্পুরুষ ( কিন্নর ) দিগকে যজ্ঞের বলিস্বরূপ অর্পণ করা যায়। অথর্ববেদে আছে, 'কৈরাতিকা' অর্থাৎ কিরাতকন্যা পর্বত-শিখরে মাটি খুঁড়িয়া ঔষধ সংগ্রহ করিতেছে। ম্যাকডোনেল ও কীথ *Vedi Index* গ্রন্থে এই তথ্য মানিয়া লইয়াছেন। মনুতে ইহাদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কিরাতেরা নিষাদের (অষ্ট্রিক কোলামুণ্ডা গোষ্ঠী) মতো সভ্যতায় অতটা পিছাইয়া ছিল না। পূর্ব-নেপালে 'কিরান্তি' নামে যে উপ-জাতি বাস করে ( ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত, Tibeto-Burman ) তাহারাই কি কিরাতজাতির শেষ বংশধারা ? অথবা কিরাত শব্দটি আদৌ সংস্কৃত শব্দ নহে, ভোটচীনীয় ভাষার কোন অধুনা-লুপ্ত শব্দ ?

একালের লেখকগণ মনে করেন, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল, সিকিম, ভুটান, মনি-পুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের মঙ্গোল জাতিরাই কিরাত নামে পরিচিত। উত্তর-প্রদেশে কৃপণ সুদখোর বণিককে 'কিরাত' বলে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান-গণ নিন্দাচ্ছলে হিন্দুদের নাম দিয়াছিল 'কিরাড়'। আর্যগণ এই সমস্ত কদাচারী কিরাতদের নিন্দাই করিতেন। পরে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল বদমায়েস, খুনী-ডাকাত, জুয়াচোর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ খ্রীঃ পূঃ ৭ম-৮ম শতাব্দী হইতেই বৈদিক সংহিতায় পাওয়া যাইতেছে। 'চিরেতা' শব্দটি নাকি 'কিরাততিক্ত' শব্দের অপভ্রংশ। কিরাতের মতো তিক্ত, তাহাই কিরাততিক্ত শব্দটির মুল। এ শব্দে কিরাত জাতির প্রতি প্রীতি সূচিত হইতেছে না। সে যাহা হউক, ইহারা একেবারে বর্বর-শ্রেণীর ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য ছিল না। শুক্ল যজুর্বেদে ( 'শতরুদ্রীয়' ) বলা হইয়াছে যে, যাঁহার গ্রীবা নীল, বর্ণ রাঙা, মেষপালকেরা নিত্য তাঁহাকে দেখিয়া থাকে, গ্রাম্য জলবাহিকা শ্রেণীর স্ত্রীলোকেও তাঁহার সন্ধান জানে। এই কিরাত তো একেবারে 'নীললোহিত' মহাদেব বনিয়া

গিয়াছেন।

পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারতেও কিরাতের নামধাম ও স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণে "হেমাভ প্রিয়দর্শন ঘোর নরব্যাঘ্র" বলিয়া কিরাতের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নহে, সমুদ্রোপকূলেও কিরাতেরা বাস করিত। মনে হয় রামায়ণের যুগে কিরাতের কোন কোন শাখা সমুদ্রের ধারেও বাস করিয়াছিল। মহাভারতের একস্থলে ইহাদিগকে 'সাগরকুক্ষিবাসী' বলা হইয়াছে। রামায়ণ অনুসারে মনে হয়, ইহারা কাঁচা মাছ-মাংস খাইত। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ভারতের পূর্বে ছিল কিরাত জাতি, পশ্চিমে যবনজাতি। 'মিলিন্দ পঞ্‌হে' যে 'চীন-কিলাত' শব্দটি স্থান পাইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ 'চীন-কিরাত' শব্দই। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা মহাভারতীয় ভগদত্তের বাহিনীতে অনেক চীনা ও কিরাত সৈন্য ছিল। পার্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত তাঁহার রাজ্যের চারিপার্শ্বে চীন ও কিরাতজাতির বসবাস ছিল। অজ্ঞাতনামা গ্রীক-লেখকের 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে 'কিরাদই' নামে যে জাতির উল্লেখ আছে তাহারা কিরাতই হইবে।

এ সমস্ত তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে, নেপাল, ভুটান, সিকিম, মণিপুরের অধিকাংশ জনই এই শাখাভুক্ত। ইহারা দীর্ঘকায়, লম্বা ও হরিদ্রাভ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের পীতবর্ণের আরও উল্লেখ আছে। মহাভারতে তাহাদিগকে 'কাঞ্চনপ্রভ' ও 'হেমাভ পুরুষ' বলা হইয়াছে, কখনও কর্ণিকার ফুলের (সোঁদাল) সঙ্গে তাহাদের গাত্রত্বকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে বলে "চম্পক-শোন-কুসুম-কনকাচল"! মঙ্গোলজাতির হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণই আর্যদের নিকট স্বর্ণবর্ণ মনে হইয়াছিল। অবশ্য ইহাদের গাত্রবর্ণ যত মনোমুগ্ধকর, হালচাল ততটা মোলায়েম নহে। ইহারা ফলমূল মাছমাংস যাহা পাইত তাহাই খাইত, আমমাংসেও আপত্তি ছিল না। মৃগচর্ম পরিত. চন্দনকাঠ, অগুরু, সোনারূপা, মণিমাণিক্যের ব্যবহারও জানিত, ভালো কাপড় বুনিতে পারিত। এখনও উত্তরপূর্ব ভারতের অদিবাসী সমাজে বস্ত্রবয়নের এই ঐতিহ্য বজায় আছে। কিন্তু স্বভাবের দিক হইতে তাহারা ছিল প্রচণ্ড ও নির্মম।

সিলভাঁ লেভির নেপাল-বিষয়ক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে কিরাত জাতির কথা আলোচিত হয়। তারপর কাসটেন রোনো ঐ বিষয়ে আর এক-

খানি বহি লিখেন, তাহতে তিনি কিরাত ও মঙ্গোল জাতির সাদৃশ্য ও ঐক্য প্রমাণ করিয়াছেন। এই জাতিগোষ্ঠী অষ্ট্রিকদের মতো বহু স্থান জুড়িতে পারে নাই, সংখ্যার দিক হইতেও অল্প, তাই বোধ হয় তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Kirata-Jana-kṛti'-তে তাহার সূচনা করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকায় যে-সমস্ত উপাদানের ইঙ্গিত দিয়াছেন, শুধু তাহার সন্ধান করিলেই একাধিক গবেষণা গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে।

কিরাত জাতি নিষাদের মতো মূল ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায় নাই। যখন উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে আর্য ও আর্যেতর জনের মধ্যে সমন্বয় চলিতেছিল তখন নেপালের কিরান্তি ও নেওয়ার, আসাম ও পূর্ববঙ্গের বোড়ো-অহম, খাসি পাহাড়ের জৈন্তিয়ারা সর্বভারতীয় কেন্দ্র হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিল। এইজন্য তাহাদের অতীত ইতিহাস অনেকটাই অস্পষ্ট ও অজানা। হাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দের পূর্বে তাহাদের হাঁড়ির খবর বিশেষ পাওয়া যায় না। এখনও তাহাদের জনসংখ্যা স্বল্পতর, বোধ হয় মোট ভারতীয় জনসংখ্যার এক শতাংশও হইবে না। সংখ্যার স্বল্পতা, ভারতকেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থান এবং মানসিক সঙ্কোচন ও বিচ্ছিন্নতার জন্য তাহারা ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পায় নাই। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির অনেক কিছুই আর্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গোল জাতির বিশেষ কোন আধি-মানসিক বা পার্থিব ঐতিহ্য ভারতসংস্কৃতিতে উপযুক্ত স্থান পায় নাই, স্থানীয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। ভারতের হিমাচলের সন্নিহিত অঞ্চলে ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়ার ইতিহাস গ্রীয়ার্সন *Linguistic Survey of India*-র ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। এবার সে বিষয়ে দু-চার কথা বলিয়া লওয়া যাক।

মঙ্গোল জাতির মাথার খুলির পরিমাপ করিয়া ইহাদের তিনটি স্তর নির্ণীত হইয়াছে :

১. হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে ( নেপাল-আসাম ) বসবাসকারী আদিম মঙ্গোল। ইহারা দীর্ঘমুণ্ড, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ পরোয়া করিত না।

২. পরবর্তীকালে আগত গোলমুণ্ড মঙ্গোল। ইহারা সভ্যতায় কয়েক হাত আগাইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশই তাহাদের মূল কেন্দ্র। সেখান হইতে

তাহারা আরাকানের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।

৩. ভোট-মঙ্গোল— ইহারা দীর্ঘকায়, অধিকতর পীতাভ ও অল্প স্বল্প গৌরাঙ্গ। মঙ্গোলজাতির মধ্যে ইহারা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত। মনে হয় ইহারা সকলের শেষে হিমালয় পার হইয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করে। তিব্বতের মূল ও শাখা-ভাষাই তাহাদের সংলাপের ভাষা। পূর্বে ভুটান-সিকিম হইয়া পশ্চিমে লাদাখ ও বাল্‌তিস্থানের মঙ্গোলজাতিরা, আসামের খাসি সম্প্রদায় ও জৈন্তিয়ারা কোলগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। তাহাদের বাদ দিলে আর সমস্ত ভোট-চীনীয় জাতি-উপজাতি মঙ্গোল-গোষ্ঠীর ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতে মঙ্গোল জাতির সঙ্গে ভারতীয় জনের মিশ্রণে যে মিশ্র ভোট-ভারত সংস্কৃত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই জনগুলির চিহ্ন পাওয়া যায়: নেপালের নেওয়ার (প্রাচীন-কালে ইহাদিগকে বলা হইত কুনিন্দ), উত্তর আসামের ইন্দোমঙ্গোল উপ-জাতি, বোড়ো, নাগা, কুকিচীন, অষ্ট্রিক-ভাষী খাসি, শ্যামচীনীয় গোষ্ঠীভুক্ত অহোম। ভারতের বাহিরেও মঙ্গোল ভাষাসমূহের এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে:

(ক) উরাল-আলতাই শাখা। এই শাখার দুইটি উপশাখা— উরাল বা ফিনো-উগ্রীয় (হাঙ্গারীর মজ্যার ভাষা, ফিনীয়, এসতোনীয় ও ল্যাপ ভাষা) এবং আলতাই ভাষা (পশ্চিমা তুর্কী অর্থাৎ ওসমানি ভাষা, পূবী তুর্কী অর্থাৎ চাঘতাই ভাষা। ইহার সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় য়াকুট ও মাঞ্চু ভাষা।)

(খ) উত্তর-পূর্ব এসিয়ার মঙ্গোল ভাষা।

(গ) আইনু ভাষা— জাপান ও কোরিয়ার ভাষাগোষ্ঠী। জাপানের হোক্কাইডো ও সাখালিন দ্বীপপুঞ্জে 'আইনু' নামে আদিম উপজাতির বাস। ইহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিছু-বা জাপানী জনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মুস্কিল বাধাইয়াছে ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি। ইহারা দীর্ঘকায়, চোয়ালের হাড় উঁচু, নাক চ্যাপটা ও চওড়া, দেহের তুলনায় মুখখানি কিছু ক্ষুদ্র, শরীর শক্ত সমর্থ, গাত্রে কিছু রোম আছে, তাই বলিয়া তাহাদিগকে লোমশ মুনির বংশধর বলিবার কারণ নাই। জাপানী জনের সহিত চলনে-বলনে আকার-আকৃতিতে ইহাদের অনেক পার্থক্য। ইহারা

কি ককেশাস গোষ্ঠীভুক্ত? তাহারা এই পাণ্ডব-বর্জিত দ্বীপেই বা আসিবে কি করিয়া? কিছু মৌখিক ধরনের লোকসাহিত্য তাহাদের মধ্যে চালু আছে, কিন্তু লিপি নাই বলিয়া লেখার সাহিত্যও নাই।

(ঘ) আমেরিকায় মঙ্গোল জাতি— বহু পূর্বে কিছু কিছু মঙ্গোলজাতি বেরিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় পাড়ি দিয়াছিল। আমেরিকায় বাস করিবার ফলে তাহাদের নিজস্ব ভাষা-প্রকৃতি লোপ পাইয়াছে, তাহারা অনেকদিন ধরিয়া আমেরিকার স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত এস্‌কিমো গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার তুষার রাজ্য বাস করে, তাহারাও মঙ্গোল জাতিভুক্ত, কিন্তু তাহাদের ভাষায় এখন আর মাঙ্গোলগোষ্ঠীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

আদিম ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী জনসমূহ হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী উত্তর-পশ্চিম তীরে বাস করিত। অতি প্রাচীনকালে ইহাদের এক শাখা দক্ষিণ-চীন ও ব্রহ্মে আসিয়া ডেরা বাঁধে। ব্রহ্মের 'কারেন'-রা ইহাদেরই উত্তরপুরুষ। অবশ্য কারেন ভাষা এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, এই ভাষার সঙ্গে ভোট-চীনীয় ভাষার সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম ও ইন্দোচীনে এক শ্রেণীর অষ্ট্রিক জাতি বাস করে। তাহারা মঙ্গোলগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেও নিজেদের অষ্ট্রিক ভাষা পরিত্যাগ করে নাই।

পশ্চিমে চীনের মঙ্গোল উপজাতি, যাহরা বহু পূর্বে ভোট-চীনীয় ভাষায় কথা বলিত, নানা পরিবর্তনের পর তাহাদের ভাষায় দুইটি স্তর বেশ স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে— (১) ভোট-ব্রহ্মী ভাষা (২) শ্যামদেশীয় ভাষা। ভোট-ব্রহ্মী ভাষার মধ্যে তিব্বতের উপভাষাসমূহ (কাশ্মীরের পশ্চিমে বাল্‌তিস্থান হইতে পূর্বে লাদাখ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভুটান ও সিকিমেও এই গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহৃত হয়), ভারতের হিমাচল-সন্নিহিত অঞ্চলের উপভাষা সমূহ (নেওয়ারি, মগর, গুরুং, মুর্মি, সুনুওয়ারি, কিরান্তি, লেপ্‌চা, টোটো— এগুলি বিশুদ্ধ ভোট-চীনীয়), হিমাচল অঞ্চলের ভোট-চীনীয় ভাষী অষ্ট্রিক গোষ্ঠী (সিমলা, নেপাল ও লাহুল উপত্যকার ভাষা), উত্তর-আসামের উপভাষাসমূহ (আকা, মিরি, আবোর, ডাফ্‌লা, মিশ্‌মি), আসাম-ব্রহ্মী গোষ্ঠী। (ইহাদের তিন শাখা— (ক) বোড়ো —মেচ, রাভা, কাছাড়ী, টিপ্রা, (খ) নাগা— আও, আঙ্গামি, সেমা, টাংখুল, সোংটেম, লোথা, মাও, কাবুই ইত্যাদি; (গ) কুকিচীন— মণিপুর, ত্রিপুরা ও

লুসাই পাহড়ের মেইথি, মণিপুরি। মণিপুরি ভাষার সাহিত্য উল্লেখযোগ্য ), উত্তর-ব্রহ্মের কাচিন ও লোলো গোষ্ঠীর ভাষা, ব্রহ্মের ম্রিয়াম্মা ভাষা।

শ্যামচীনীয় ভাষার মধ্যে থাই, লাও, শান, খাম্‌তি ও অহোম ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারত সীমান্তে খাম্‌তি ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু পূর্বে (১৩শ শতাব্দী ) শান অভিযানকারীরা আসামের অনেকটা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের ভাষাই অহোম ভাষা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাষা আসামে প্রচলিত ছিল। অহোম হইতেই সমগ্র অঞ্চলের নাম হইয়াছে আসাম।

হাজার তিনেক বছর আগে যে সমস্ত ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী মঙ্গোল জাতি ভারতের হিমাচল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সভ্যতায় ছিল নিম্নতম। তাহারা খুব সম্ভব গুহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক নীড় বাঁধিয়াছিল, মাটি খুঁড়িয়া মূল সংগ্রহ করিত, বৃক্ষশাখা হইতে ফলফুলুরি পাড়িয়া খাইত, বিনা আয়াসে প্রকৃতিদত্ত যে শস্য জন্মায় তাহাই পুড়াইয়া সিজাইয়া চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। আমমাংসে তাহাদের অরুচি ছিল না। শুনা যায় বুদ্ধের জীবৎকালেই একদল ভোট জাতি ভারতের হিমাচল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের বেশ কয়েক শ' বছর আগে মঙ্গোলশাখাভুক্ত অনেক জন ও জাতি ( নেপাল অঞ্চলের অধিবাসী— যাহারা এখন নেওয়ারি, শেরপা, মগর, গুরুং, ধিমল, খাম্বু, কানোয়ারি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে ) ভারতের হিমাচল অঞ্চলের তরাইভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। বোধহয় প্রথমে তাহারা নেপালে প্রবেশ করে, সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গাড়োয়াল ও কুমাউন পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। এই দল-উপদলের মধ্যে নেওয়ারি ভাষাভাষীরাই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কিছু উন্নত। তাহাদের ভাষা এখনও ভোটবর্মী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে, কিছুদিন আগেও তাহারা পূর্বভারতে প্রচলিত 'কুটিল' লিপি ব্যবহার করিত, এখন তাহারা বাধ্য হইয়া নাগরী লিপি ব্যবহার করে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে নেওয়ারি ভাষার বেশ উন্নতি হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে হজম করিয়া তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির পাহাড়িয়া ধারক-বাহকে পরিণত হইয়াছে। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে রাজপুতানা হইতে মুসলমান-বিতাড়িত এক সম্প্রদায় নেপালের কিয়দংশ জয় করিয়া লয়, তাহারাই গুরখা। তাহাদের পূর্বে

নেপালের সংস্কৃতি-সুত্র নেওয়ারি ভাষীরাই ধারণ করিয়াছিল।

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, পার্বত্য এলাকার উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে মঙ্গোল জাতির সহিত ভারতীয় জনের সংমিশ্রণে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের পূর্বনাম কুনিন্দ, এখন তাহাদিগকে 'কুনেট' বলা হয়। ভারতে বিশুদ্ধ তিব্বতী ভাষী জনসংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। সম্প্রতি তিব্বত হইতে চীনা-খেদানো বহু তিব্বতী ভারতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার এখনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। বাল্‌তিস্থান ('ছোট তিব্বত' নামে পরিচিত) ও লদোখের তিব্বতীভাষী ভুটিয়ার সংখ্যা পাঁচ লাখের কাছাকাছি যাইবে। এই প্রসঙ্গে ভোট-চীনীদের অন্যান্য শাখার নাম করা যাইতে পারে। আসামের বোড়ো ও নাগারা আসাম ও পূর্ববঙ্গের অনেকটাই অধিকার করিয়া আছে। নৃতাত্ত্বিকগণ বলেন, নাগাদের শিরাধমনীতে যৎসামান্য নিগ্রোবটু রক্তের মিশাল আছে। বোধহয় পূর্বে তাহাদের বেশবাসের বালাই ছিল না, তাই কি তাহারা নাগা ( <নগ্ন ) নামে পরিচিত হইয়াছে? কুকিচীনেরা মনিপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়ে এখনও ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। মণিপুরী ও মেইথি ভাষায় স্থানীয় ভাষার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনা তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আসামের খাসিদের উল্লেখ করিতে হয়। তাহারা জাতির দিক হইতে মঙ্গোল হইলেও ভাষার দিক হইতে অষ্ট্রিক। অসমিয়া, বাঙালী ও খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিছু কিছু ভোট-ব্রাহ্মী আসামে বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মূলশাখা ( অহোম, অসম ) ব্রহ্মদেশ হইতে উত্তর-আসামের অনুপ্রবেশ করে, পরে তাহাদের নামেই সমগ্র অঞ্চল ( 'আসাম' ) বিশেষিত হইয়াছে। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত অহোমগণ আসাম শাসন করিয়াছিল, তারপর উক্ত অঞ্চল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসে। আসামের ভাষা ও সাহিত্যে ইহাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারাই রাজাদের বংশপঞ্জী ( 'বুরঞ্জী' ) গদ্যে লিখিয়াছিল। ভোট-চীনীয়, ভোট-বর্মী ও শ্যামচীনীয় ভাষাভাষী বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ভেদ করিয়া আসাম ও চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। কালক্রমে তাহারা হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে কিছুটা রফা করিয়া বসবাস

করিয়াছে, হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ মহাযান মতের সংমিশ্রণে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অনেক পুঁথিপত্র নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। আসামে শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ প্রভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। মঙ্গোল জাতি ভারত হইতে লইয়াছে অনেক, দিয়াছেও তেমনি। তাহারাই পালযুগে বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতাদর্শ ও শিল্পকলা তিব্বতে চালান দিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তাহাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছিল যে, আসাম জয় করিতে মুঘল-পাঠানকে হন্দ হইতে হইয়াছিল। আসামের অহোমরাজ গদাধর সিংহ (অহোম নাম— সুপৎ ফা) ঔরংজেব-বাহিনীকে আসাম হইতে খেদাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র সিংহ (অহোম নাম— সুখাং ফা) মুঘলের কব্জা হইতে বাংলাদেশের কিয়দংশ ছিনাইয়া লইবার মতলব আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। নেওয়ারি ভাষাভাষীরা নেপালে শিল্প, সাহিত্য— বিশেষতঃ নাটক রচনা ও অভিনয়ের বিশেস উৎসাহদাতা ছিলেন। মঙ্গোল-গোষ্ঠীর ভোট-চীনীয় ও ভোট-বর্মীভাষী জন ভারতে প্রবেশ করিয়া ভাষাগত কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলেও এখন তাহারা অনেকটা ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। ভারতীয় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও কিছু বদলাইয়া গিয়াছে, অবশ্য আচার-ব্যবহারে ও ভাব-ভঙ্গিমায় এখনও কিছু পার্থক্য আছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সমস্ত জনের মূল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন, নিষাদ-কিরাতের দল যেখান হইতে আসুক, সংস্কৃতিতে যতই উদ্ভট বলিয়া মনে হোক, তাহারা ক্রমে ক্রমে বৃহদ্‌ ভারতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মঙ্গোল গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় জনের সমন্বয়ের ফলে যে ভারত-মঙ্গোল সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এখনও ভালো করিয়া তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাহার "দাঁড়া" বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবার সে পথে অনেক পথসন্ধানীর আবির্ভাব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিরাত-নিষাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উচ্চবর্ণেদের শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি ফিরাইতে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার সন্ধান হইতে আমরা বহু অজ্ঞাত তথ্য পাইয়াছি। এই বিশাল জনসংঘের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব আছে, তেমনি আছে মস্তকশিকারীদের উত্তরপুরুষ। বোধহয় ইদানীং আইনকানুন কড়া হইবার ফলে আসামে বনে জঙ্গলে আর কাটা মাথা

পাওয়া যায় না, বা কেহ নিজ তাগৎ ও কেরামত দেখাইবার জন্য শত্রুর মাথা কাটিয়া গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায় না, প্রণয়িনীর প্রেমকটাক্ষ লাভ করিবার জন্য কর্তিত মুণ্ড বেড়ার গায়ে টাঙাইয়া রাখে না, বরং বন্দুক পিস্তল চালাইতে অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। আচার্য সুনীতিকুমার এই আদিম সংস্কৃতি ও ভাষা আলোচনায় আমাদের ভদ্রলোক-সংস্কার অনেকটা দূর করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য তিনি সমস্ত জাতিরই নমস্য।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. লাতিন শব্দের অনুকরণে আমরা মেলানেসিয়ার 'কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ' নাম দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর-পশ্চিমে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ— ইহাই ইহার কল্পিত সীমা। নিউ গিনির কিয়দংশ, সলোমন, সান্তাক্রুজ, বাক্স্, হেব্রাইডিস, ক্যালিডোনিয়া, লয়াল্টি এবং অ্যাডমিরাল দ্বীপপুঞ্জ কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষ্ণবর্ণের জন্য লাটিন ভাষায় এই দ্বীপপুঞ্জকে Melanesia বলে। এখানকার জনগণ অনেকটা পপুয়াদের মতো এখনও সভ্যতার নিম্নস্তরেই আছে।

২. লাতিন শব্দের বাংলা করিয়া আমরা Polynesia-কে 'বহু 'দ্বীপপুঞ্জ' নাম দিলাম। পূর্ব-প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের এই নাম। সীমা— উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-পূর্বে ইস্টার দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা পাথুরে কালো নহে, অনেকটা তামাটে ধরনের। ইহাদিগকে নৃতত্ত্বে 'ককাসিয়' বলা হয়। ইহারা দীর্ঘাকার, সুগঠিত, ভদ্র। মাওরি ইহাদের ভাষা। পাথুরে কালো লোকসমূহের মধ্যে হঠাৎ এই আধা-গৌরবর্ণ লম্বা মাপের মানুষ কেমন করিয়া আসিল জানা যায় না।

৩. Micronesia-কে আমরা অণুদ্বীপপুঞ্জ নাম দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ল্যাড্রোন, ক্যারোলাইন, পালাউ, মার্শাল, গিলবার্ট প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এই নামে অভিহিত হয়। এখানকার অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষ মালয়েশিয়া হইতে এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি দিয়াছিল।

৪. প্রাচীনকালে অগ্নিপূজক ইরানীয় পুরোহিতদের 'অথর্বন' ( < অথের্না) বলা হইত। ঋগ্‌বেদেও দেখা যাইতেছে অথর্বা ঋষি সর্বপ্রথম বৈদিক অগ্নি চয়ন করেন, তাঁহার পুত্র দধীচি সেই পবিত্র অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই গোষ্ঠীর পুরোহিতেরা সেকালের সমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন।

৫. হৌসটেন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (১৮২৫-১৯২৭) জাতিতে ইংরাজ, ভিয়েনায় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ভগ্‌নারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি জার্মান বনিয়া যান, জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরাজের সংস্রব বর্জন করেন। জার্মান ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া তিনি জার্মান জাতির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং নিজ পিতৃপুরুষের অন্তর্জলির ব্যবস্থা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে যা-ইচ্ছা-তাই লিখিয়া শ্বশুর কুলের অর্থাৎ জার্মান জাতির শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্বের বিস্তর প্রশংসা করেন। তাই ইংরাজগণ এই দলত্যাগী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে **'The Renegade Englishman'** বলিয়া ঘৃণা করিত। হিটলার কি তাঁহার নিকট তালিম লইয়া গায়ের জোরে জার্মান জাতির নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন ?

৬. মূলাটো ( *Mulatto* ) শব্দটি মূলতঃ স্প্যানিশ। লাতিনে mulas শব্দের ( ইং mule অশ্বতর, অর্থাৎ ঘোড়া-গাধার বর্ণসংকর ) স্প্যানিশ রূপ হইতেছে মূলাটো। শ্বেতাঙ্গ পিতা ও নিগ্রো রমণীর সন্তানেরা এই ঘৃণা নামে অভিহিত হয়। অনেকটা আমাদের দেশের 'মেটে ফিরিঙ্গী' শব্দের মতো। অবশ্য মূলাটোর রক্তে কয় কাঁচ্চা 'সাদা' রক্ত বহমান, সেই অনুপাতে *quadroon, octoroon, mestizos, pardo* প্রভৃতি নানা শাখাপ্রশাখায় ইহারা বিভক্ত।

৭. আমরা ভোট বলিতে তিব্বতকে নির্দেশ করিতেছি। প্রাচীনকালে তিব্বতের নাম ছিল 'বোড'। ভারতে আসিবার পর তাহারা 'ভোট' নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্বে তিব্বতের ধর্মের নাম ছিল 'বন'। ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নেপাল ও চীনের সঙ্গে তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিলেও তাহারা কাশ্মীরের শারদা লিপি গ্রহণ করে। এই লিপিতেই তাহাদের বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ রচিত। তাহাদের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি ভারত হইতে পাওয়া, কিন্তু সভ্যতার স্থূল উপকরণের জন্য তাহারা চীনের নিকট ঋণী।

# শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১.

১৯৬৪ সালের একুশে জুলাই তারিখটি মনে পড়িতেছে। ঐ দিন শশিভূষণ দাশগুপ্ত[১] মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। কালস্বরূপ কর্কট-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বহুজনের অন্তরঙ্গ, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, আদর্শ গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জীবনরশ্মি সংহরণ করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' স্বল্পভাষী শশিভূষণ দাশগুপ্ত জীবিতকালে লোকচক্ষু ও সাময়িক পত্রের অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সভা-সমিতির বরাসন লাভে তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না, 'রাজ্য ভাঙাগড়া'র রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার ডাক পড়ে নাই।

বাংলা সাহিত্যের সৌখিন পাড়ায় যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা হয়তো শশিভূষণকে চিনিবেন না। যাঁহারা সাহিত্যের গবেষণাকে পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারাই তাঁহাকে যথার্থ চিনিবেন। বৌদ্ধতন্ত্র, বাংলার লোকধর্ম ও লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তদর্শন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যাদি— যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃ-প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর পৈতৃক সংস্কার বলে, শশিভূষণ তাহাকেই দুর্জ্ঞেয় জটিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশের চিত্তভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা ও একনিষ্ঠ সাধনা ইদানীং এদেশের বিদ্বৎসমাজ হইতে যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে হয়, এ ধরনের নিষ্কাম গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে চাহিতেছেন কমলদলবিলাসী রম্যরচনাকারের দল।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় শশিভূষণের অসাধারণ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতা যেন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল। তাঁহার সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরসন্ধানী মনন বিষম, বিপরীত ও দুর্জ্ঞেয়কে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। চিত্ত-গুহাশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া তিনি যেভাবে মাল্যগ্রন্থন করিয়াছেন,

আজিকার 'প্র্যাগমাটিক' যুগের নগদ বিদায়ের দিনে তাহার মূল্য অবধারণ করা সম্ভব নহে। এই খর্ব মানসিকতার যুগে শশিভূষণের প্রতিভা ও চরিত্রের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করাও সম্ভব নহে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি আমরা 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মূষল' না হই, তাহা হইলে শশিভূষণ-রচিত গ্রন্থের মধ্যে সেই কুলপরিচয় ও পৈতৃক সংস্কার আমাদিগকে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

২

শশিভূষণ একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্য সাহিত্যেও তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনাতেও তাঁহার সমৃদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যাইবে, কথাসাহিত্য ও নাটকের কমলবনেও তাঁহার মনোমধুপ মত্ত হইয়াছিল।[২] কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক শশিভূষণের পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখানে তাহার স্থানসঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার যে চারিখানি (দুইখানি ইংরেজী ও দুইখানি বাংলা) গ্রন্থ বাংলাদেশের মনঃপ্রধান গবেষণা-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এখানে সে সম্পর্কে দুই-চারি কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অতি তরুণ বয়সে শশিভূষণ প্রবীণ তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি নূতন শাখা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বের সঙ্গে যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা একদা এই অঞ্চলের জনচিত্তে যেমন গভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বের মুখে সেই অপরিণত বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পদ (চর্যাগীতি নামে পরিচিত) রচনা করিয়াছিলেন—যাহার আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে আছে গূঢ় গহন অধিমানসের নির্বাণমুক্তির কথা। বাংলা চর্যাগীতিকাগুলি অনুশীলন করিতে গিয়া ছাত্রাবস্থাতেই শশিভূষণ প্রহেলিকাধর্মী পদের পর্দা সরাইয়া তাহার যথার্থ দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করাচার্য-কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধ-বিরোধিতা তদানীন্তন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপনচারী করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ চর্যাগীতিকা। তালপাতা ও তুলোট কাগজে লেখা বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁথিতে মহাযান শাখা হইতে উদ্ভূত এই "তান্ত্রিক বৌদ্ধ"-সম্প্রদায়ের কৃত্য, আচার ও দর্শনের কথা লেখা

আছে— কখনও 'সন্ধ্যাভাষা'র ('সন্ধাভাষা') ধূমল আবরণের ছদ্মবেশে, কখনও-বা তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় গৃহীত দেবভাষার সাহায্যে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সিদ্ধাচার্যেরা কিছুমাত্র সতর্ক ছিলেন না। তাঁহাদের এই সমস্ত সংস্কৃত রচনায় সমাস-সন্ধির নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে, ষত্ব-ণত্ব, বিভক্তি-প্রত্যয় ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহারা এমন উদাসীন ছিলেন যে, একালের সংস্কৃত পাঠার্থী বালকেরাও লজ্জা পাইবে। সেই সমস্ত পুঁথির কিছু আছে এসিয়াটিক সোসাইটির হেপাজতে, কিছু আছে প্যারিসে 'বিব্‌লিওথেক ন্যাশানেলে', কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। ভারতে বরোদা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধ তন্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

শশিভূষণ কিছু মূল পুঁথি, কিছু মূলের 'রোটোগ্রাফ', কিছু-বা মুদ্রিত পুঁথি লইয়া এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করিলেন। বস্তুতঃ চর্যাগীতিকা বা দোঁহার যথার্থ স্বরূপ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাহিত্যের বিপুল জঙ্গাল ঘাঁটিতে হইবে নিরঙ্কুশ ধৈর্যের সঙ্গে— একথা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজটি যে কী অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য তাহা এ পথের পথিকেরা কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এ বিষয়ে ইদানীং দেশে-বিদেশে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, কিন্তু আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই তত্ত্ব-দর্শনের তিনিই ছিলেন একমাত্র গবেষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাহিত্য অধিগত করিয়া ফেলিলেন। এম. এ. পাস করিবার পর দুই বছরের মধ্যে তাঁহার প্রথম গবেষণা 'An Introduction to Tantric Buddhism' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিল (১৯৩৭)। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক বাধার জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে অনেক পরে— ১৯৫০ সালে। অবশ্য এটি প্রকাশের কিছু পূর্বে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য লেখা তাঁহার 'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature' প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৬)। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তত্ত্বসন্ধানী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা শশিভূষণের বিপুল পরিশ্রম ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। দুরূহ তত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ দুইটি পরিপক্ক প্রবীণ বয়সের রচনা নহে, একথা ভাবিতেই বিস্ময় জাগে।

প্রথম গ্রন্থে শশিভূষণ তান্ত্রিকতার স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, তন্ত্রাচার ব্রাহ্মণ্য সাধ্যসাধনার মতো বৌদ্ধ দার্শনিকতাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত

করিয়াছিল। বরং বৌদ্ধতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও জটিলতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পর্ক, একের উপর অপরের প্রভাব, মূল বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের খিড়কীপথে বহমান রহস্যময় যান-উপযান, মন্ত্রযান ( 'মন্ত্রনয়' ), বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি উপদর্শনের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ ইত্যাদি দুরূহ ব্যাপারে নিযুক্ত তরুণ শশিভূষণ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মকে ঘৃণা-নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্বে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের পক্ষ হইতে বহুনিন্দিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়ের কৃত্য, চর্যা ও দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেন এবং এই গোপনচারী ও রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের বিচিত্র তত্ত্বকথা ও বিচিত্রতব সাধনপ্রণালীর প্রতি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম বিষয়— হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের সম্পর্ক ছিল, বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্রেরই কোন অর্বাচীন শাখা কিনা সে বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান। এই বিষয়ে বহু মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অসংখ্য পুঁথি হইতে নানা তথ্য উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইলেন— তন্ত্র ও তন্ত্রচর্যা ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু-সমাজের একচেটিয়া কারবার নহে। আধি-মানসিক সংস্কারকেও যে দেহাধারে উপলব্ধি করা যায়, তন্ত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় সাধনা তাহারই দিঙনির্দেশ করিতেছে। বৌদ্ধ মহাযান শাখার বিভিন্ন উপশাখা কিভাবে হিন্দু-তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, শশিভূষণ তাহারই অবজেকটিভ স্টাডি করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে তন্ত্রসম্বন্ধে নানা-ধরনের বিরুদ্ধতা জমিয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রের 'ভুক্তি-মুক্তি' তত্ত্ব হইতে অচিরে 'মুক্তি' খসিয়া পড়িল এবং মুক্তির স্থানলাভ করিল 'ভুক্তি'। 'পঞ্চ মকার', নাদবিন্দুসাধন, প্রজ্ঞা-উপায়ের যুগলদ্ধরূপ— ইত্যাকার ব্যাপারের ফলে বাহিরের দিক হইতে লালসার লোলতা যেভাবে রিরংসাকে উদগ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সে মত-বাদ শ্রদ্ধা করা কঠিন। তন্ত্র কোথাও 'পর্ণোগ্রাফি', কোথাও কামসংহিতা, কোথাও বা ভোগায়তন দেহের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাই ব্যক্তিগত অভিরুচিকে নিষ্ক্রিয় তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত করানো সহজ নহে। শশিভূষণকে এই 'ক্ষুরস্য ধারা'-র উপর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে হইয়াছে। তন্ত্রের মূলতত্ত্ব,

তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, সাধ্য-সাধনায় তন্ত্রের প্রয়োগ, বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব ও নির্বাণের স্বরূপ নির্ণয়ে তন্ত্রের সহায়তা, পরবর্তীকালে মহাযানের উপশাখা সমূহের দার্শনিক ভূমি প্রস্তুতিতে তন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে শশিভূষণের মৌলিক অনুসন্ধান গবেষণাক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেইদিক হইতে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শশিভূষণের 'An Introduction to Tantric Buddhism' একখানি উৎস-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইবে।

উল্লিখিত গবেষণাগ্রন্থে দেখা যাইতেছে, চর্যাগীতিকার দার্শনিক পটভূমি বিচার করিতে গিয়া শশিভূষণ ছাত্রজীবন হইতে বৌদ্ধধর্মের শেষপর্বের রূপান্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের মহাসমুদ্রের মতো রত্নগর্ভ চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া এবিষয়ে শশিভূষণেরও কৌতূহল জাগ্রত হয়। সুরেন্দ্রনাথের দীপশিখা হইতে শশিভূষণ নিজের অন্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের গবেষণালব্ধ সূত্রের সাহায্যে অধিকতর ব্যাপক পটভূমিকায় তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা-সম্পর্কিত উক্ত গবেষণাগ্রন্থটি ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি ইহার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু এতবড় গুরুতর কর্ম সম্পাদনের পর তিনি ক্ষণমাত্র বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই আর একটি দুরূহ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করিলেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের দুই বৎসরের মধ্যেই পি-এইচ. ডি. উপাধিলাভের জন্য 'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature' রচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিলেন (১৯৩৯) এবং অচিরে (১৯৪০) উক্ত বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই শশিভূষণ প্রবীণতার জ্ঞানগৌরবে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। পূর্বের গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং ঈষৎ সীমাবদ্ধক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম চালাইয়াছিলেন। উপরন্তু উক্ত আলোচনাটি অ্যাকাডেমিক ও দার্শনিক ধরনের হইয়াছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল অল্প। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত লইল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পুঁথিপত্রের ধূলিধূসর কলেবর ঝাড়িয়া মুছিয়া শশিভূষণ সেকালের বাঙালী-জীবনের এক গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন।

বিবিধ, বিচিত্র ও রহস্যবাদী 'কাল্ট' (cult) এবং নানা উপসম্প্রদায়ের বিচিত্রতর অধ্যাত্মচেতনা, সংস্কার, অধিমানসের ব্যঞ্জনা, আচার-আচরণের দুর্জ্ঞেয় টটেম (totem) তত্ত্ব প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক ব্যাপার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কারকে যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, হোমো-আলপাইন, প্রোটো-নর্ডিক, মেলানিড, ইণ্ডিক প্রভৃতি নানাবিধ জনসম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে পূর্ব-ভারতে যে বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, চলতি কথায় তাহাকে বলে বাঙালী জাতি। কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মিশ্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক কটাহে। আকারে-আয়তনে বাঙালী উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সদাসর্বদা গঙ্গা-যমুনার মতো দুইটি পৃথক ধারা দেখা যায় না। গাত্রবর্ণে, আয়তনে, নাসাকর্ণের মাপে এবং মুণ্ডের গোলত্বে অনেক সময়ে নৈকষ্য-কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে জল-অচল অন্ত্যজবর্ণের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মহাকালের সূপশালায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ইতর-ভদ্র, জলচল ও জল-অচল— সমস্ত বিচিত্র ও বিপরীত নরগোষ্ঠী একসঙ্গে 'সুপক্ব' হইয়াছে। তাহারই নাম বাঙালী জাতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি বিচার করিলে দেখা যাইবে, দুইটি বড়ো বড়ো সংস্কৃতির ধারা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে সুগ্রথিত করিয়াছে। একটি আদিম জীবনধারা, আর একটি পরবর্তিকালে-অর্জিত ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাবংশবাহী (অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থরাজি) ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা। মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, শিবায়ন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ভবানন্দের 'হরিবংশ' (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতি কাব্যে আদিরসের উল্লাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল-বাউল, সাঁইগুরু, কর্তাভজা প্রভৃতি রহস্যবাদী সাধকদের যৌন প্রতীক আশ্রয়— এগুলির মধ্যে সেই আদিকালের জীবনচেতনা অস্পষ্টভাবে রহিয়া গিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত-গীতিসাহিত্য— ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যের পরিস্রুত ধারাও আছে। কিন্তু কালক্রমে এই দুই বিভিন্ন প্রবাহ এমনভাবে একাকার হইয়া গেল যে, পরে তাহাদের পৃথগ্‌ভাবে চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। কিন্তু বাহিরের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেই সেই পুরাতন রূপের আভাস পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগে বাংলা

সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে যে সমস্ত লোকধর্ম (অর্থাৎ আদিম সংস্কারের ধ্বংসাবশেষ এবং পুরাতন যুগের যৎসামান্য) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মধ্যেই এজাতির পৈতৃক সংস্কারের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। শশিভূষণ বাঙালীর সেই পরিচয় আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মৃত্তিকা-খননকার্যে একাকী প্রস্তুত হইলেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে বাঙালীর সে-কুলপরিচয় আবিষ্কার করা যাইবে না। সকলের উপর ক্রান্তদর্শী সাহিত্যবোধ না থাকিলে বাঙালীচেতনার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের স্থলে শুধু 'পাথুর্‍্যা প্রমাণ' অকাশস্পর্শী হইয়া উঠিবে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শাখার সঙ্গে শশিভূষণ গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। আবার অপরদিকে সাহিত্য-সংক্রান্ত সহজাত রসবোধ তাঁহার সমস্ত চেতনাকেই নিয়ন্ত্রিত করিত—এই ব্যাপারে তাঁহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই চলে। তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রহস্যাচার ও দুর্জ্ঞেয়তাকে তিনি বুদ্ধির সীমার মধ্যে অবধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে সেই চাবিটির সাহায্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল স্বরূপ বিশ্লেষণের নিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।

'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature'-এ চর্যাগীতিকা ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায়, নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য, ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য— মোট পাঁচটি প্রধান উপ-ধর্মশাখা তাহাদের দর্শন, কৃত্য ও সাহিত্যরূপ লইয়া শশিভূষণ সবিস্তারে গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তত্ত্বালোচনাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক আদর্শ এবং অ-পৌরাণিক— গ্রাম্য, অপ্রচলিত ও রহস্যভরাতুর বিশ্বাস— উভয় রীতিই এ সমস্ত উপসম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। শশিভূষণ এই সময়ে গুরুমুখী ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে অতি তরুণ বয়সেই বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বশে রহস্যবাদী উপসম্প্রদায়ের তুচ্ছ সাহিত্য-নিদর্শনকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার এবং পৌরাণিক তান্ত্রিক ও বৌদ্ধসংস্কারের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বাঙালীর অভিনব মানসপ্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে অবস্থিত বাঙালীর মিশ্র চিত্তপ্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যতের পণ্ডিতসমাজ শশিভূষণকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিবেন।

৩.

ইহার পর আমরা শশিভূষণের অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে মোট দুইখানি গবেষণা পুস্তকের উল্লেখ করিব। এইগুলি তাঁহার প্রবীণ জীবনের প্রথম ভাগে রচিত। তন্মধ্যে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে' এবং 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থ দুইখানিতে তাঁহার পরিপক্ক বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থটি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই একটি অতি-মূল্যবান গবেষণাকর্ম বলিয়া বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। রাধা চরিত্রের মূল বেদে না পুরাণে, অথবা অর্বাচীন কালের লোক-সাহিত্যে প্রোথিত, তাহা লইয়া ইতিপূর্বে নানা তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচিত্ররূপিণী নারীচরিত্রের মধ্যে যে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শশিভূষণ সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ মন্থন করিয়া রাধা চরিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে 'রাগানুগা' ভক্তিধর্মের প্রভাবে সাহিত্যের বিকাশ-পরম্পরাকে নূতনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রাধাতত্ত্বের মূলকথা শক্তিতত্ত্ব। বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তাই গোত্রগত সম্পর্ক আছে— যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাহার সবটা ধরা পড়ে না। বাংলা-দেশের মধ্যযুগে বাঙালীসমাজ দুই নারীর ভজনা করিয়াছিল। একজন রাধা— যিনি কুলত্যাগিনী ; ভাববৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লোকেই তাঁহার নিত্য অভিসার। ইহা যেন অনন্ত সৌন্দর্য ও অনশ্বর প্রেমের সন্ধানে উধাও হইবার রোমান্টিক অভীপ্সা, বিজ্ঞানের ভাষায় 'সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স' (centrifugal force)। আর জন উমা— যিনি কুলকন্যার প্রতীক। উমা-পার্বতীর মধ্য দিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি ঘরের মেয়ের রূপ ধরিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি, 'সেন্টিপেটাল ফোর্স' (centripetal force)। বাঙালীর চিত্তগহনে এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সুপ্রাচীন কাল হইতে। সেই তত্ত্বের

পটভূমিকায় শশিভূষণ রাধাতত্ত্বকে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বসাধারণের হইলেও শশিভূষণ সমগ্র ভারত ঐতিহ্যের আদর্শেই এই তত্ত্বের বিকাশ আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধাতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কিশোরী-ভজনের অতি গূঢ় দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে, সমগ্র ভারতের প্রায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তসম্প্রদায়ের নানা শ্রেণী, শাখা ও প্রস্থানের বিবরণ দিয়া এই বিচিত্র কাল্ট (cult)-এর দার্শনিক ভিত্তিভূমি এবং তাহার সঙ্গে অন্বিত হইয়া আছে যে বিশেষ ধরণের সাধ্যসাধন তত্ত্বকথা, তাহাকে শৈব ও বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমিকায় নবরূপে আবিষ্কার এবং তাহার যথাযথ মূল্য বিচার করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে নিজ ভাব-ভাবনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

> 'বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ— বিশেষ করিয়া রাধাবাদ আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক, ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমাদের মনকে নাড়া দিয়াছে, সুতরাং জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি— সেই লক্ষ্য নূতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি রাধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাবে সে বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শক্তিবাদে। ( 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে', প্রথম সংস্কারণের বিজ্ঞাপন )

সমগ্র ভারতীয় মানস, বিশেষতঃ বাঙালীর অধিমানস, রাধাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে রসসাহিত্যে ও মননসাহিত্যে বিকাশলাভ করিয়াছে, কখনও আবেগকে, কখনও চিন্তাকে, কখনও উভয়কে প্রভাবিত করিয়া যুগপৎ ধর্মসাধনা ও সাহিত্যসাধনাকে নব নব বৈচিত্র্যের সম্মুখীন করিয়াছে, শশিভূষণের গ্রন্থে সেই জাতিগত ঐতিহ্য-সংবাদটি গবেষণার আকারে বিবৃত হইলেও আসলে শিল্পীর রস-সংবেদনই তাঁহাকে এই কষ্টসাধ্য কর্মে প্রেরণা দিয়াছে।

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ( রাধাবাদী )—এই শাখাত্রয় যে মূলতঃ একই ভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে-ভাবটি যে আদ্যাশক্তির কায়ব্যূহ, এই তত্ত্ববাদ—ইহাকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় গবেষণার

আকাশে তিনি একটি উজ্জ্বল তারকারূপেই স্বীকৃত হইবেন। তাঁহার এই গ্রন্থটির সর্বভারতীয় মর্যাদা ও ব্যাপক প্রসার অন্য প্রদেশবাসীদেরও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে। তত্ত্বদর্শনের দিক হইতে গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের যে রাখীবন্ধন হইয়াছে, ইহার সমস্ত গৌরব শশিভূষণের প্রাপ্য— যদিও নীরব ও নিরলস কর্মযোগী কোন খ্যাতি গৌরব কামনা করেন নাই। যে কোন আত্ম-প্রচারের প্রতি তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্য ছিল। তাই এই মহাগ্রন্থ তাঁহাকে যে কতটা গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না। এখন তিনি দিব্যধামবাসী, সুতরাং আজ এ-কথা বলিতে কোনও সঙ্কোচ নাই যে, ইদানীং গবেষণার নামে যে গুরুভার তথ্যপুঞ্জ ক্রমেই বিকটাকার লাভ করিতেছে, তাহার তুলনায় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের জর্মান-পণ্ডিতসুলভ এই বিপুল সৃষ্টি আগামীযুগের মননের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচিত না হইলে শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের যথার্থ সম্পর্ক ধরা পড়িত না। অবশ্য এটি গবেষণাগ্রন্থ হইলেও রসজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থ হইতে শুধু 'জ্ঞান-নিষ্ফল'-ই নহে, তাহার সঙ্গে মানসিক আরামও পাইবেন প্রচুর। একাধারে 'Literature of Power' এবং 'Literature of Knowledge'-এর চমৎকার সমন্বয় ইদানীং গবেষণাগ্রন্থে খুব অল্পই চোখে পড়িবে। এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা অবলীলাক্রমে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের তত্ত্বসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। কাঞ্চী-কেরল-অন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারি। গান্ধার-পুরুষপুর-তক্ষশীলা হইতে ব্রহ্মাবর্ত-আর্যাবর্ত পরিক্রমাতেও বাধা নাই। পরিশেষে অঙ্গ-দ্বারবঙ্গ-তীরভুক্তি পার হইয়া গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম-সমতট-হরিকেল-প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত একই অয়নরেখাকে অনুসরণ করিতে পারি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে আধুনিক যুগের রাজনীতিসর্বস্ব স্বদেশানুরাগ-মূলক রাষ্ট্রিক ঐক্যচেতনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী বিশেষ-বিশেষ ধর্মচেতনা, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আধিমানসিক সত্তাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা শশিভূষণের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' হইতেই প্রতিভাত হইবে। মোট কথা, এই গ্রন্থ তত্ত্বদর্শন ও সাহিত্যরূপে যতটা মূল্যবান, ভারত-ঐতিহ্যের স্মারকসূত্র হিসাবেও ততটা মূল্যবান।

৪.

শশিভূষণের বহুখ্যাত ও পুরস্কারে সম্মানিত গবেষণাগ্রন্থ 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য' ১৩৬৭ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্বের গ্রন্থেরই পরিপূরক। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' আলোচনা প্রসঙ্গে শশিভূষণ ভারতীয় আধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রকৃতি যে শক্তিকেন্দ্রিক, সে বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হন এবং সেই নিরিখে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তত্ত্ববাদ, দর্শন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শক্তি তত্ত্বকথা এবং শাক্ত সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রথমে তিনি প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দর্শন ও সাহিত্যে শক্তিদেবীর স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কীভাবে আদ্যাশক্তিরূপে উমাপার্বতীর আবির্ভাব হইল, কেমন করিয়া ইতিহাস ও জনমানসের নানা স্তর পার হইয়া শিবের অর্ধাঙ্গিনী বাংলা দেশে এক বিচিত্র রূপলাভ করিলেন— শশিভূষণ এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত এবং চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। রামায়ণাদি অনুবাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গল-কাব্যাদিতেও শক্তি দেবতার বিকাশ হইয়াছে, বিশেষত মঙ্গলকাব্যের, পার্বতী-চণ্ডী-দুর্গা-অভয়ার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ বাঙালীর আদিম আরণ্য সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে হর-পার্বতীর উপাখ্যান আছে যাহাতে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে নিজ পূজা প্রচারের জন্য দেবীকে বিশেষ তৎপর হইতে দেখা যায়। এই কাব্যে প্রয়োজন স্থলে তাঁহাকে নির্মম হইতে হইয়াছে, পূজালাভের জন্য কিছু নীচতাও আশ্রয় করিতে হইয়াছে। ইহা আদিম মনের লক্ষণ। একদা নিষাদ ও পাহাড়ী জাতির মধ্যে পশু-অধিষ্ঠাত্রী এবং কান্তারবাসিনী কোন-এক শিকারের দেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে এবং পৌরাণিক যুগে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রাক্কালে এই অরণ্য-বাসিনী আদিম-দেবীকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণ করা হইল। ইহার উপর উত্তর-পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের পালিশ পড়িলেও এই দেবীর পরিকল্পনায় আর্যেতর বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল। লোভ, স্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা— এগুলি মঙ্গলকাব্যের চণ্ডিকাচরিত্রে নিতান্ত অপ্রতুল নহে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শাক্তসাহিত্য মঙ্গলকাব্যের অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া আর-একটি শাখাপথ খনন করিয়া লইল। ইহা শাক্ত গীতিকা। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি

মাতৃতন্ত্রের ভক্তসাধক ও কবিগণ মঙ্গলকাব্যের শক্তিকেই মাতৃরূপে দেখিলেন, আপনাকে অসহায় শিশুর মতো কল্পনা করিয়া সর্বশক্তিময়ীর অঞ্চলতল আশ্রয় করিলেন।

বহুকাল ধরিয়া বাংলাদেশ তন্ত্রের দেশ বলিয়া পরিচিত। বেদগোপ্য সাধনায় শির স্থিত সহস্রারের সহস্রদলে শিবশক্তির সামরস্যসম্ভূত দিব্যানন্দ লাভ করা, নিজ দেহেই মোক্ষপ্রাপ্তি, ভুক্তি-মুক্তিকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া — তন্ত্রসাধনার ইহাই রীতি। এদেশের তন্ত্রসাধকেরা গুরুশিষ্যানুক্রমে মন্ত্রগুপ্তির রীতিতে ইহাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এখানে-ওখানে তন্ত্রাচারের যৎসামান্য উল্লেখ থাকিলেও এই তত্ত্বকথা ও কৃত্য এই যুগের সাহিত্যকে প্রবল-ভাবে প্রভাবিত করে নাই। কিন্তু উমাপার্বতী ও মেনকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সাধক ও ভক্তসমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে— যদিও শাক্ত কবি ও সাধকগণ কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের ভারতব্যাপী ঐতিহ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য শশিভূষণ অন্য প্রদেশের ভাষায় রচিত কাব্য ও গান হইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শাক্তধর্ম ও শক্তিসাহিত্যকে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নানা অঞ্চল হইতেই এই তত্ত্বদর্শনের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, অবশ্য বাংলার শাক্তসাধনা ও শাক্তসাহিত্যই তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়। কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রের একটি বিশেষ সাধনপ্রণালী যেমন দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকশিত হইয়াছে, তেমনি আদ্যাশক্তির মানবীমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার ভক্তিসাহিত্য ( মূলতঃ গীতিসাহিত্য ) বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। বাৎসল্যভাব এ শক্তির মূল উপাদান। মাতাপুত্রের মানবীয় লীলা এই ভক্তিশাখার আলম্বন-বিভাব। বৈষ্ণব সাধ্যসাধনার আদিরসাশ্রিত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা পরবর্তী কালে অনধিকারীর হস্তক্ষেপের ফলে অমেধ্য গৌড়ীসুরায় পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাক্ত ভক্তিসাধনার সেইরূপ কোনও বিকার দেখা দেয় নাই। কারণ মাতা-পুত্রের চিরপবিত্র বাৎসল্যরসের সম্পর্ক কোনও প্রকারেই বিকৃত হইতে পারে না।

শশিভূষণ তথ্য, তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদান হইতে

শাক্তদর্শনের মূল রহস্যের সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয়টিকে তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেখিয়াছেন, সেইপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন 'বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে; একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্মিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিতে হইবে এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না··· ঐতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাঁহারা জোর দিতে চান তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্যঘটনা দ্বারা সে জাগাইয়া তোলে ভাবব্যঞ্জনা; সেই ভাবব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদৃষ্টির রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনায় সত্য-মানুষের চিত্তভূমিতে তাহার যত রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশাকরি এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলিবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্ম-দৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও হয়, তথাপি কালে কালে যে-সব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ, তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারি না। ('ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য', নিবেদন।)

এখানে তিনি তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্টভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। শাক্ত ভক্তির যেটুকু 'সাধনসমর', সেটুকু ব্যক্তিসাপেক্ষ; আর বাকি অংশটুকু বস্তুপ্রবাহের উপরেই ভাসমান। সুতরাং এই সাধনার যেমন একটি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নির্বিকল্প সত্তা আছে, তেমন এই বিবর্তনের পিছনে দেশকালের প্রভাবও অল্প নহে। এই দুইয়ের যুক্তরূপ দর্শনই যথার্থ তাত্ত্বিক ও গবেষকের দৃষ্টি। শশিভূষণ শাক্ত ভক্তিবাদ ও দর্শনকে যেমন অধ্যাত্মমার্গের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন, তেমনি আবার আয় পাঁচটি বিকাশধর্মী চিন্বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করিয়াও দেখিয়াছেন। তত্ত্বদর্শন ও ইতিহাস-দর্শন তাঁহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অধিকতর স্বচ্ছ করিয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহার এই গ্রন্থ দিঙ্‌নির্দেশক বলিয়া গৃহীত হইবে।

উপরে আমরা শশিভূষণের যে প্রধান চারখানা গবেষণা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, সেগুলি ছাড়াও সাহিত্যবিচার, অলঙ্কারশাস্ত্র, হিন্দুধর্মের গঠন-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকসমাজে বিশেষ-

ভাবে পরিচিত। আসলে তাঁহার মনের বাতায়ন সব সময় খোলা থাকিত। সেই বন্ধনহীন পথে নানা চিন্তা ও তত্ত্বকথা অবাধে প্রবেশ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে 'দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্দান্ত সিদ্ধান্তে'-নিমগ্ন ভীতিকর গবেষক বলাও ঠিক হইবে না। গবেষণাকে কৌতুহলের রসে মিশাইয়া পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়া তিনি আধুনিককালে তত্ত্বগ্রন্থেব একটি বিচিত্র মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

অকালে শশিভূষণ বিদায় লইয়াছেন, আকস্মিকভাবে মৃত্যুদূত আসিয়া তাঁহার কর্মোদ্যমে ছেদ রেখা টানিয়া দিয়াছে। ভারতের 'শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্যে' তিনি দক্ষিণভারতের শক্তিসাধনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পান নাই। কারণ এই বিষয়ে ইংরাজীতে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সবটা নির্ভরযোগ্য নহে। যে তথ্যগুলি second hand উৎস হইতে পাওয়া যাইতে পারিত, তিনি তাহার উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> 'অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার অধিকার থাকলেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম; কিন্তু তাহাও নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ধারকরা তথ্য অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার সংকল্পও পোষণ করিতেছি।'—ঐ

তাঁহার এই মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণভারতীয় ভাষা শিখিয়া তিনি ঐ ভাষায় রচিত শাক্তসাহিত্য ও শাক্তদর্শন পাঠ করিবেন এবং পরে তাঁহার রচনায় দক্ষিণভারতীয় উপাদান সংযুক্ত করিবেন— এই ছিল তাঁহার মনোগত অভিলাষ। কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিল না, এ গ্রন্থের ক্রোড়-অঙ্ক কোনও দিন অভিনীত হইবে কিনা কে বলিতে পাবে ?

৫.

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শশিভূষণ চর্যাগীতিকার এক মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' বিভাগের সংস্কৃতের অধ্যাপক আরনল্ড বাকে ছিলেন গানপাগল। রবীন্দ্রনাথের দ্বীপময়-ভারত পরিক্রমার সাথী

বাকে সাহেবের কথা অনেকের মনে পড়িবে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও অনুরাগী বাকে এক নেপালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিচিত্র গান শুনিয়া তাহাকে লোকসঙ্গীত মনে করেন এবং সেই সন্ন্যাসীর অনেকগুলি গান টেপ-রেকর্ড করিয়া লন। লণ্ডনে তিনি শশিভূষণকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন। বাকে অনুমানে বুঝিয়াছিলেন যে সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের। গানগুলি শুনিয়া শশিভূষণের মনে হইল, ইহাই তো অতি পুরাতন বজ্রযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের ভজনগীতিকা। বাকে সাহেবের কাছে তিনি এই শ্রেণীর বাইশটি গানের সন্ধান পাইয়াছিলেন— যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচটি গানে হাজার বছরের পুরাতন স্বর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁহার আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর গানের নমুনা উল্লেখ করা যাক:

এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্রা
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দা।
পেখুরে অনুস্মিন লোয়নে গয়নে
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ রঅনে ॥ ধ্রু ॥
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সর্ব একা
সমুদ্রতরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন দুয়ি ভেদি দিঢ় থিরে চিআ
জলয়ি বজ্রানল দহদিহ দাহিয়া।
সুগত ভেদ ভাবয়িয়া ন হোয়ি রে স্বধা
সুগতবজ্র ভণ অচিন্তালয় বোধা ॥

(শশিভূষণের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত)

সুগতবজ্রের এই পদটি চর্যাগীতিকারই অনুরূপ। অনেকে মনে করেন, বাংলা হইতে পলাতক চর্যাগীতিকাগুলি নেপালে আশ্রয় লওয়ার পর ইহার কিছু অংশ তিব্বতে চলিয়া যায়, তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। কালক্রমে হিন্দু-ধর্মের দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতার জন্য এই দেশে প্রকাশ্যভাবে চর্যা-গীতিকার ব্যবহার লুপ্ত হয়া যায়। কিন্তু শশিভূষণ অধ্যাপক বাকে-পরিবেশিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারিলেন, এখনও দার্জিলিং, নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধ গুম্ফায় চর্যার অনুরূপ গীতিকার ব্যবহার আছে। নেপালী ভাষায় ইহাকে বলে 'চা-চা' গীত। মনে হয়, 'চা-চা' শব্দ চর্যারই অপভ্রংশ। সেই সমস্ত পুরাতন তথ্য উদ্ধারের

জন্য শশিভূষণ দেহে কালব্যাধিভার লইয়াও সেখানে গিয়াছিলেন এবং চর্যার আধুনিক উপাদান-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্রযান ও সহজযানের সাধনভজন বিষয়ক গীতিকা হইলেও পরবর্তিকালে ইহাতে ব্রাহ্মণ্য শাক্ততন্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাই এই সমস্ত আধুনিক পদের অনেক স্থলে বৌদ্ধমতবাদের সঙ্গে শাক্ততন্ত্রের অনেক তত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে। 'নৈরামণি'-কে উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডিকায় পরিণত করিতে ভক্তসাধকদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই।[৩] 'বাচ্ছলী শ্রীবজ্রযোগিনী' কোন কোন চা-চা গীতে (চর্যাগীতে) প্রায় শাক্ত মাতৃকামূর্তিতে পর্যবসিত হইয়াছেন। নিম্নে এইরূপ একটি বজ্রযানী-শাক্তভাবমিশ্রিত পদের উল্লেখ করা যাইতেছে:

—বারাহিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডলমধ্য স্থিতা।
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগম্বরা ॥ ধ্রু ॥
প্রণমামি বাচ্ছলী শ্রীবজ্রযোগিনী অনুত্তর-বোধি-প্রদায়িনী।
দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনি লোচনা লৌহিত বর্ণ প্রজ্বলিতা ॥
ত্রিভুবনব্যাপিনী দহিন করোটিধারী মজ্জপূরিত কপালধারী।
চক্রী-কুণ্ডল-কণ্ঠীধারী হাথে লোচক বিভূষিণী ॥
চরণে নৌপুর দহিন কটিয়ে মেখলা নরশিরমালা বিভূষিতা।
বিশ্বজননী পরম গুহ্যেশ্বরী ভবভয়তারিণী বীরেশ্বরী
সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী সিদ্ধি ঋদ্ধি চরণ প্রসাদদায়িনী।

শশিভূষণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ সহজিয়া মত ও শাক্তমতের এক বিচিত্র রসায়নের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করা সম্ভব হইবে। খ্রীঃ একাদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বিশেষ কোন বাংলা গ্রন্থ হস্তগত হয় নাই। অথচ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক বাংলা ভাষার রচিত চর্যা-গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাহার যৎসামান্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। অসুস্থ শরীরেই শশিভূষণ পদগুলির ভাষা ও বক্তব্য বিষয় ধরিয়া একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করেন এবং প্রথমদিকে অল্প কয়েকটি পদে পাঠান্তর ও টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া নব-আবিষ্কৃত পদগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অভিলাষ করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই গীতিকাগুলি

হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বস্তুতঃ বন্ধ্যানহে, খুব সম্ভব বজ্রযানী-সহজযানী চর্যাগান এই দুই শতকে এবং তাহার পরেও অনুশীলিত হইয়াছে। এইভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিল না, মৃত্যু আসিয়া যবনিকা টানিয়া দিল। জানি না, এপথে আবার কোন্ নূতন পথিক আসিয়া অতীতের বাণীকে মূকত্বের অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

## পাদটীকা ও বিবিধ তথ্য

১. জন্ম— ১৯১১; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পি. আর. এস— ১৯৩৭; পি-এইচ. ডি— ১৯৩৯; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে স্থায়িভাবে অধ্যাপকের পদে যোগদান— ১৯৩৯; রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহের সর্বাধ্যক্ষ ১৯৫৬; মৃত্যু-২১শে জুলাই, ১৯৬৪

২. শশিভূষণ রচিত গ্রন্থাদি :

উপনিষদে পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস; উপমা কালিদাসস্য; কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায়; ক্ষণদর্শন; ঘরে বাইরে সাহিত্য-চিন্তা; ছুটির দিনে মেঘের গল্প; ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ; ছোটদের ছোটগল্প; ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ; ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত; জঙলা মাঠের ফসল, টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ; ত্রয়ী : বাল্মীকি ও কালিদাস, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ; নিরীক্ষা; নিশি ঠাকুরের কড়চা; বাঙলা সাহিত্যের একদিক; বাংলা সাহিত্যের নবযুগ; বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি: বান ও বন্যা; ভারতীয় সাধনার ঐক্য; ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য (আকাদামি পুরস্কার); মিল্টনের অ্যারিওপ্যাগিটিকার অনুবাদ (সাহিত্য আকাদেমি); রাজকন্যার ঝাঁপি; শিল্পলিপি, শ্যামলা দীঘির ঈশাণ কোণে; শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে; সাহিত্যের স্বরূপ; সীতা; হাবা হলধর; **Aspect of Indian Religious Thought; An Introduction to Tantric Buddhism; Obscure Religious Cults as Background of Bengali Lterature.**

সাময়িক পত্রাদি ও নানা সঙ্কলনে ডঃ শশিভূষণের কিছু কিছু রচনা বিক্ষিপ্ত

ভাবে রহিয়াছে।

৩. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত নবচর্যাগীতিসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদসংগ্রহে দেখা যাইতেছে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী এবং তাহার পরে রচিত বলিয়া অনুমিত পদগুলিতে 'নৈরামণি' 'যোইনি', 'বাচ্ছলি', 'বজ্রবারাহী,' 'বজ্রযোগিনী' প্রভৃতি বজ্রযানী দেবীরা ক্রমে ক্রমে দেবী কালিকায় পরিণত হইয়াছেন।

## মোহিতলাল : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

১৯৪১ সালে এম. এ ক্লাসে ভর্তি হইবার পর মোহিতলালের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং সমালোচনা-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম। অবশ্য তাহার পূর্বেই বি. এ. ক্লাসে ছাত্রাবস্থায় আমার অগ্রজতুল্য এক মহদাশয় ব্যক্তির কথা মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন : যদি সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাইতে চাও, তাহা হইলে মোহিতলাল পড়ো। মোহিতলালের সমালোচনা গ্রন্থ, আহার ও ঔষধ, দুই বিষয়েই লাগিবে। পরীক্ষা-জলধি অক্লেশে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, আবার তাহার সহিত ফাউ জুটিবে সাহিত্য-বোধ ও শিল্প-বিশ্লেষণ শক্তি। তাঁহারই উপদেশে মোহিতলালের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম, তাহার সহিত ম্যাথু-আর্নল্ড পড়া চলিতে লাগিল। প্রথমে হাতে আসিল 'সাহিত্যকথা'। পড়িয়া তাজ্জব বনিয়া গেলাম। এ গ্রন্থের অনেক কথাই বেশ দুষ্পাচ্য বোধ হইল, এবং যাহা বোধে ধরা দিল, তাহাও কেমন এক নূতন ধরণের কথা, ইতিপূর্বে যাহার স্বাদগন্ধ পাই নাই।

সংবাদ পাইলাম ঢাকা হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র দু-একখানি পুরাতন কপি তখনও বাজারে ছিল। কলিকাতায় মিলিল না, ঢাকা হইতে ডাকযোগে আনাইয়া লইলাম। এই গ্রন্থ হইতেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আসমান-জমিনের যথার্থ পরিচয় পাইলাম। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কাব্যগুলি সংগ্রহ করিলাম। পরে কলিকাতা হইতে তাঁহার 'বিচিত্র কথা' ও 'বিবিধ কথা' বাহির হইল। শেষে একদিন মরিয়া হইয়া তাঁহার ঢাকার রমনাস্থিত নীলক্ষেতের বাসার ঠিকানায় একখানি পত্র দিলাম, এবং দুরু দুরু বক্ষে তাহার উত্তর আশা করিতে লাগিলাম। বলাই বাহুল্য, সে চিঠিতে পৌগণ্ড-উত্তীর্ণ কাঁচা বয়সের ধূম্র-সলিল-মরুৎপূর্ণ আবেগের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। অচিরে তাঁহার একখানি পোস্টকার্ড পাইলাম। তিনি দূর হইতে এক পড়ুয়া ছাত্রের আবেগোত্তপ্ত চিঠি পাইয়া বোধ হয় মনে মনে হাসিয়াছিলেন। পত্রে জানাইলেন, বিদ্যা-সাগর কলেজের কক্ষে সাহিত্য সেবক সমিতির সভায় তাঁহার যোগদানের সম্ভাবনা আছে। যথানির্দিষ্টদিনে হাজির হইলাম। ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ ( কে. ডি.

ঘোষ ), অধ্যাপক সুশীলকুমার দে এবং আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন প্রথম মোহিতলালকে দর্শন করিলাম। বেশ কৃষ্ণবর্ণ, ছাঁটা বাটারফ্লাই গুম্ফ, ভারী ভরাট মুখ, একমাথা সুচিক্কণ কেশদাম। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসনে বসাইয়া দিলেন। কবিতা পাঠ ও ছোটখাট বক্তৃতার শেষে ঘোষিত হইল, কবি-সমালোচক মোহিতলাল পাঠ করিবেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের "কঙ্কাল" গল্পটি স্রেফ পড়িয়া গেলেন। দুই শতেরও অধিক শ্রোতায় পূর্ণ সে সভাগৃহ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দূরের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ট্রাম বাসের কিঞ্চিৎ কলরব। রবিবার, সুতরাং কলেজে ছাত্রদের গুঞ্জনও বন্ধ। পড়া চলিল। কোথা দিয়া আধঘণ্টা কাটিয়া গেল বুঝিতে পারি নাই। গদ্য পাঠও যে এমন অপূর্ব রসরূপ ধরিতে পারে, গল্পও যে গীতিকবিতার মতো রমণীয় মনে হইতে পারে, তাহা সেদিন তাঁহার পাঠ হইতে বুঝিয়াছিলাম। তারপর তাঁহার নিজের কণ্ঠে এবং কলিকাতা বেতারে তাঁহার কত আবৃত্তি শুনিয়াছি। কিন্তু প্রথম দিনে সেই পাঠের স্মৃতি এখনও মনে গাঁথা রহিয়াছে। সভান্তে নিজ পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি মিনিটখানেক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বলিলেন যে, আমাকে যেন স্কুলের ছাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা নিন্দা কি প্রশংসা বুঝিতে পারিলাম না। দুই-চারি কথার পর যাহা বলিলেন তাহাও অল্প মারাত্মক নহে। বলিলেন যে, বি. এ. পাস করিয়া আমি যেন ঢাকায় এম. এ. পড়িতে যাই। কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকগণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজাপাদ অধ্যাপক সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা একমাত্র তাঁহার মুখেই শোভা পাইত, অন্য কেহ আমার alma mater সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করিলে আমিও তাহার ঝাঁঝালো জবাব দিতাম। কিন্তু তাঁহার নির্মম নীরস তিক্ত মন্তব্য মাথা নীচু করিয়া হজম করিলাম। তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গেলে মাঝে মাঝে পত্রালাপ চলিতে লাগিল, আমি পাঁচখানি লিখিলে তিনি একখানিতে উত্তর দিতেন। পোস্টকার্ডের দুই পিঠে ঘেঁষাঘেঁষি পংক্তির কালো মুক্তার সারির মতো সাজানো লেখা। তার পর ভাগীরথী ও বুড়ীগঙ্গা দিয়া অনেক জল বহিয়া গেল —ঘোলা জল, কখনো রক্তে রাঙা। অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কিছুদিন বাগমানের কুলগাছিয়া, তারপর বেহালায় সখের বাজারের নিকট বাস করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতা কলেজে চাকুরি লইয়া সাহিত্যের

ছাত্রদের মস্তক যাঁতাকলে ফেলিয়া মহানন্দে চূর্ণ করিতেছি। ছুটি-ছাটার দিনে বাস যোগে সখের বাজারে পৌঁছাইয়া রিকশ ভাড়া করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় হাজিরা দিতাম। মাঝে মাঝে বন্ধুবর তারাচরণ বসু অন্যতম শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন এবং পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দর্শন হইতে কোট করিয়া মোহিতলালের কবিতার কোন কোন পংক্তির সহিত সেই সমস্ত ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতেন। তাহাতে তিনি যে বেশ খুশি হইতেন তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে নানা আলোচনা, ধর্ম দর্শন সাহিত্যের নানা কথা জমিয়া উঠিত। আমরা মুগ্ধ ভক্তের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম, তাঁহার সব কথাই একতরফা হইত। কথা কহিতে সাহসে কুলাইত না। সেই আশ্চর্য সুরেলা মৃদুকণ্ঠ, চোখে যেন স্বপ্নের অঞ্জন— তিনি বলিয়া চলিয়াছেন। বসওয়েলের মতো তাঁহার সমস্ত কথা লিখিয়া লইলে পরে এক ভীমকান্তি গবেষণাগ্রন্থ ফাঁদিতে পারিতাম। তন্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি যেন অন্য জগতে চলিয়া যাইতেন। বাঙালীর আর্যেতর সংস্কার বা অন্য কোন গূঢ় কারণে তাহার জীবনে তন্ত্রের ভুক্তিমুক্তি তত্ত্ব সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় বড়োই কাজে লাগিয়াছে। দেশকালপরিব্যাপ্ত নারীশক্তির প্রবল আকর্ষণ চর্যাগীতি হইতে জয়দেব ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যদিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, তারপর মাইকেল-রবীন্দ্রনাথে তাহার বিচিত্র প্রকাশ। একদিকে অন্তঃপুরচারিণী কল্যাণী জায়া ও জননী মূর্তি, আর একদিকে কামে-প্রেমে একাকার প্রেয়সী মূর্তির বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণে পদার্থ-তত্ত্বের কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তির টানাপোড়েনে বাঙালীর সারস্বত প্রতিভার বয়নকার্য চলিয়াছে। আরও কত কথা বলিতেন, ভালো মনে নেই, তখনো সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ধারণ করিবার মতো আধার প্রস্তুত হয় নাই।

একদিন দ্বিপ্রহর, কী যেন তিনি আলোচনা করিতেছেন। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের তির্যক হাস্য। সেইদিন দৈনিক পত্রিকায় আমাদের 'সুবর্ণচন্দ্র' অ্যামবাসাডারের কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীকান্তের নতুন দাদার মতো এ-ধরনের জীব আজও ভারত সরকারের বৈদেশিক কেন্দ্র আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছেন। সেই সম্বন্ধে সরস আলোচনা চলিতেছিল। অ্যামবাসাডারকে 'অম্বাসোদর' সম্বোধন করিয়া তিনি বাঁকাভাবে হাসিতেছেন। ইতিমধ্যে গুটিকয়েক ছাত্র তাঁহার ঠিকানা সন্ধান করিয়া হাজির হইল, তাহারা হাওড়া শহরের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোন এক কলেজে অধ্যয়ন করে। তাহাদের

সনির্বন্ধ অনুরোধ, কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে যাইতে হইবে। আমরা প্রমাদ গণিলাম। এইবার বজ্রাঘাত নামিবে, আর শিশুপাল বধ হইবে। এ-সব ব্যাপারে তিনি প্রবলভাবে চটিয়া গিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেন। কিন্তু সেদিন একটু আগে আমাদের এক পূজনীয় অধ্যাপকের গ্রন্থ তছনছ করিয়া একটু স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, মেজাজটাও বেশ প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ এই বিভ্রাট। কিন্তু তিনি রাগিয়া উঠিলেন না। তাহাদের মধ্যে যে ছেলেটি মাথায় অনেক উচ্চ, তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যই বয়স অনুপাতে ছেলেটি বেশ দীর্ঘ, বাঙালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেটি লম্বা এবং কিছু শীর্ণ, এবং শীর্ণ বলিয়া তাহাকে বেশী দীর্ঘকায় মনে হয়। সে এত দীর্ঘ কেন, ফস করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। আমরাও বিস্মিত হইলাম। বেচারা একেবারে নিভিয়া গিয়া দীর্ঘ দেহটা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পাইল না। তারপর তিনি সক্ষোভে বলিলেন যে, প্রতি এক শ বৎসরে বাঙালীর শরীরের উচ্চতা গড়পড়তা এক ইঞ্চি করিয়া হ্রাস পাইতেছে। এই বিচিত্র পরিসাংখ্যিক হিসাব তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, জানি না। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই নৃতত্ত্বের হিসাবে বাঙালী জাতি বুশম্যান বা পিগমির মতো খর্বাকার হইয়া যাইবে। মেধার দিক হইতে তাহা অর্ধশতাব্দীর পূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে। মাথার দিক দিয়াও সেই দুর্ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে। 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'— এই মোক্ষম শাস্ত্রবাক্য নাকি ফলিতে বিলম্ব নাই। ছাত্রগুলি কিছু চিন্তিতমুখে প্রস্থান করিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম; সেই প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাহার মধ্যে আমরা দারাপুত্রপরিবার লইয়া আপিস-আদালত সারিয়া তাম্বুলচর্বণ ও তাম্বাকু সেবনের অবকাশে মহাপ্রস্থানের পালা চুকাইয়া ফেলিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের বক্তৃতা হইতেছে। প্রথমদিন কর্তৃপক্ষ লোকসমাগম স্বল্প হইবে অনুমান করিয়া সভায় কোন মাইকের ব্যবস্থা করেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় 'অমায়িক' বক্তার আর যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই শ্রোতার সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, দ্বারভাঙা হল ছাপাইয়া পাশের বারান্দাতেও লোক দাঁড়াইয়া রহিল। সে অপূর্ব আলোচনার বিষয়, ভঙ্গী ও বক্তার কণ্ঠস্বর অনেকের কর্ণেই পোঁছাইল না। পরদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাইকের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার সে

বক্তৃতা গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে, অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের স্মৃতি আমার কাছে এখনও অম্লান হইয়া আছে। মোহিতলাল টেবিলের উপর পদ্মাসন করিয়া উপবিষ্ট, তা না হইলে অনেকে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইত না। কলেজ স্ট্রীট দিয়া ঘড়-ঘড়ায়িত ট্রামের অবিরাম আর্তনাদে বজ্রধ্বনিও সাইরেনবৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং মোহিতলালের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরও যে সে আর্ত-নাদে ডুবিয়া যাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

দেখিলাম তাঁহার হাত পা ঈষৎ ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মহাকাল নিশানা পাঠাইয়াছে। তারপর রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া, মাইকেল মধুসূদন যে-আতুর আশ্রয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইখানে কবি মোহিতলাল চির-নিদ্রাবৃত হইলেন। অচেতন অবস্থায় তাঁহার সহিত মাইকেলের কী বার্তালাপ হইত জানি না।

মোহিতলালের গ্রন্থ পড়িয়া যে-মানুষটিকে মনে পড়ে, তাঁহার কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করিলে যিনি চোখের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সান্নিধ্যে বসিয়া বিচিত্র আলোচনা শুনিবার স্মৃতি জাগিলে তাঁহার যে-মূর্তি ভাসিয়া উঠে, তাহা একই ব্যক্তির বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। সেই অতন্দ্র সারস্বত প্রেম, পাটোয়ারিবুদ্ধি সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের প্রতি হিব্রু প্রফেটদের ন্যায় 'holy rage'— যাহা একাধারে পবিত্রতা ও দহনজ্বালার সমন্বয়— সে সব আজ হারাইয়া গিয়াছে। একালের 'নিও-ফিলিস্টাইন' ভ্রষ্টাচার বাঙালী— যাহা কিছু স্নিগ্ধ সুকুমার মনোহর, তাহাকেই যেন দুই পায়ে দলিয়া মুচড়াইয়া ক্লিন্ন পঙ্কোৎসবে মত্ত হইয়াছে। এখন সহজ নির্মম প্রত্যক্ষ সত্যকথা বলিবার এবং শুনিবার লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। তাই মিল্টনকে সম্বোধন করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া কবি-সমালোচক মোহিতলালের উদ্দেশে বলি:

Mohitlal ! thou shouldst be living at this hour,
Bengal hath need of thee

## শীল্পপতি সুকুমার সেন

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় সম্বন্ধে দুইচারি কথা লিখিতে বসিয়া আমার নিজের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়িয়া গেল। পাঠক-পাঠিকার কাছে তাহার জন্য মাপ চাহিয়া লইতেছি। বোধ হয় ১৯৪০ সালের কথা। আই. এ. পরীক্ষা দিয়া দুই মাস দম লইতেছি আর দিন গণিতেছি কবে 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' উপস্থিত হইবে। আমাদের হাওড়ার বাসাবাড়ীর নিকটেই ভূনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন পাশকরা চারুশিল্পী স্টুডিও খুলিয়া খরিদ্দারের আশায় বসিয়া থাকিতেন, পরবর্তিকালে তিনি আর্ট কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। আমি কোনো কোনো দিন তাঁহার স্টুডিওতে গিয়া ছবি দেখিতাম এবং মনে মনে সেই ছবি নকল করিতাম। কিঞ্চিৎ পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল, স্কুলে ত্রিকোণাকৃতি পরোটার সাইজে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকিয়া আগেভাগে বেশ খানিকটা হাত পাকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সাহস বাড়িলে উক্ত শিল্পীর দেখাদেখি আমিও দুটি-একটি স্কেচ শুরু করিলাম। গো-মহিষাদি প্রাণী ছাড়িয়া তখনো মনুষ্যলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই এবং যথারীতি পিতৃদেবের কাছে এই অপকর্মের জন্য ধরা পড়িয়া গেলাম। কিন্তু তিনি চটিলেন না, পুত্রের এতাদৃশ শিল্পকর্মে বোধ হয় মনে মনে খুশিই হইলেন। আই. এ. পাশ করিতে পারিলে আমাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবেন, এমন একটা আভাসও দিলেন। তাঁহার ধারণা চাকুরীর বাজারে 'হুন্নরী' কর্মের কিছু ভবিষ্যৎ আছে, শুধু কেরানিগিরি করিয়া কী হইবে। পরীক্ষার ফল বাহির হইল, নিতান্ত মন্দ হইল না, বিশেষতঃ বাংলায়। সুতরাং বাংলায় অনার্স লইতে আর কোন বাধা রহিল না। পিতৃদেব অগত্যা সম্মত হইলেন, যদিও বুঝিলেন বাংলায় দিগ্‌গজ হইলেও চল্লিশটাকা বেতনের স্কুলের চাকরি ভিন্ন ভদ্রগোছের আর কিছু জুটিবে না। তবু বাংলায় অনার্স লইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে তিনি আপত্তি করিলেন না। কপালগুণে একটা মধ্যম রকমের বৃত্তিও জুটিয়া গেল। বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হইবার কারণ, আমাদের আগের বারে, বাংলা অনার্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজ হইতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া-

ছিলেন। আমিও সেই কলেজে ভর্তি হইলাম, কোন্ আশায় বলিয়া কাজ নাই।

যদিও বাংলা অনার্সের দ্বিতীয় ব্যাচ বলিয়া গর্বে বেশ ফুলিয়া উঠিতেছি, তবু ইংরেজি ও অর্থনীতির অনার্স-পড়ুয়া সহপাঠী বন্ধুদের পাশে যেন কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া গেলাম, এখনো বোধ হয় সেই রেওয়াজ আছে। যাহা হউক, ক্লাসে পড়িতে গিয়া সর্বপ্রথম ডঃ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' হাতে পাইলাম, তাহার সঙ্গে আর একখানি বহি ফাউ হিসাবে জুটিল, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।' বলা বাহুল্য, দুটি গ্রন্থই, স্বল্পায়তন সত্ত্বেও, অতিশয় ভীতিপ্রদ, বিশেষতঃ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। বি. এ. ক্লাসে আর কতটুকুই বা ভাষাতত্ত্ব পড়িতে হইত, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট বেকায়দায় পড়িয়া গেলাম। কিন্তু পিছু হটিলে চলিবে না, অনেক ফরিয়াদ করিয়া বাংলা অনার্স লইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। সুতরাং উক্ত গ্রন্থদুটি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠের মতো পড়া শুরু করিলাম এবং কিছু আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু আরো আছে, এত সহজে ডঃ সুকুমার সেন আমাকে রেহাই দিলেন না। সেই সময়ে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ( প্রথম খণ্ড ) নামক ভীমকান্ত গ্রন্থটি চৌকা অভিধানের আকারে হরিদ্রাভ মলাটসহ বাহির হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন ও দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ লইয়া কোনওপ্রকারে কলেজ-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলাম, হায় একী দুর্দৈব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে এতটা হৃৎকম্পের ব্যাপার তাহা তো পূর্বে জানিতাম না। ইতিপূর্বে তাঁহার আর একখানি ঈষৎ শীর্ণকায় গ্রন্থ ( 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' ) খানিকটা বশে আনিয়াছিলাম। কিন্তু এই পৃথুলকলেবর ইতিহাস! ইহা আরম্ভ করিতে হইলে পবননন্দন অথবা মধ্যমপাণ্ডব হইতে হইবে। তখনো ডঃ সেনকে চর্মচক্ষে দেখি নাই, শুনিয়াছি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। তাহা হইলে সে তত্ত্ববস্তুটি কিপ্রকার ভাবিতেই শিহরণ পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' নাড়া-চাড়া করিতে গিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' মনে পড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বি. এ. অনার্স ক্লাসে ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পড়িতে গিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলাম। পুরাতন বাংলা সাহিত্য বলিতে যে এমন একটা পুঁথিঠাসা রুদ্ধশ্বাস ব্যাপার বুঝায়, তাহা কখনোই অনুমান

করিতে পারি নাই। এত কবি, এত পুঁথি তুলোট কাগজে শেষশয্যা পাতিয়া খেরোর কাঁথা মুড়ি দিয়া মরণঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের লইয়া কী করিব? আমাদের মতো সুকুমারমতি নবকিশোরদের কচি-কাঁচা মস্তকে তিনি এ কী মুষল নিক্ষেপ করিলেন! তবে একটা কথা, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসন করিবার ফলে ঐ ভয়াবহ গ্রন্থটিও একপ্রকার কব্জা করিলাম। ক্রমে বি. এ. পরীক্ষায় তো 'অনার গ্রাজুয়েট' ( শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' দ্রষ্টব্য ) হইয়া বাহির হইলাম। যাহা হউক পরীক্ষায় তাঁহার মান রাখিলাম।

যথাসময়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হইলাম। সেখানে আর এক ব্যাপারের মুমূর্ষুবৎ হইয়া পড়িলাম। ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে খোদ আচার্য সুনীতিকুমার 'রণং দেহি' রূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার ODBL তখনই বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। প্রায় তিনগুণ দাম দিয়া উক্ত গ্রন্থের পুরাতন কপি সংগ্রহ করিলাম। গুরু ও শিষ্যের গ্রন্থ ভাগাভাগি করিয়া পড়িয়া এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বৈশাখী-ঝড়ের-মতো বক্তৃতাপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে হইতে এম. এ.-র বেষ্টনী পার হইয়া গেলাম। খবরের কাগজে মুণ্ড ছাপা হইল, যদিও তাহা চিনিবার উপায় নাই। তাহা আমারও মস্তক হইতে পারে, কণ্ডু দাবানলের কৌটার বিজ্ঞাপনও হইতে পারে।

এম. এ ক্লাসে পড়িবার সময়ে আমার এক সহপাঠী দূর হইতে দেখাইলেন— ঐ যে সুকুমার সেন মহাশয়। কিন্তু কাছে যাইতে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। কি জানি মনে হইল, এখনই হয়তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন এবং উত্তর দিতে না পারিলে বলিবেন, বাড়ী যাইবার পথে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ খানি কিনিয়া লইয়া আর একবার বানানগুলা ঝালাইয়া লওয়া প্রয়োজন। আচার্য সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন। তবে তাহাকে ভাষাতত্ত্ব না বলিয়া বিশ্বতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। আমরা মুলতঃ বাংলার ছাত্র, তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের ছাত্র নহি, সে কথা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সব সময় মনে পড়িত না। তিনি অবিরাম ভাষাতত্ত্বের কামান দাগিয়া যাইতেন, এবং আমরাও মাথা নীচু করিয়া তাহা পার করিয়া দিতাম, সুতরাং প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ক্লাসের পর ODBL খুলিয়া পরীক্ষা পাশের বিশল্যকরণী গুটিকা প্রস্তুত করিয়া লইতাম, একালের পড়ুয়াদের মতো সাজেসনের জন্য হন্যে হইয়া তামাম কলিকাতা চষিয়া বেড়াইতাম না। বলা বাহুল্য তখনো ভাষার ইতিবৃত্ত জপমালার মতো

ধরিয়া রাখিয়াছি। এম. এ. পড়িতে পড়িতে দেখিলাম ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল, আমাদের শিরে আবার একটি থান ইঁট পড়িল। তবে আশ্বাসের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড কিছু হ্রস্ব আকারের। পড়িয়া বুঝিয়াছি এ গ্রন্থ পরীক্ষাবৈতরণী পারের একমাত্র ভেলা। সুতরাং আমরা, যাহারা পারগামী, তাহারা নির্ভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলাম। ডঃ সেনের আদর্শেই মাদৃশ ক্ষুদ্রজনও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার অভিপ্রায়ে পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়া গেল। ভাগ্যে পূজনীয় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বকিয়া-ঝকিয়া পুঁথিপড়া শিখাইয়াছিলেন। আখেরে সে বিদ্যা কাজে লাগিল। ডঃ সেনের গ্রন্থ হইতেই আমরা উৎসাহ পাইয়াছি, নূতন পথে চলিবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া যাহা আমাদের দান করিয়াছেন আমরা তাহা মূলধন করিয়া সাহিত্যের বাজারে কোনপ্রকারে কারবার চালাইয়া যাইতেছি।

ছাত্রজীবনে দূর হইতে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি। কিন্তু আই. এ. পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিলাম। সে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। আমাদের যুগে অধ্যাপক যতই হীরার ধার হউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে ঠিক যেন পুরা সম্মান আদায় করিতে পারিতেন না। সেবার অকস্মাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। প্রবেশিকার পরীক্ষা হইতে প্রমোশন পাইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আহূত হইলাম। শুনিলাম, ডঃ সুকুমার সেন প্রধান পরীক্ষক। মনটা আবার থতমত খাইয়া ইতি-উতি করিতে লাগিল। প্রধান পরীক্ষক আমাদের মতো অর্বাচীন পরীক্ষকদের কীভাবে দেখিবেন কে জানে। দুই-চারিখানি খাতা পরীক্ষা করিয়া তাহার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক হইয়াছে কিনা দেখাইবার জন্য অনেক ইতস্তত করিয়া তাঁহার গোয়াবাগানের বাসাবাটীতে হাজির হইলাম। এত নিকট হইতে তাঁহাকে কোনদিন দেখি নাই। আলাপ করিয়া ক্রমে ভয় ভাঙিল। তিনি তাঁহার গুরুর মতো অর্বাচীন ছোকরা অধ্যাপককে 'আপনি' বলিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, আমার অস্বস্তির সীমা রহিল না। যাহা হউক, তিনি আমাকে পরীক্ষিত উত্তরপত্র স্ক্রুটিনি করিতে বলিলে আমি আশাতীত সৌভাগ্যে কৃতার্থ হইলাম। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষক, তদুপরি আবার স্ক্রুটিনি করিবার অতিশয় স্বাদু আহ্বান। সেকাজেও

লাগিয়া গেলাম। তাঁহার বৈঠকখানায় ঢালা শতরঞ্জি পাতা, তাহার উপর খাতার বোঝা লইয়া চোখমুখে গাম্ভীর্য ফুটাইয়া স্ক্রুটিনি করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই দেখি বন্ধুবর দেবীপদ ভট্টাচার্য, হরিপদ চক্রবর্তী ও পঞ্চানন চক্রবর্তী খাতা কোলে করিয়া বসিয়া গিয়াছেন। আমরা শতরঞ্জির উপরে ধ্যানাসনে বসিয়া নূতন ধরণের যোগব্যায়াম করিতেছি। ডঃ সেন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া নিজের মনে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। সময় চলিয়া যায়, কাজ করিতে করিতে মেরুদণ্ড টনটন্ করিয়া উঠে, পোকাবাছাই কাজে বিরক্তি ধরিয়া যায়। কিন্তু নীরস কর্তব্যও সরস হইয়া উঠিত যখন দেখিতাম সম্মুখে ধূমায়িত চা, এক-থালা ফুলকো লুচি এবং তৎসহ অন্যান্য অনুপান। দিনে একবার নহে, একাধিক-বার আহারের বিচিত্র আয়োজন। তাহাতে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইপ্রস্থ আইটেম থাকিত। তাহার সঙ্গে কখনো কখনো ছোট একটি গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নবদ্বীপ হালদারের কমিক— অপূর্ব কম্বিনেশন! মাঝে মাঝে ডঃ সেনও হাসিয়া উঠিতেন। অদূরে শ্রীমান বাবুসাহেব (অর্থাৎ ডঃ শ্রীমান সুভদ্র সেন) দুয়ারের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রস গ্রহণের চেষ্টা করিত, কিন্তু পিতার দৃষ্টি পড়িলেই চকিতে মিলাইয়া যাইত। কোন্ কোন দিন— রাত বাড়িতেছে, বেশ জাঁকাইয়া বৃষ্টি হইতেছে, একটু পরেই গোয়াবাগান বিডন স্ট্রীটে বান ডাকিবে। উঠি উঠি করিতেছি। ডঃ সেন ভূতের গল্প ফাঁদিলেন, তখন অশরীরী জীবগুলা যেন কায়া ধরিয়া সম্মুখে খাড়া হইল। আমাকে আবার হাওড়ায় ফিরিতে হইবে। হয়তো এই দুর্যোগে অন্ধকারে পথঘাট ডুবিয়া যাইবে, যোগমায়া দেবী লেনের একমেবমদ্বিতীয়ম লাইট পোস্টটি ঝড়ো বাতাসে হয়তো চক্ষু বুজিয়া থাকিবে, 'আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে'— অন্ধকার গলিপথ দিয়া একাই চলিতে হইবে, অবশ্য শ্রীরাধার অভিসারের ঢঙে নহে। ডঃ সেনের গল্পের ছায়ামূর্তিগুলি যদি সঙ্গ লয়? স্বতোনাসিক্যীভবনের ধ্বনিতাত্ত্বিক রীত্যনুযায়ী যদি সম্বোধন করিয়া বসে? তাহা হইলে কোন্ ভাষায় উত্তর দিব? পৈশাচী প্রাকৃতে না অন্য কোনো 'প্রেতভাষায়'? অবশ্য দুয়েতেই সমান অভিজ্ঞতা।

একদিন বিকালের দিকে জোর কদমে স্ক্রুটিনি চলিতেছে, আমরা অতিশয় ব্যস্ত, মাথা তুলিবার অবকাশ নাই, শেষ কিস্তি পরের দিন ট্যাবুলেটরের নিকট যাইবে। সামনের প্লেটে ফুলকো লুচি মাংসের ঘুগনি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর একটি ছোট প্লেটে আরও গুটিকয়েক 'পুরুষ্টু' মিষ্টান্ন পড়িয়া রহিয়াছে— সে

দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। ডঃ সেনের এক পরিচিত ভদ্রলোক ঘরে উঁকি মারিলেন, এবং সম্মুখে শায়িত রজতকান্তি লুচি ও স্বর্ণকান্তি মাংসের ঘুগনি অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে দু-এক প্লেট টানিয়া লইয়া বসিয়া যান। ডঃ সেন স্বভাবস্নিগ্ধ মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনিও ঐরকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম করুন, তবে তো গরম লুচি। আগে গোবর্ধন ধারণ, তারপর রাসলীলা! ভদ্রলোক সম্ভবতঃ গোবর্ধন ধারণে সমর্থ ছিলেন না, সুতরাং রাসলীলা হইতে বঞ্চিত হইলেন!

সেই সব দুর্লভ লঘু মুহূর্তের কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে, নীরস কর্মের ফাঁকে ফাঁকে ডঃ সেনের মৃদু পরিহাস ও মজাদার গল্প জমাইবার অদ্ভুত বাক্‌কৌশল। একদিন, ঘনঘোর বর্ষার সন্ধ্যায়, যখন আমরা সারাদিন খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তখন তিনি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যাঠামহাশয়ের রহস্যময় অন্তর্ধানের কাহিনী বলিলেন— সেদিন সুনীতিকুমারের জ্যাঠতুতো ভগিনীর বিবাহ, মণ্ডপসজ্জা প্রস্তুত, অনেক আগেই নিমন্ত্রণপর্ব সারা হইয়াছে। জ্যাঠামহাশয় প্রতিদিনের মতো সুকিয়া স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া খুব ভোরেই গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না, অনেক সন্ধান করা হইল, গঙ্গার জল প্রায় মন্থন করা হইল, কিন্তু কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না। সিদ্ধান্ত করা হইল, তিনি জলে ডুবিয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন। কী নিদারুণ সংবাদ। তারপর দু-তিন দিন পরেই কোনো এক অজ্ঞাত স্থান হইতে দুই ছত্রে লেখা তাঁহার পোস্টকার্ড আসিল, বুঝা গেল তিনি জীবিত আছেন কিন্তু কোন ঠিকানা দেন নাই। চিঠিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যেন অবিলম্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, যে তাঁহার সামনে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে ফিরিতে দিবে না। এই মর্মে আরও দু-একটি পোস্টকার্ড আসিল, চিঠির বয়ান একই প্রকার। সুনীতিকুমার তখনই ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত, অনুসন্ধানের কোনো ত্রুটি রাখিলেন না, কিন্তু কোন হদিশ পাওয়া গেল না। কাহিনীর উপসংহার ভালো মনে নাই, বোধহয় বাংলার বাহিরে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। ডঃ সেন অতি মৃদুস্বরে এই গল্প বলিয়া গেলেন, শুনিয়া আমরা বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়াছিলাম। পৃথিবীতে কয়টা কেন-র জবাব মিলে? এ কাহিনী ভৌতিক, না নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিকারপ্রসূত হ্যালুসিনেশন?

এইরূপ কত বিচিত্র গল্পই না তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, যাহা যুক্তিব্যাখ্যার অতীত। পাণ্ডিত্যের খনি ডঃ সুকুমার সেনের নাম বিশেষজ্ঞমহলে সুপরিচিত। সে বিষয়ে আমাদের মতো ক্ষুদ্রব্যক্তির সার্টিফিকেট তাঁহার না হইলেও চলিবে। যদিও তাঁহার সঙ্গে আমাদের সব দিক দিয়াই পার্থক্য, তবু একদা তাঁহার পাণ্ডিত্যের বর্ম ভেদ করিয়া সহাস্য মানুষটিকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলাম তাহা সানন্দে স্বীকার করি।

একালে বাঙালীর জীবন-জাহ্নবীতে চড়া পড়িতে শুরু করিয়াছে, ভাঁটার টান দেখা দিয়াছে। কবে কত বৎসর পরে আবার জোয়ার আসিবে বলা শক্ত। এখনও যে আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে দু-একটি আকবরি মোহর অবশিষ্ট আছে তাহাই একমাত্র সম্বল। ডঃ সেনের ন্যায় দু-একটি রত্ন অঙ্গুরীয় ভাঙাইয়া খ্যাতির বাজারে বিনিকিনি চালাইয়া যাইতেছি। তাহার পরে কিং ভবিষ্যতি ?

*—Apres le, la deluge.*

শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন শতবর্ষের আয়ুর পরিধি পরিক্রমণ করিয়া বাঙালী-প্রতিভার শেষ শিখাটি জ্বালাইয়া রাখুন ইহাই একমাত্র কামনা।*